ভারত ও
সোভিয়েট মধ্য এশিয়া

বিনয় ঘোষ

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড্
১২, কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা-১২

প্রকাশক :

সুরেন দত্ত

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিঃ

১২ [illegible] স্কোয়ার : কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ

মে ১৯৪৭

তিন টাকা আট আনা

মুদ্রাকর :

কালীপদ চৌধুরী

গণশক্তি প্রেস

৮ই ডেকার্স লেন, কলিকাতা-১

জনকল্যাণ সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশের স্বার্থত্যাগী বিপ্লবী 'মুসলমান' দেশকর্ম্মীদের দিলাম, যাঁরা বর্ত্তমানের সর্ব্বনাশী সাম্প্রদায়িকতা, আত্মঘাতী ধর্ম্মান্ধতা ও দুর্ভেদ্য কুসংস্কারের মধ্যে ভেদবৈষম্যবর্জিত জাতিসাম্য, শান্তি, সামাজিক প্রগতি, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে জীবনপণ সংগ্রাম করছেন এবং করবেন।

[illegible]দিন আগে যখন কুনিৎসের 'ডন্ ওভার সমরকন্দ' এবং কিশের '[illegible] এশিয়া' পড়ি তখন থেকেই ইচ্ছা ছিল মধ্য এশিয়াব উপব আমাদের বাংলা ভাষায় একটি বই লেখার। কারণ সোভিয়েট মধ্য এশিয়া আগামীকালের জাগ্রত ও পুনরুজ্জীবিত মহাএশিয়ার বাস্তব প্রতিচ্ছবি [illegible]। কিন্তু লেখার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও নানাকারণে লেখা আব হয়ে ওঠেনি। শেষ পর্য্যন্ত কমরেড মুজফ্ফর আহ্‌মদের তাগিদে বইখানি লেখা হ'ল। তা না হ'লে আদৌ এবই লেখা হ'ত কি না সন্দেহ। এখন যখন লেখা হয়েছে তখন লেখার ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে আমার কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন।

এ বইয়ের বিষয়বস্তু শুধু সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার ইতিহাস নয়। সোভিয়েট মধ্য এশিয়াকে সমগ্র এশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখা যায় না। গত ২৩শে মার্চ থেকে ২রা এপ্রিল পর্য্যন্ত নয়াদিল্লীতে যে আন্তর-এশিয়া সম্মেলন হয়ে গেল তাতে এশিয়ার বত্রিশটি দেশ থেকে ২৫০ জন প্রতিনিধি এসেছিলেন। সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার প্রতিনিধিরাও এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে চীন, আরব দেশ, মিশর, ইরান, ইন্দোচীন, তুরস্ক, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, মালয়, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, আফগানিস্তান, তিব্বত, নেপাল, ভুটান, বর্ম্মা প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিরা উল্লেখযোগ্য। সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক সমস্যার নানাদিক নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে সম্মেলনে, তার মধ্যে আমার মনে হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হ'ল "এশিয়ার মজুর ও সমাজকল্যাণ" সমস্যা সম্বন্ধে। একটি স্বতন্ত্র গ্রুপে প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে ('সি' গ্রুপ)

এই বিষয়ে আলোচনা করেন। বিভিন্ন দেশের মজুর আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতারা এই গ্রুপে ছিলেন, ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন কমরেড এস. এম. জোশী। এই গ্রুপের আলোচনার ফলে যে রিপোর্ট সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এখানে তার কিয়দংশ আমি অনুবাদ ক'রে দিচ্ছি, এবং আমার এ বইয়ের 'ভূমিকা' হিসেবে পাঠক এই রিপোর্ট স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারেন।

"কয়েকটিমাত্র উল্লেখযোগ্য দেশ ছাড়া এশিয়ার প্রায় প্রত্যেক দেশের মজুরদের আর্থিক অবস্থা বৃটেন ও পশ্চিমের অন্যান্য শিল্পপ্রধান দেশের তুলনায় অত্যন্ত খারাপ। এই যে পার্থক্য এ শুধু মানবতা ও মানুষের আত্মমর্য্যাদা-বোধের দিক থেকেই নিন্দনীয় নয়, পৃথিবীর শান্তি প্রগতি ও নিরাপত্তার দিক থেকেও একে সমর্থন করা যায় না।"

এখন কথা হ'ল এই 'কয়েকটিমাত্র উল্লেখযোগ্য দেশ' কোন্‌গুলি? সোভিয়েট এশিয়ার অন্তর্গত প্রজাতন্ত্রগুলি। এশিয়ার এই সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রগুলি সম্বন্ধে রিপোর্টে বলা হয়েছে:

"এশিয়ার সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রগুলি এইদিক দিয়ে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে বিচার যোগ্য। সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রে কোন বেকারসমস্যা নেই, প্রত্যেক নাগরিকের কাজ করার আইনসঙ্গত অধিকার আছে। বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা অনুসারে উৎপাদন ও শিক্ষার প্রসারের ফলে আজ এশিয়ার সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রগুলির প্রত্যেক অধিবাসীর জীবনযাত্রার ও সংস্কৃতির আশ্চর্য্য উন্নতিসাধন হয়েছে।

'দৈহিক শ্রম আর মানসিক শ্রমের মধ্যে দীর্ঘদিনের ব্যবধানপ্রাচীর সোভিয়েট সমাজে প্রায় ভেঙে গিয়েছে। জনসাধারণের সকলের মাধ্যমিক শিক্ষার অধিকার পর্য্যন্ত স্বীকৃত হয়েছে এবং মজুর থেকে টেকনিসিয়ান পর্য্যন্ত উন্নতির পথ আজ সেখানে সকলের কাছেই পরিষ্কার।"

এশিয়ার প্রত্যেক দেশে, ইরান বর্ম্মা মালয় ভারতবর্ষে, আজ ধর্ম্মঘটের প্রবল বন্যা এসেছে। নিদারুণ আর্থিক সঙ্কটের চাপে আজ মধ্যশ্রেণীর বদ্ধমূল শ্রেণীস্বাতন্ত্র্যবোধ পর্য্যন্ত নির্ম্মূল হয়ে

যাচ্ছে, দ্রুততালে কেরানী কর্ম্মচারী শিক্ষক প্রভৃতি সকলে এগিয়ে এসে মজুরশ্রেণীর সঙ্গে হাত মিলাচ্ছে, কিন্তু তাতেও আমাদের 'দেশবরেণ্য' নেতাদের চেতনা হ'চ্ছে না। রাষ্ট্রক্ষমতালোভ আজ তাঁদের এত উগ্র যে মজুর ও মধ্যশ্রেণীর এই জীবনসংগ্রামকে তাঁরা 'অন্যায় অপরাধ' ব'লে কটূক্তি করছেন এবং দিনের পর দিন বলছেন যে ইংরেজের 'পরিত্যক্ত' সিংহাসনে তাঁরা গদিয়ান হয়ে বসার পর দিনক্ষণ পাঁজিপুঁথি দেখে ধনিক মালিকদের অনুমতি নিয়ে ধর্ম্মঘট আন্দোলনাদি করা উচিত। তাও যে ভবিষ্যতে করা যাবে না তা বোম্বাইয়ের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার 'শ্রমবিরোধ সম্পর্কিত বিল' দেখেই পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। গণতন্ত্র স্বাধীনতা ও প্রগতির আদর্শ এইভাবে আমাদের দেশের জাতীয় নেতারা কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করছেন। ভবিষ্যতে ইংরেজ ভারতবর্ষ 'কুইট' করলে তাঁরা যে কি করবেন আর কি না-করবেন তা তাঁরাই জানেন। সোভিয়েট দেশ, সোশ্যালিজম্ কমিউনিজম প্রভৃতির নাম শুনলে তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, বলেন ওসব নাকি 'স্বদেশী' আদর্শ নয়, বিদেশ থেকে আমদানি-করা আদর্শ, যারা এই আদর্শের প্রচারক ও সমর্থক তারা সোভিয়েট রাষ্ট্রের গুপ্তচর ইত্যাদি। তাঁদের মতে সোভিয়েট রাষ্ট্র 'সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র'। কিন্তু এসব কথার নূতনত্ব কিছু নেই। হিটলার মুসোলিনী চার্চ্চিল ট্রুম্যান প্রমুখ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাশিষ্ট নেতারা, তাঁদের অনুচর ও পার্শ্বচরেরা, এসব কথা সোভিয়েট রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত তারস্বরে প্রচার করেছেন ও করছেন। তারই প্রতিধ্বনি আমাদের দেশে যাঁরা করছেন তাঁরা যে 'কোন্ শ্রেণীর' এবং দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধ কি, ইতিহাস বারবার তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

তাঁদের মিথ্যা অপপ্রচারের জবাব অগ্রগামী ইতিহাস বারবার দিয়েছে, ভবিষ্যতেও দেবে। চলন্ত ইতিহাসের চাকার তলায় সব 'মিথ্যা,' সব 'ধাপ্পা' ধুলোয় গুড়িয়ে যাবে। সাম্প্রতিক এশিয়া সম্মেলনের উপরোক্ত রিপোর্টেও এর চমৎকার জবাব দেওয়া হয়েছে :

> "এশিয়ার সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রগুলিতে ধর্ম্মঘটের কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ মজুররা জানে কলকারখানা তাদের সকলের। পরিচালক (মালিক নয়—বি) ও মজুরদের মধ্যে যদি কখনও কোন বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয় ট্রেড ইউনিয়ন তার মীমাংসা করে। স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়নের নিষ্পত্তিতে যদি উভয় দলে সন্তুষ্ট না হয় তাহ'লে সোভিয়েট এশিয়ার কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠানে মীমাংসার জন্যে আবেদন করা হয়।"

এশিয়া সম্মেলনের রিপোর্টে আগে বলা হয়েছে, একমাত্র এশিয়ার অন্তর্গত সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রগুলিতেই কোন বেকার সমস্যা নেই, প্রত্যেক নাগরিকের কাজের অধিকার আছে, সেখানে কোন ধর্ম্মঘট করার কোন প্রশ্নই ওঠে না ইত্যাদি। এশিয়ার প্রায় সমস্ত দেশের প্রতিনিধিরা এই রিপোর্ট দিয়েছেন, এবং নিশ্চয়ই তাঁরা সোভিয়েট রাষ্ট্রের 'গুপ্তচর' নন, সকলে সোশ্যালিস্ট কমিউনিস্টও নন। 'সাম্রাজ্যবাদ' ও 'সমাজতন্ত্রবাদের' মধ্যে যে আকাশমাটি ব্যবধান রয়েছে তাও এই রিপোর্টের মধ্যে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। এই বইয়ের ভূমিকায় এর বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নেই, অন্তত বিষয়বস্তুর দিক থেকে। সোভিয়েট মধ্য এশিয়াকে কেন্দ্র ক'রে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্গত ভারতবর্ষ, বর্ম্মা, মালয়, বৃটিশ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের শাসন ও সমাজব্যবস্থার আলোচনা ক'রে আমি এই বইয়ে 'সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের' পার্থক্যসূচক বাস্তব ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেছি। তথ্যসঙ্কলনে চেষ্টার ত্রুটি করিনি। তা সত্ত্বেও যেসব ত্রুটি র'য়ে গেল তা আমার অক্ষমতা ও অসাবধানতার দরুণ।

লিখনভঙ্গীর যে বিশেষত্ব ও দোষত্রুটি আছে তা সম্পূর্ণ আমার। বিষয়বিন্যাস ও বাচনভঙ্গী সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব। অনেকে এই 'বিন্যাস' ও 'ভঙ্গী' পছন্দ করবেন, অনেকেই করবেন না জানি। কিন্তু তাতে আলোচ্য বিষয়বস্তুর গুরুত্ব কমবে না ব'লেই মনে হয়। আর লিখনভঙ্গীর স্বাধীনতা নিশ্চয়ই সকলের কাছ থেকে আমি দাবী করতে পারি।

বইয়ের প্রথমেই যে বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে তা নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে যথেষ্ট। কারণ প্রথমেই প্রাগৈতিহাসিক মধ্য এশিয়া সম্বন্ধে আমি যা বলেছি সাম্প্রতিক নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার আলোকে তা 'অচল' ব'লে মনে হবে। আমার কথা হ'ল, প্রাগৈতিহাসিক মধ্য এশিয়া আমার প্রধান আলোচ্য বিষয় নয়, প্রাচীন মধ্য এশিয়া, বৌদ্ধযুগের মধ্য এশিয়া ও ভারতের যোগাযোগের ইতিহাসই সংক্ষেপে আমি আলোচনা করেছি। প্রসঙ্গত প্রাগৈতিহাসিক মধ্য এশিয়া সম্বন্ধে যে দু'একটি উক্তি করেছি তাকে 'সাহিত্যিক' উক্তি ('বৈজ্ঞানিক' নয়) ব'লে আশা করি নৃতত্ত্ববিদ্ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা উপেক্ষা করবেন। মধ্য এশিয়াই আর্য্যদের আদি বাসভূমি কিনা, আর্য্যরা কারা, ভারতীয় আর্য্যরা কোন্ আদিম জাতির শাখা তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে তর্কের অবসান হয়নি। ম্যাক্সমূলার, গ্রিয়ারসন প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা 'আর্য্যজাতি' ও ভারতে আর্য্যজাতির অভিযান আবিষ্কার করেন। অরেল স্টাইন প্রমুখ পণ্ডিতেরা বলেন মধ্য এশিয়ার আদিম মূলজাতি ইরাণীভাষাভাষী 'আলপিন' মূলজাতি ছিল। পামীর উপত্যকার জাতিগুলিকে রুশ বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা ক'রে উক্ত মূলজাতীয় বলেছেন। অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার অধিবাসীরা আর্য্যভাষাভাষী শ্বেতবর্ণ লোক ছিল। তারা 'অশ্বেত,' 'অ-ককেসীয়', প্রাচ্য এশিয়ার মঙ্গোলীয় ও দক্ষিণ এশিয়ার 'অস্ট্রালয়েড্' বা অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের

মতো ছিল না। মহেঞ্জদড়ো ও হড়প্পার ভগ্নস্তূপের মধ্যে যেসব নরকঙ্কাল ও করোটি পাওয়া গিয়েছে নৃতত্ত্ববিদ্ সেওয়েল্ ও ডাঃ বিরজাশঙ্কর গুহ সেগুলি পরীক্ষা ক'রে তার মধ্যে চারটি মূলজাতির বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেছেন—(১) প্রটো-অস্ট্রালয়েড, (২) ভূমধ্যসাগরীয়, (৩) আলপিন মূলজাতীয় মঙ্গোলীয় শাখা, (৪) আলপিন। ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে ডাঃ গুহ তাঁর পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তন ক'রে 'প্রটো-অস্ট্রালয়েড' জাতিকে মেগালিথ সংস্কৃতির অন্তর্গত ককেসীয় জাতি বলেছেন। এর অনেক আগে এলিয়ট স্মিথ বলেন, উত্তর আফ্রিকা থেকে মেগালিথ-সংস্কৃতির লোকেরা পশ্চিম এশিয়ার ভিতর দিয়ে সিন্ধুপ্রদেশে আসে। তাঁর মতে এই প্রভাব মধ্য এশিয়া থেকে উত্তর ভারতেও আর একটি ধারায় আসে। আবার মহেঞ্জদড়ো হড়প্পার পরবর্ত্তীকালের আবিষ্কৃত নরকঙ্কালের মধ্যে ডাঃ গুহ লম্বামাথা উঁচুনাকবিশিষ্ট করোটি পেয়েছেন। এই মূলজাতিকে তিনি আর্য্যসংশ্লিষ্ট জাতি ব'লে অনুমান করেন। এই অনুমান ও তর্কবিতর্কের শেষ হয়নি আজও। এই বিতর্কের মধ্যে আমি প্রবেশ করিনি, কারণ আমার আলোচ্য বিষয় অন্য।

সোভিয়েট মধ্য এশিয়া মুসলমানপ্রধান দেশ। আলোচনাপ্রসঙ্গে তাই ইসলামধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে হয়েছে এবং 'কোরআন শরীফ' থেকে অনেক 'আয়ত' উদ্ধৃত করতে হয়েছে। আরবীভাষা বা 'ইসলামধর্ম্ম' সম্বন্ধে কোন বিশেষ জ্ঞান আমার নেই। সবসময় মৌলবী, মুসলমান পণ্ডিত ও লেখকদের লেখা বই পাশে রেখে আলোচনা করেছি। তার মধ্যে ভুলত্রুটি থাকা খুবই সম্ভব। মুসলমান পাঠক ও বন্ধুদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন এই জাতীয় ভুলত্রুটিকে ইচ্ছাকৃত বা অন্যায় 'ইসলাম-বিরোধিতা' মনে না করেন, অকারণে 'ধর্ম্মান্ধতার' গণ্ডীর মধ্যে

টেনে এনে আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্বকে লঘু প্রতিপন্ন না করেন। 'ইসলামের' মহান্ আদর্শ যেভাবে আমি বুঝেছি ও ব্যাখ্যা করেছি, তার নবরূপান্তরিত মানবিক রূপের বিকাশ হ'তে মধ্য এশিয়ার সোভিয়েট ভূমিতে যেদৃষ্টিতে আমি দেখেছি, আশাকরি তাঁরা তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন। আমাদের দেশের বর্তমানের অন্ধকার পরিবেশের মধ্যে আলোকরশ্মির সন্ধান তাঁরা এর মধ্যেই যদি খুঁজে পান তাহ'লে আমার লেখা সার্থক হবে।

বইয়ের অন্যান্য ক্রটির মধ্যে দু'রকমের 'বানান' একটি। '-স্থান' -'স্তান', '-ষ্ট' '-স্ট', 'শ' 'স' ইত্যাদির প্রয়োগ একই ধারায় করা হয়নি। করা উচিত ছিল, ভুল হয়েছে। মারাত্মক ছাপার ভুল নেই ব'লেই মনে হয়। 'তথ্য' ও 'সংখ্যা' (Statistics) নির্ভুল ছাপা হয়েছে। ছাপার পরেও মূলগ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে দেখেছি, ভুল পাইনি। তাহ'লেও ভুল থাকা অসম্ভব নয়। একটি ভুল রয়েছে '৮৯' পৃষ্ঠার পাদটীকায়—'Changing Asia'-র গ্রন্থকার 'Hans Kohn' নন, 'Egon Erwin Kisch'।

মে দিবস, ১৯৪৭ — বিনয় ঘোষ

কলিকাতা

বিষয়সূচী



হিমালয়ের স্বপ্ন

সিংহ-ভালুক কথা

বাদ্‌শাহী বেহেশ্‌ত

কেয়ামত

হিমালয়ের স্বপ্ন

হিমালয় স্বপ্ন দেখছে—

সুদূর অতীত, আর অনতিদূর ভবিষ্যতের স্বপ্ন। যুগ-যুগান্তের চলচ্ছবি। কোটি কোটি বছরের সুপ্রাচীন গিরীন্দ্রের কাছে মানব-সভ্যতার ইতিহাস 'বিগত রজনীর' স্বপ্ন মাত্র। হিমালয়ের অভ্যুত্থান কি আর আজকের কথা! প্রায় ছ' কোটি বৎসর আগে হিমালয় বিরাট এক সমুদ্রের তলায় বিলীন ছিল। এই সমুদ্রের নাম টেথিস্। আমাদের এই আর্য্যাবর্ত্ত, তিব্বত, বর্ম্মা এবং চীনের একটা বৃহৎ অংশ ডুবে ছিল এই সমুদ্রের তলায়। কতকাল ধ'রে যে এই সমুদ্রের তলায় বালি আর কাদার স্তর জমা হয়ে হয়ে শিলায় পরিণত হয়েছে তার হিসেব নেই। তারপর একদা এই সমুদ্রের গর্ভ ফুলে-ফেঁপে ভাঁজ হয়ে ঠেলে ওঠায় হিমালয় পর্ব্বতমালা এবং এশিয়ার অনেক দেশ উদ্ভূত হয়েছে।[১] কত দেশ মহাদেশ, কত গিরিশ্রেণীর

১ Wadia : Geology of India (1919) P.F. 208-4

উদ্ভব হয়েছে তারপর—আল্‌পস্, আল্‌তাই, থিয়েন্-শান্, হিন্দুকুশ্, তিব্বত, চীন, আর্য্যাবর্ত্ত, মধ্য এশিয়া—

হিমালয় স্বচক্ষে জীবজগতের সুদীর্ঘ ক্রমবিকাশ দেখেছে—বিশ্বের প্রাণ-প্রবাহের বিচিত্র স্পন্দন হিমালয় নিজের শিলাবক্ষে অনুভব করেছে। হিমালয় দেখেছে, দলে দলে কত শ্রেণীর উদ্ভিদ্, মৎস্য, কীটপতঙ্গ, কত শ্রেণীর সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী জীব এই ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে এল-গেল। হিমালয় দেখেছে, জীবনের এই যে ঢেউয়ের পর ঢেউ, এর কোনটাই বুদ্‌বুদের মতো পৃথিবীর বুকে একেবারে বিলীন হয়ে যায়নি; পূর্ব্বের ঢেউকে পরবর্ত্তী বৃহত্তর ঢেউ এসে গ্রাস ক'রে আরো প্রবলতর গতিতে এগিয়ে গিয়েছে সামনের দিকে, দিগন্তলীন ইতিহাসের প্রগতির পথে—

এই মহাএশিয়ারই বুকে মহাস্থবির হিমালয় দেখেছে, দল বেঁধে আদিম বনমানুষদের ঘুরে ফিরে বেড়াতে, জাভায়, পিকিঙে, এখানে-সেখানে। হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল মহারণ্যে, খরস্রোতা নদীর ও পাহাড়ী ঝর্ণার কূলে কূলে, গিরিমালার পাদদেশে, ভীত সন্ত্রস্ত আদিম বনমানুষদের শীকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে হিমালয়।[২] মানবসভ্যতার এই সব আদিম মজুরদের পাথুরে হাতিয়ার আজও এই বিশাল এশিয়ার চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। হিমালয় দেখেছে প্রকৃতির সঙ্গে মল্লযুদ্ধ ক'রে ক'রে আদিম অসভ্য মানুষের বাঁকা মেরুদণ্ড সোজা বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, মানুষ হয়েছে আধুনিক মানুষ। প্রকৃতির মাতৃক্রোড় থেকে বন্য বর্ব্বরতার শৈশব উত্তীর্ণ হয়ে মানুষ সভ্যতার দুর্গম পথে পা বাড়িয়েছে। গুহামানব নদী উপত্যকায় এসে বাসা বেঁধেছে, চাষ করেছে, ফসল

২ Panchanan Mitra: Prehistoric India (2nd Edition) P.P. 52-91

ফলিয়েছে, পশুপালন করেছে। যাযাবর মানুষ হয়েছে চাষী, কুম্ভকার। আশেপাশে সভ্যতার এই মৃদু পদধ্বনি কান পেতে শুনেছে তুষারশুভ্রকেশ বৃদ্ধ হিমালয়। হিমালয় দেখেছে সভ্যতার প্রদীপ জ্বলে উঠল মিশরের নীলনদের তীরে, ইরাক আজমে (মেসোপোতামিয়ায়), দজ্‌লা (টাইগ্রিস্ নদী) ও ফোরাত্ (ইউফ্রেতিস্ নদী) নদীর কূলে কূলে, উত্তর ভারতের সিন্ধুনদের উপত্যকায়। বড় বড় নগর, পথ ঘাট, ইমারৎ-অট্টালিকা গ'ড়ে উঠল। দাস-ক্রীতদাসের হাড়ভাঙা কঠোর পরিশ্রমে ও কারিগরিতে আকাশ ফুঁড়ে ঠেলে উঠল পিরামিড, মন্দির-মস্তাবা, মর্ত্ত্যলোকের দেবতার প্রতিনিধি প্রবল প্রতাপশালী ফারাওদের কীর্ত্তিকাহিনীর অমর প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি। এশিয়ার বুকে, এখানে-ওখানে, সমৃদ্ধিশালী নগরে নগরে সভ্যতা মানুষের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করল। বৃদ্ধ হিমালয় শুনেছে সেই ঘোষণা—

হিমালয় দেখেছে, মানুষ ধীরে ধীরে সভ্যতার অগ্রগতির পথে বাঁধা পড়ল পারিবারিক বন্ধনে, শ্রমবিভাগের ফলে শ্রেণীবিন্যাসের ফাঁস লাগল মানুষের গলায়, এই আর্য্যাবর্ত্তে, সিন্ধুনদের উপত্যকায়, মহেঞ্জোদড়ো-হড়প্পায়, মিশরের নীলনদের তীরে, মেসোপোতামিয়ায় ও মধ্য এশিয়ায়—

কত রাজা ও রাজ্যের, কতশত ফারাওয়ের উত্থানপতন হিমালয় দেখেছে তার হিসেব নেই। কত নগর, পথঘাট, স্মৃতিস্তম্ভ গ'ড়ে উঠল আবার নদীতটের বালুগর্ভে বিলীন হয়ে গেল এই হিমালয়ের চারিদিকে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে, রথচক্র ঘর্ঘরিয়ে, দুর্লঙ্ঘ্য পার্ব্বত্য পথ ও দুস্তর মরুবক্ষ ডিঙিয়ে কত দুর্দ্ধর্ষ বর্ব্বর জাতি অভিযান করেছে লোহার হাতিয়ার, ভল্ল, বর্শা, বল্লম নিয়ে এই এশিয়ার বুকে। আজও হিমালয় তার সাক্ষী।

যারা ক্ষেত চষেছে, বাসা বেঁধেছে, পশু চরিয়েছে, তারা মরূস্থানে আর নদী উপত্যকায় সভ্যতার ইমারৎ গড়েছে। যারা পশু শীকার ক'রে বেড়িয়েছে, যারা যাযাবর, যারা পাহাড়ের শিরদাঁড়া কেটে তামা, লোহা, রাং তুলে এনে গলিয়ে পিতলের আর লোহার হাতিয়ার গড়েছে, তারা বন্যার বেগে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে এসে ধ্বংস করেছে সভ্যতার ইমারৎ, তারপর আবার গ'ড়ে তুলেছে শাণিত হাতিয়ার আর বুদ্ধি দিয়ে উন্নততর সভ্যতা। সভ্যতার বাল্যকালের ইতিহাস এই যাযাবর আর কৃষি জীবনের দুইটি ধারার ঘাত-প্রতিঘাতের ইতিহাস। এই ইতিহাসই এশিয়ার বৈশিষ্ট্য। মানবসভ্যতার বাল্যজীবনের এই স্মৃতি মধ্য এশিয়ার মাটির সঙ্গে জড়িত—ক্যাসপিয়ান্ থেকে আল্তাই পর্য্যন্ত তার পদচিহ্ন অঙ্কিত। একদিকে বিশাল মরুভূমি আর তৃণগুল্মহীন প্রান্তর, আর একদিকে নদনদীর প্রবাহ ও শৈলশ্রেণীর তুষারতরঙ্গ, এই হ'ল এশিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, বিশেষ ক'রে মধ্য এশিয়ার। তাই একদিকে, এই মধ্য এশিয়ায় মানুষ ঘর বেঁধে চাষ ক'রে নগর জনপদ গ'ড়ে তুলেছে, আর একদিকে মানুষ যাযাবর জীবনের দুর্ব্বার বন্যায় গা ভাসিয়ে দিয়েছে। অমুর্ব্বর মরুভূমি আর উর্ব্বর শস্যক্ষেতের এই কঠোর দ্বন্দ্বে এশিয়ার বক্ষ ক্ষতবিক্ষত।[৩] হিমালয় দেখেছে সেই দ্বন্দ্ব যুগ যুগ ধ'রে।

হিমালয় দেখেছে তুর্কী, তুঙ্গু ও মোঙ্গলরা এল। হিমালয় দেখেছে, তুর্কীরা ক্ষেত চাষ করেছে, পশুপালন করেছে, কামারের কারিগরিতে সকলকে অবাক ক'রে দিয়েছে; তুঙ্গুরা মাছ আর পশুশীকার করেছে সাইবেরিয়ার জঙ্গলে জঙ্গলে; আর মোঙ্গলরা ঘোড়া আর ভেড়ার পাল নিয়ে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়িয়েছে। এশিয়ার বুকের উপর

৩ Ralph Fox : Genghis Khan : P.P. 32-50

বিভিন্ন জাতির উত্থানপতন, বিভিন্ন রাজ্য ও সভ্যতার ভাঙাগড়া হিমালয় দেখেছে যুগ যুগ ধ'রে—

সমুদ্রপথে ভারতীয় সভ্যতা একদিন যেমন ইন্দোচীনে, কম্বুজ ও চম্পায়, শ্যাম, যবদ্বীপ, বলীদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে পৌঁছেছিল, তেমনি দুর্গম স্থলপথে, মরুপথে ও পার্ব্বত্য পথে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হতে সুরু ক'রে সমগ্র মধ্যএশিয়ায় আমাদের ভারতীয় সভ্যতার আলোক একদিন বিকীর্ণ হয়েছিল। হিন্দুকুশ ও পামিরের অন্ধকার গিরিপথ অতিক্রম ক'রে, থিয়েন্-শানের তুষারপৃষ্ঠ ডিঙিয়ে ইরান থেকে বাদাক্‌শান্, বামিয়েন্ থেকে তুর্ফান্, তাস্কেন্দ সমরকন্দ থেকে ইয়ারকন্দ-খোতান্, কিজিল-কুম্ থেকে কারাকোরাম্, খোরাসান্ থেকে তৃষ্ণার্ত্ত তাক্‌লামাকান্ পর্য্যন্ত একদিন এক বিপুল সভ্যতা শাখাপ্রশাখা মেলে প্রসার লাভ করেছিল। ভারতীয়, গ্রীক, পারসিক, তুখারীয়, তুর্কী, তাতার ও চীনা সভ্যতার শাখাপ্রশাখা এসে একদিন কিজিলকুম্, কারাকোরাম্ ও তাক্‌লামাকানের কাঠফাটা মরুবুকে নবজীবনের আলোড়ন তুলেছে, সিন্ধুনদ, কুভা বা কাবুলনদী, আমু-দরিয়া ও সির-দরিয়া, কাশগর-দরিয়া ও ইয়ারকন্দ-দরিয়ার উপত্যকায় রাজ্য গঠন করেছে, আবার তুক্ষু মরুভূমির বালুকাগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে, হাজার হাজার বছর পরে প্রত্নবিদ্‌দের কৌতূহল মেটাবার জন্যে। ভারতের বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধসভ্যতা একদিন এইসব সভ্যতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিল।[৪] সেইসব বৌদ্ধভিক্ষুদের হিমালয় ভোলেনি আজও।

সেই সব পথের উপর নানা জাতির নানা সভ্যতার পায়ের চিহ্ন আজও আঁকা রয়েছে, লুপ্ত হয়ে যায় নি। সেই সব সভ্যতার পদধ্বনি হিমালয়ের

৪ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী : ভারত ও মধ্য এশিয়া

শিলাপাঁজরে আজও শিহরণ জাগায়। সে-পথের অন্ত নেই। বিচিত্র এই দেশ মধ্য এশিয়া! পৃথিবীর যে-কোন দেশ থেকে এসে মধ্য এশিয়ায় পদার্পণ করলে ভয়ে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে যেতে হয়। মনে হয়, পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগ যে ভূপৃষ্ঠ, তার অর্দ্ধেকটা যেন এশিয়ার এইখান থেকে কুঁজের মতো ঠেলে উঠেছে। কি ভীষণ, ভয়ঙ্কর এই ভূপৃষ্ঠ! পথের আদি নেই, অন্ত নেই। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু শুকনো খট্‌খটে প্রান্তর, উপত্যকা, আর সুবিশাল মরুভূমির ধূ ধূ শূন্যতা, নিঃসীম দিগন্তব্যাপী অসহ্য রুক্ষতা আর কঠোরতা, একবিন্দু জলের চিহ্ন নেই কোথাও। স্নিগ্ধতা ও শ্যামলতার স্পর্শ নেই। কোথায় সমুদ্র! পিছনে হাজার হাজার মাইল দূরে ফেলে আসতে হয় সমুদ্র, আর তার সুগভীর তরঙ্গধ্বনি। তার বদলে কান পেতে অনর্গল শোন পিশাচের দীর্ঘশ্বাসের মতো মরুভূমির একটানা শন্‌শন্ শব্দ আর চোখ মেলে দেখো একঘেয়ে ধূসরতা। তৃষ্ণায় বুক যখন ফেটে যাবে তখন দূরে, বহু দূরে ছোট ছোট দরিয়া আর পাহাড়ী ঝর্ণার কুল্ কুল্ কলতান শুনে মনে হবে যেন ঘুমপাড়ানি গান শুনছি। তারপর আবার সেই তপ্ত বালুর প্রচণ্ড শুষ্কতা, লক্‌লকে আগুনের শিখার মতো রৌদ্রের ঝাঁঝ আর একটানা ধূ ধূ ধূসরতা। এরই মধ্যে হঠাৎ কখন চোখের সামনে সোনালি বিদ্যুতের মতো ঝল্‌কে উঠবে পামির অথবা থিয়েন্-শানের তরঙ্গায়িত তুষারপৃষ্ঠ। ধূলাবালির ঘূর্ণিপাকে পথ হারিয়ে যাবে, চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে আসবে, ভেঙে-পড়া ক্যারাভানের কঙ্কালে আকীর্ণ মরুপথে হোঁচট্ খেয়ে পড়তে হবে শ্রান্ত মৃত উটের পিঠের উপর। তারপর আবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে, বঙ্কিম ও নির্ম্মম শৈলশ্রেণীর দিকে আবার চেয়ে দেখতে হবে, এবং মেরুদণ্ড সোজা ক'রে মরুপথে আবার দৃঢ়পদে চলতে হবে।

এই হ'ল মধ্য এশিয়ার মানচিত্র। এই হ'ল মধ্য এশিয়ার পথ, যে-পথ ধ'রে পূব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পূবে বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন দেশের রত্নলোভী বণিক, আর শত শত দিগ্বিজয়ী বীর আনাগোনা করেছে, ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে, লুণ্ঠন ও শোষণ করেছে। তবু মধ্য এশিয়ার মানুষ মরেনি, মধ্য এশিয়ার সভ্যতা মরুবুকে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার, দুর্দ্ধর্ষ চেংগিস্, খোঁড়া তৈমুর, সাম্রাজ্যলোভী রুশজার ও চৈনিক সম্রাট, একে একে সকলেরই কীর্ত্তিস্তম্ভ মরুবুকে ধূলিসাৎ হয়েছে। চূর্ণ ক্যারাভান্ ও মৃত মানুষের কঙ্কালের স্তূপ ফুঁড়ে আবার ঠেলে উঠেছে নূতন আর এক সভ্যতা, নূতন আর এক বংশের মানুষ।

বর্ব্বর তাতার বাহিনীব উদ্যত বল্লমের উত্তর দিয়েছে সমরকন্দ। হিংস্র ও লোভী জারদের, অত্যাচারী আমীর ও মোল্লাদের সমুচিত জবাব দিয়েছে তাস্কেন্দ। বোখারা জেগেছে, তাজিকরা বেঁচে উঠেছে আবার। ইতিহাস তার রায় ঘোষণা করেছে—মানুষের পরাজয় নেই। ইতিহাসের কণ্ঠে বার বার এই শোহরত্ শুনেছে হিমালয়। সাধারণ মানুষ, সেই জেলে তাঁতি, সেই কামার কুমোর, সেই চাষী মজুর, সত্যিকার মানুষ যারা, যাদের নিয়ে এই বিশাল শ্রেণীহীন মানবশ্রেণী, তাদের কোনদিন পরাজয় নেই। এ পৃথিবী তাদের, এ সভ্যতাও তাদের। তারাই এই সভ্যতার বনিয়াদ গড়েছে, আবার আকাশ বিদীর্ণ ক'রে তারাই এই সভ্যতার প্রাসাদ গ'ড়ে তুলবে। ইতিহাস সগর্ব্বে এই সত্যই ঘোষণা করেছে মধ্য এশিয়ায় বারম্বার। সমরকন্দের মসজিদে, তাস্কেন্দের চিম্‌নি-চূড়ায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে সেই ঘোষণা। নূতন সভ্যতার উজ্জ্বল প্রতীক—নীল আকাশের কোলে লাল তারা। হিমালয় এক দৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখছে, ক্যাস্পিয়ান্ থেকে পামির ও

থিয়েন্-শান্ পর্য্যন্ত চাষীর কাস্তে আর মজুরের হাতুড়ি, আর তাদেরই রক্ত দিয়ে গ'ড়ে তোলা নূতন সভ্যতার কীর্ত্তিধ্বজা লাল পতাকা উড়ছে, লাল তারা জ্বলছে সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার নীল আকাশ জুড়ে—

আজ মধ্য এশিয়ার সেই সব ঐতিহাসিক প্রাচীন পথ বড় বড় রাজপথ ও রেল পথে রূপান্তরিত হয়েছে। আজ আর শ্রান্ত উটের ক্যারাভান্ দেখা যায় না সে-পথের উপর। আজ সেখানে কন্‌ভয় চলেছে, চলন্ত যান্ত্রিক কন্‌ভয়। আকাশে উড়ন্ত কন্‌ভয়। বৈমানিক তাজিক বীরাঙ্গনা আজও তার বৃদ্ধা দাদির কাছে সেই সব পুরানো দিনের, পুরানো পথের গল্প শোনে। ক্যাস্‌পিয়ান থেকে তাক্‌লামাকান্ পর্য্যন্ত সেই সব পথের কাহিনী, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রূপকথার চেয়েও যা রোমাঞ্চকর। আজও হিন্দুকুশ, পামির, থিয়েন্-শান্ পর্ব্বতমালা সেই সব পথের স্মৃতি ভোলেনি, হিমালয় তো ভুলতেই পারে না। ভারত ও মধ্য এশিয়ার মধ্যে সেদিন যে সুগভীর আত্মীয়তা ছিল, সভ্যতার আদান-প্রদানের ভেতর দিয়ে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, তা সহজে ভুলে যাবার নয়।

সেই সব পথের কথা আমরা শুনেছি চীনা ভিক্ষু ও শ্রমণদের কাছে, চীনা পর্য্যটকদের কাছে, প্রত্নবিদ্‌দের কাছে। কত-না পথ, আর কত-না তার অপূর্ব্ব কাহিনী! বাহ্লীক (Bactriana), সুগ্‌দিয়ানা (Sogdiana) প্রভৃতি বড় বড় রাষ্ট্র, কত বড় বড় নগর, রাজধানী, ক্যারাভান্-সরাই ও বৌদ্ধ বিহার গ'ড়ে উঠেছে এই সব পথের উপর। দক্ষিণে ইয়ারকন্দ-খোতান্, উত্তরে মরালবাশি, কুচার, কারাশর, তুর্ফান। এই দুই সীমান্ত বেয়ে দু'টি প্রধান পথ চীন দেশ পর্য্যন্ত বিসর্পিত। পশ্চিম প্রান্তে এই দু'টি পথ মিলিত হয়েছে কাশগরে, পূর্ব্বপ্রান্তে চীন দেশের সীমান্তবর্ত্তী ইউ-মেন্-কোয়াং গিরিপথে। আর

একটি ছোট পথ মরুভূমির মধ্য দিয়ে ইয়ারকন্দ দরিয়ার ধারা বেয়ে এসে উত্তর দিকের পথের সঙ্গে মিশেছে। এই দুই পথে প্রাচীন কালে মধ্য এশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য চলত; ইরান্, আফগানিস্তান্ বোখারা, সমরকন্দ প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে এই পথেই সেকালে চীনের ও ভারতের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। দু'জন ভারতীয় ভিক্ষু, জিন্‌গুপ্ত ও ধর্ম্মগুপ্ত, চীন ভাষায় তাঁদের যে জীবনী লিখে গিয়েছেন তার মধ্যে এই সব পথ ঘাটের বিস্তৃত বিবরণ আছে। জিন্‌গুপ্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের জন্যে দশজন ভিক্ষু নিয়ে কুভা বা কাবুল নদীর উপত্যকা বেয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে চললেন এবং নগরহার (জেলালাবাদ) অতিক্রম ক'রে কপিশা দেশে পৌছলেন। কপিশা (কাফেরস্তান) থেকে হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রম করার তিনটি প্রসিদ্ধ গিরিপথ আছে—পাঁজশির নদীর উপত্যকা, কুশান উপত্যকা এবং আরও পশ্চিমে বামিয়েন্ উপত্যকা। বামিয়েনের পথে কপিশা ছেড়ে জিন্‌গুপ্ত হিন্দু-কুশের পশ্চিম পাদদেশ পার হয়ে হূণদের রাজ্য বাদাকশান্ ও ওয়াখানে এসে পৌছলেন। এ-দেশ ত্যাগ ক'রে নানা দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম ক'রে পামিরের অন্তঃপাতী একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী তাশ-কুরগানে এলেন। তারপর পৌছলেন খোতানে। সেখান থেকে দক্ষিণ পথে চীন যাত্রা করলেন। ধর্ম্মগুপ্ত পুরুষপুর (পেশোয়ার) থেকে কুভা নদীর তীর ধ'রে উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা ক'রে কপিশায় পৌছলেন। কপিশা থেকে পশ্চিমমুখী গিরিপথ অতিক্রম ক'রে বাহ্লীক, বাদাকশান্, তাশ-কুরগান প্রভৃতি দেশ ঘুরে, পামিরের দুর্লঙ্ঘ্য গিরিপথ অতিক্রম ক'রে তিনি কাশগরে উপস্থিত হলেন। কাশগর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব্বের পথে না গিয়ে ধর্ম্মগুপ্ত থিয়েন্-শান্ পর্ব্বতের পাদদেশ দিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে যাত্রা করলেন। এই পথে তিনি উপস্থিত

হলেন কুচারে (প্রাচীন কুচাবাকুচী), তারপর সেখান থেকে চীনে রওনা হলেন। এই সব পথে ভারতের অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু মধ্য এশিয়ার উপর দিয়ে চীন দেশে গিয়েছিলেন। তাঁদের জীবনীতে এই সব পথের কাহিনী রূপকথার মতো বর্ণিত হয়েছে।

চীনা পরিব্রাজকদের মধ্যেও অনেকে ভারতে আসেন, তাঁদের মধ্যে বোধ হয় ফাহিয়েন্ প্রথম। যেসব মরুপথ ও গিরিপথ অতিক্রম ক'রে ফা হিয়েন্ ভারতে এসে পৌঁছলেন তা বর্ণনাতীত। এই রকম একটি পথ সম্বন্ধে ফা হিয়েন্ লিখেছেন: "এ-পথে কোথাও কোন মানুষের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। এ-পথে দরিয়া পার হওয়া আর মরুভূমি অতিক্রম করা যে কি প্রাণান্তকর ব্যাপার তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এই সামান্য পথ অতিক্রম ক'রে খোতান পৌঁছতে ৩৫ দিন কেটে গেল। তারপব অনেক দুরারোহ পর্ব্বত ডিঙিয়ে, অনেক গভীর পার্ব্বত্যনদী অতিক্রম ক'রে দরদ (দারেল) উপত্যকায় এসে পৌঁছলাম। দরদ থেকে সিন্ধুনদের উপত্যকা বেয়ে ভারতে প্রবেশ করার পথ। এ-পথে নদী পার হতে হ'ল ঝুলানো দড়ির সেতু বেয়ে।" মনে হয় রামায়ণের সেই "কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের" পথের বর্ণনা পড়ছি যেন—"সেদেশে শৈলোদা নদী অতিক্রম করতে হ'লে পরপারের বাঁশ যখন বাতাসে কট্ কট্ শব্দ ক'রে হেলে পড়ে, তখন সেই বাঁশের ডগা ধ'রে নদীর অন্য পারে অবতীর্ণ হতে হয়"। কিন্তু তাশ-কুরগান্ হয়ে পশ্চিমে বাদাকশান্ না গিয়ে অন্য গিরিপথ দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব্বে গিলগিট্ নদীর উপত্যকা হয়ে সিন্ধুনদের তীরে পৌঁছান যায়। এ-পথ অত্যন্ত দুর্গম। বোধ হয় এই সব পথের বর্ণনাই আমরা প্রাচীন পালি বৌদ্ধ সাহিত্যে ও সংস্কৃত গ্রন্থে পাই। পালি সাহিত্যে এইসব পথের বিচিত্র বর্ণনা দেওয়া হয়েছে—যেমন, 'জন্নুপথ' অর্থাৎ যে পথ জানু দিয়ে অতিক্রম করতে হয়, পায়ে চলা যায় না, "অজপথ" ও

"মেণ্টপথ" অর্থাৎ যেসব পথ শুধু ছাগল ও ভেড়া অতিক্রম করতে পারে। "বংশপথ" অর্থাৎ যেসব পথ শুধু বাঁশের সেতুর উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হয়, "শকুনপথ", "মূষিকপথ", "দরিপথ" বা "গুহাপথ", "শঙ্কুপথ", "বেত্রপথ" ইত্যাদি।*

এইসব নানা রকমের ভয়ঙ্কর পথ ছাড়াও, আরও একটি প্রশস্ত পথ ছিল। সে-পথে ভারতবর্ষের সঙ্গে মধ্য এশিয়ার যোগাযোগ বিরল হলেও, ইউরোপ থেকে ইরান, সমরকন্দ, তাস্কেন্দ, তাক্লামাকান্ পর্য্যন্ত মধ্য এশিয়ার যোগাযোগের অন্যতম পথ ছিল এই পথ। চীনা পরিব্রাজক হিউয়ান্-সাং তাঁর গ্রন্থে এই পথের বর্ণনা দিয়েছেন। হিউয়ান-সাং যখন খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমে ভারতবর্ষে রওনা হন, তখন মধ্য এশিয়ার দক্ষিণভাগ তুর্কীদের করতলগত, আর তুর্কীদের সঙ্গে চীনের রাজনৈতিক সদ্ভাব তখনও স্থাপিত হয়নি। তাই হিউয়ান-সাং মধ্য এশিয়ার দক্ষিণ পথে ভারতে আসতে পারেননি। তিনি উত্তর প্রান্ত দিয়ে কুচার পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়ে, উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে বেদল গিরিপথ বেয়ে থিয়েন্-শান্ পর্ব্বত অতিক্রম করলেন। তারপর ইস্‌সিক্-কুল্ হ্রদের পাশ দিয়ে, থিয়েন্-শানের উত্তর পাদদেশ বেয়ে হিউয়ান-সাং যে-পথে লীক্ অভিমুখে রওনা হলেন, সে-পথ তাস্কেন্দ, সমরকন্দ হয়ে, আমুদরিয়া (প্রাচীন বক্ষুনদী) পার হয়ে কুন্দুজ নামক স্থানে অন্যান্য পথের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এর পর বাহ্লীক, কপিশা প্রভৃতি দেশ হয়ে, পূর্ব্বে যে-পথের উল্লেখ করা হয়েছে সেই পথ ধ'রে তিনি ভারতে আসেন। হিউয়ান-সাং এইসব পথের একটির বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন:

"বিশাল মরুভূমির বুক চিরে এই পথ গিয়েছে। মরুভূমির বালুকারাশি প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে ঘূর্ণী চক্রের সৃষ্টি করছে এবং মরুভূমিকে

---

* শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী: ভারত ও মধ্য এশিয়া

একেবারে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে। চারিদিকে দুর্ভেদ্য ধূসরতার প্রাচীর। কোনদিকে পথের কোন চিহ্নই চোখে পড়ে না, পথিকের প্রায়ই দিগভ্রান্তি হয়। নানাস্থানে মৃত পথিক, বণিক ও ভেঙেপড়া ক্যারাভানের পরিত্যক্ত পশুর কঙ্কাল দেখে পথের নিশানা ঠিক করতে হয়। মরুভূমির কোথাও একবিন্দু জল অথবা তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায় না। কখনো কখনো মরুভূমির উত্তপ্ত বায়ু এত প্রচণ্ড জোরে বইতে থাকে যে তারই ঝাপ্‌টায় পথিক ও ক্যারাভান্ বালুর উপর লুটিয়ে পড়ে। বাতাসের একটা শোঁ শোঁ শব্দ প্রেতলোকের বীভৎস কান্নার মতো পথিকের মনে ভীতির সঞ্চার করে।"

এই পথের উপর দিয়ে কত জাতি এল-গেল তার ঠিকানা নেই। গ্রীক, তুর্কী, ইরানীরা এল, সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে আরবরা এসে ইস্‌লাম ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করল, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দুর্দ্ধর্ষ তাতার বাহিনী নিয়ে এল চেংগিস্, তারপর তৈমুর। বিরাট সাম্রাজ্য ও সভ্যতা গ'ড়ে উঠল। আবার রক্তের বন্যায় ভেসে গেল সেই সাম্রাজ্য। মানুষের কঙ্কালের পর্ব্বতপ্রমাণ স্তূপের তলায় চাপা পড়ে গেল সেই সভ্যতা। বর্ব্বর অন্ধকার যুগে আচ্ছন্ন হয়ে গেল মধ্য এশিয়া। যাযাবর উজ্‌বেক্‌রা এল পঙ্গপালের মতো, বোখারায় খোদাতুল্য খাঁ আর আমীরদের 'আরশ' স্থাপন করল। তুর্কী-মোঙ্গল জাতির প্রচণ্ড অভিযানের বন্যাস্রোতে তাজিক্‌রা ভেসে গেল। ভীত, সন্ত্রস্ত তাজিক্‌রা হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালার গুহায় ও পাদদেশে আশ্রয় নিল। উজ্‌বেক্ খাঁদের ধর্ম্মরাজ্যের ধ্বজা উড়ল মধ্য এশিয়ায়।[৬]

---

৬ Sir Aurel Stein: On Ancient Central Asian Tracks (London, 1933)

Owen Lattimore: The Desert Road to Turkestan (London, 1929)

আমীর ওম্‌রাহদের স্বর্গরাজ্য সমরকন্দ, খোদাতুল্য খাঁদের খোস্‌হুনিয়া বোখারা-তুশাম্বে-তাস্কেন্দ, মধ্যযুগীয় বিলাসিতায় ও ঐশ্বর্য্যে, প্রাকৃতিক সম্পদে ও রত্নসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে মর্ত্ত্যের মায়াপুরী হয়ে উঠল।

গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার নাকি সমরকন্দের ভিৎ পত্তন করেছিলেন। মধ্য এশিয়ার প্রত্যেক সহরের মতো সমরকন্দের ভিতরে নগর আর নগর-দুর্গ, বাইরে সহরতলী। বাইরের সহরতলী প্রায় চুয়াল্লিশ বর্গ মাইল, ২৭ মাইল লম্বা এক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এই সহরের জলসেচন ব্যবস্থা সেকালে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না। আটটা বৃহৎ কেন্দ্রে দু'শ আশীটা স্রোতোদ্বার দিয়ে এই জলসেচনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। পথের দু'পাশে সারি সারি দেবদারু গাছ, আর প্রত্যেক বাসগৃহের সঙ্গে সংলগ্ন ফুল ফলের বাগিচা। পাথরে বাঁধানো পথের উপর পথিকের জন্যে ঠাণ্ডা পানীয় ও সরবতের প্রায় দু'হাজারটি কেন্দ্র। তামার ও মাটির পাত্রে সযত্নে সঞ্চিত ঠাণ্ডা জলে, অথবা ঝর্ণার জলে পথিকের ক্লান্তি দূর করা হ'ত। নগর-দুর্গ থেকে দৃষ্টি প্রসারিত করলে চারিদিকে কেবল বাগিচা, বাগান আর বড় বড় দেওদারের সবুজ সামিয়ানা দেখা যায়, তার মধ্যে প্রায় এক লক্ষ পরিবারের লোকজন কোথা যে আত্মগোপন ক'রে থাকে বোঝা যায় না। সবুজ সামিয়ানার পরপারে তুষারশুভ্র শৈলশৃঙ্গ সূর্য্যের চূর্ণরশ্মিতে চিক্‌মিক্ করে। মনে হয়, এ যেন সমরকন্দ নয়, মর্ত্ত্যের সমরকন্দ নয়, মধ্য এশিয়ার ভূস্বর্গ সমরকন্দ। তারপর মধ্য-গগনে সূর্য্য যখন উঠে আসে, স্বপ্নপুরী সমরকন্দের শান্ত সবুজ সামিয়ানা ভেদ ক'রে, দেওদারের স্তব্ধতা চূর্ণ ক'রে গুঞ্জন ওঠে। মানুষের গুঞ্জনধ্বনি ধীরে ধীরে একটানা কলরবের একটা ঐক্যতান সৃষ্টি করে। বাজারের কলরব। বণিক, ব্যবসায়ী, ব্যাপারীর কলরব। বাজার বসেছে সমরকন্দে। চারিদিক [illegible]রুপু ধূলোর গেরুয়ারঙে

ঢেকে গিয়েছে। তুর্কী, ইরানী, কাবুলী, চীনা, তাজিক্, উজ্‌বেক, তাতার বণিক ও ব্যাপারীরা চারিদিক থেকে এসে ভিড় করেছে সমরকন্দে। রেশম, তুলো, সাটিন, মখমল, গালিচা, ঘোড়ার জীন্, রিকাব্, লাগাম, রঙবেরঙের তামার ও মাটির পাত্র, নানারকমের ফলফুল, যা যেখানে চারপাশে আছে, সেরা সেরা পণ্যদ্রব্য সব এসে জড়ো হয়েছে সমরকন্দের বাজারে। বোর্‌কা পরে সুন্দরী তরুণীরা ঘোরাফেরা কেনাবেচা করছে। চোগাচাপ্‌কান, পাগড়ী-টুপী প'রে সদাগরেরা সওদা করছে। বাজার ও বাগিচায় যেন স্বর্গ-মর্ত্ত্যের মিলন-ভূমি ছিল সমরকন্দ।

এই সমরকন্দে ব'সে আলেকজাণ্ডার থেকে চেংগিস, তৈমুর থেকে নসরুল্লা খাঁ পর্য্যন্ত সকলেই এই দুনিয়ার বাদ্‌শাহ হবার স্বপ্ন দেখেছেন। হিমালয় আজও ভোলেনি সেই স্বপ্নের কথা।

ঠিক এমনি ছিল বোখারা, তাস্কেন্দ। মস্‌জিদ, প্রাসাদ, দুর্গ আর গালচের জন্যে বিখ্যাত ছিল বোখারা। আমীর ওম্‌রাহদের প্রিয় পাত্র মোল্লা, মৌলবীদের মস্‌জিদ, মুয়াজ্জিনদের আজান আর কোর্‌আন আবৃত্তি কালে বোর্‌কাবৃতা জেব্-উন্নিসাদের দোলন, এই নিয়েই বোখারা ছিল মশ্‌গুল। মস্‌জিদের মিনারে মিনারে আশমানী রঙ এক অদ্ভুত স্বপ্নের জাল বুনতো। তাস্কেন্দ ছিল মধ্য এশিয়ার রণশিল্পের প্রধান সরবরাহ কেন্দ্র। তীর, তাঁবু, ঘোড়ার জীন্, পাদান, তূণ, তলোয়ার এবং আরও সব নানারকমের সমরোপকরণ এসে জমা হত তাস্কেন্দে। সির-দরিয়া, আমু-দরিয়া বেয়ে দক্ষিণ রুশিয়ার প্রান্তর থেকে, তুর্কী থেকে দলে দলে সব তাস্কেন্দে আসত এই সব জিনিষপত্তর বেচা-কেনা করতে। আজ আর সেদিন নেই।

বিলাসিতায়, ঐশ্বর্য্যে, সম্পদে, ফলেফুলে, রেশম-পশমে, মস্‌জিদ

মিনারে আর প্রাসাদ চূড়ায় একদিন সত্যই ভূস্বর্গ ছিল সমরকন্দ, তাস্কেন্দ, বোখারা। দেশ-বিদেশের বণিকেরা এসে এশিয়ার অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য এই মধ্য এশিয়ার পথেই লুটে নিয়ে গিয়েছে। পথের উপর এখানে-ওখানে সেনানিবাস, দুর্গ, মুসাফিরখানা, ক্যারাভান্-সরাই। সেখানে কেবল উটের আর রেশমের দামের কথা, পথের উপর ভ্রাম্যমান দস্যুদের কথা, ক্লান্তিতে ভেঙেপড়া ক্যারাভানের কথা, আর মরুভূমির ভয়ঙ্কর পথের কথা। তবু মধ্য যুগে এশিয়ার ধনসম্পদের লোভ কোন বিদেশী বণিকই সম্বরণ করতে পারেনি। কেউ এসেছে ভিখারীর ছদ্মবেশে, কেউ এসেছে ভবঘুরের মতো। ইউরোপের কোন উদীয়মান ধনিক অভিজাত বংশের কেউ হয়ত একটা ছেঁড়া আল্‌খাল্লা প'রে মধ্য এশিয়ার এই সব ভয়ঙ্কর পথে পথে, এই সব অলৌকিক সহরে সহরে, এই সব ক্যারাভান্-সরাইয়ে, সমরকন্দ থেকে ইয়ারকন্দে, খোতানে, তুর্ফানের বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়িয়েছে। তারপর একদিন সেই রত্নলোভী বিদেশী বণিক অতি সন্তর্পণে কেনা গোলামের মতো প্রবেশ করেছে চেংগিসের বংশধর কোন তাতার খাঁর খাস্‌দরবারে, কোন আমীর-ওম্‌রাহের আউরঙ্গের সামনে। চারিদিকে ঝক্‌ঝক্ করছে তীর, বল্লম, তলোয়ার, ঝল্‌মল্ করছে সোনার চাঁদির আউরঙ্গ, মণিমুক্তার ঝালর দেওয়া ছত্র। দূরে ডুরাসানা-মঞ্জেল (দোতালা তাঁবু), চোবীনরৌতি, সরাপর্দ্দা, সামিয়ানা, মণ্ডল প্রভৃতি নানারকমের তাঁবু, তার সুলতানী বনাত, আর কিংখাপ ও মখমলে আঁটা খস্‌খসের বেড়া, গালীম-কালীম গাল্‌চের উপরে তাকিয়া-নেমীর। অস্ত্রাগার, অশ্বশালা, উষ্ট্রশালা। ধাঁধিয়ে যেত ইউরোপীয় বণিক, ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকত আর ভাবত সে যেন কোন্ যাদুপুরীতে এসেছে। মণিমুক্তা, ধনদৌলত ইউরোপীয় বণিকের জীবন সর্ব্বস্ব। কত গিরি-নদী মরুপ্রান্তর পার হয়ে বুকের রক্ত দিয়ে এ-দেশ

থেকে সেই রত্ন লুটতে এসেছে তারা। আর এমনই বিচিত্র এক দেশ এই এশিয়া, এ-দেশে প্রকৃতির এতই অকৃপণতা যে, এখানকার রাজা-বাদ্‌শাহরা রত্ন চেনে না, মরুভূমির বালির মতো দু'হাতে তাকে উড়িয়ে দেয়, বিলিয়ে দেয়। ত্যাগের কথা তাই বোধ হয় এশিয়ার মরু প্রান্তরে যুগ যুগ ধ'রে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

মার্কো পোলো (Marco Polo) এসেছিল একদিন ইউরোপ থেকে এশিয়ায় ঠিক এমনিভাবে ভবঘুরের মতো। তাতার খাঁর উদারতা আর নির্ম্মমতা দেখে মার্কো পোলো অবাক হয়ে গেল। এশিয়ার রত্ন সম্ভারের কথা সে স্বপ্নেও ভুলতে পারল না। মার্কিন নাট্যকার ও'নীলের "মার্কো মিলিয়নস্" নাটকের কথা বলছি। মার্কো ফিরে গিয়ে এক ভোজ সভায় আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের আমন্ত্রণ জানাল। কুব্‌লাই খাঁ ধ্যান-নিমীলিত চক্ষে দেখছেন সেই দৃশ্য। মার্কো সভায় এল তার বাপ্‌-খুড়োর সঙ্গে, পরণে পুরানো তাতার মুসাফিরদের আল্‌খাল্লা। দেখে সকলে চম্‌কে উঠল। মার্কো বলল: "চম্‌কে উঠো না। আজ থেকে একটা কথা মনে রেখো। বাইরের রূপ দেখে কোন কিছুর মূল্য যাচাই ক'রো না, কারণ—এই ছাখো!"—ব'লে মার্কো তার বাবা ও খুড়ো তিনজনেই তাদের আল্‌খাল্লার হাত দুটো প্রকাণ্ড একটা খালি জায়গার কাছে গিয়ে আল্‌গা ক'রে ঝুলিয়ে দিলে। জোরে বাজ্‌না বেজে উঠল ভোজ সভায়। বন্যা স্রোতের মতো হাতের ফাঁক দিয়ে রঙ বেরঙের মণিমুক্তা ঝ'রে পড়ল স্তূপাকারে। সকলে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ হয়ে থেকে একত্রে বিস্ময়ে ও আনন্দে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল— "অদ্ভুত! অদ্ভুত! হীরে! মণিমুক্তো! জহর-পান্না! কোটি, কোটি!"

বাস্তবিকই, মানুষ মজুরকে পরিশ্রম করতে দেখেছে মার্কো পোলো, ক্রীতদাস মানুষও দেখেছে লক্ষ লক্ষ, কিন্তু গুটিপোকা দেখতে পারে

কোথায় ? সভা গৃহে একজন রোষ্ট খেতে খেতে ভারী গলায় অন্তদের বললে : "মন দিয়ে শোন সকলে !" সকলে তখন গোগ্রাসে গিলছে। ভাল ভাল মদ আর মাংসের ভোজ দিয়েছে মার্কো, সবাই তখন তাই নিয়েই ব্যস্ত। এদিকে মার্কো প্রাণপণে ব'লে যাচ্ছে : "কোটি, কোটি ! কোটি, কোটি ! কোটি, কোটি !"

এই হ'ল এশিয়া। কিন্তু এ হ'ল এশিয়ার একদিক মাত্র, এবং বাইরের দিক। যেদিকে আমীর-ওম্‌রাহ্‌-খাঁদের দরবার, হারেম, অশ্বশালা, উষ্ট্রশালা, অস্ত্রাগার আর ওপ্‌চেকিখানা ; যেদিকে অন্যায় ও অবিচারের প্রতিমূর্ত্তি কাজীর বিচার চলে, বন্‌বন্‌ ক'রে গাজীর শম্‌শের অপরাধীর শিরশ্ছেদ করে ; যেদিকে মসজিদে নিত্যনৈমিত্তিক আজান শোনা যায়, এ হ'ল সেই দিক। আর একদিক আছে, এরই উল্টো দিক। এদিকের এই বন্য বিলাসিতা আর উন্মত্ততা, এদিকের এই অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য আর উদারতা না দেখলে উল্টো দিকের বীভৎসতা ও কদর্য্যতা উপলব্ধি করা সহজ হবে না। বোখারার মসজিদের রঙিন কারুকাজ করা মিনারের পাশে যখন "মৃত্যুর দুর্গ" তার বর্ব্বর উদ্ধত মূর্ত্তি প্রকাশ ক'রে দাঁড়াবে চোখের সামনে, তখন মুয়াজ্জিনের আজান আর মসজিদের মনোরম স্থাপত্যের কথা একেবারে ভুলে যেতে হবে আতঙ্কে। উদ্ধত যে 'মৃত্যুর দুর্গ' সহরের মধ্যে সমুন্নত শিরে দাঁড়িয়ে আছে তার উপর থেকে কত শত বীর বিদ্রোহীদের যে শান্‌ বাঁধানো পথের উপর ছুঁড়ে ফেলে হত্যা করা হয়েছে তার ঠিক নেই। এই সেই 'মৃত্যুর দুর্গ', আর ঐ সেই নস্‌রুল্লা খাঁর "যমপুরী !" আমীর-ওম্‌রাহের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করার জো নেই। দুর্ভেদ্য শৈলপ্রাচীরের মতো মধ্য এশিয়ার মধ্য যুগীয় সমাজ এমনই এক নীরেট নিস্পন্দ অচলায়তন যে তার মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের গুমরানির এতটুকু ফাঁক নেই।

আল্লাহ্ আর আমীরে কোন ভেদ নেই। আমীরের জবান্ আর শরিয়ত্ একই। আমীরের কথাই আইন, আমীরের ইচ্ছাই আইন। আমীরের খুশীতে কর্ম্মচারীদের কর্ম্মজীবনের আরম্ভ ও অবসান, এমন কি তাঁরই মর্জ্জির উপর সকলের প্রাণটুকু পর্য্যন্ত নির্ভরশীল। দাস চাই, দাস এনে দিতে হবে। শির চাই, শত্রুর শিরই আনতে হবে। বিদ্রোহীর তাজা খুন্ চাই তো তাই আনতে হবে, বেগম চাই তো সুন্দরী মেয়েদের বেঁধে এনে দিতে হবে। আমীর ভোগ ক'রে ধন্য করবেন। দীন দুঃখীর তাতে মঙ্গল হবে। পাথর-বাঁধানো যমপুরী আর মৃত্যু-দুর্গে যে কত সহস্র বিদ্রোহী দেশকর্ম্মী প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে তার হিসেব নেই। কেবল মৃত্যুদণ্ড দিয়েই আমীরের বর্ব্বর প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়নি। বিদ্রোহী ও অপরাধীদের নির্ম্মমভাবে অত্যাচার করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। নসরুল্লা খাঁর শান্-বাঁধানো যমপুরীর অন্ধকার পাতালগর্ভে বিষাক্ত সাপ, ইঁদুর, পোকা মাকড় রীতিমত যত্ন ক'রে পুষে রাখা হ'ত। অপরাধীদের দড়ি বেঁধে নামিয়ে দেওয়া হ'ত যমপুরীর অন্ধকার গর্ভে, যেখানে বিষাক্ত সাপ পোকামাকড়ের দংশনে অসহ্য যন্ত্রণায় তিলে তিলে অপরাধীরা সকলের অগোচরে মৃত্যু বরণ করবে।[৭] আমীরের স্বেচ্ছচারিতায় বিক্ষুব্ধ, আমীরের আসমান-প্রমাণ পাশবিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, এই তাদের একমাত্র অপরাধ।

আমীর ওমরাহদের বিলাসিতা যেমন মধ্যএশিয়ার মরু-প্রান্তর পর্ব্বত-মালার মতো সীমাহীন, বর্ব্বরতাও ঠিক তেমনি শৈলশৃঙ্গের মতো উদ্ধত। বিলাসিতার যেমন বাঁধন নেই, বর্ব্বরতাও তেমনি বাধাবন্ধহীন। আমীরদের উমেদারি যারা করত, কাজী-মোল্লা-মৌলবী ভূস্বামীর দল,

৭ Joshua Kunitz: Dawn Over Samarkand (Calcutta Edition 1940) P. P. 18-19



তারা হয়ত আমীরের আমিরী উদারতার পরিচয় ও স্পর্শ মধ্যে মধ্যে পেয়েছে, কিন্তু সাধারণ লোকে চিরদিন আমীরদের মধ্যে দেখেছে কিজিল্-কুম্ মরুভূমির মতো উদাসীনতা ও দয়াহীনতা, থিয়েন্-শানের মতো কঠিন পাথুরে প্রাণ। তবু দূর থেকে তারা সর্ব্বশক্তিমান দয়ার অবতার গরীবের আমীরের কাছে আতঙ্কে বিমূঢ় হয়ে মাথা হেঁট করেছে, বেইমানী করেনি, বিদ্রোহ করেনি। মধ্যে মধ্যে যখন অত্যাচার ও অবিচারের বান ডেকেছে বোখারায়, দেহের রক্তপ্রবাহ স্থির হয়ে এসেছে প্রায় ধ্বংসের ভয়ঙ্কর ইসারায়, বর্ব্বরতার ঘন ঘন ভ্রূকুটিতে, তখন,একমাত্র তখনই, সুপ্ত সমুদ্রগর্ভ থেকে ঠেলে-ওঠা ঐ সব পর্ব্বতমালার মতোই সমরকন্দ-বোখারার তলার মানুষ এক হয়ে ঠেলে উঠেছে উপরে, বিদ্রোহ করেছে। দেহের প্রতিটি স্নায়ু, শিরা-উপশিরা যখন আত্মসমর্পণ করেছে আমীরের সর্ব্বগ্রাসী অত্যাচারের কাছে, সহনশীলতার পর্ব্বত-প্রাচীর যখন বর্ব্বরতার হিমবন্যায় ভেসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, একমাত্র তখনই অন্ধ বশ্যতার গাঢ় অন্ধকার ভেদ ক'রে তারা বিদ্রোহ করেছে। আমীরের দণ্ডাঘাতে বিদ্রোহ চূর্ণ হয়েছে। যমপুরীর পাতাল-গর্ভে বিদ্রোহীরা দলে দলে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তাতার অশ্ব সাহীর তলোয়ার শত শত বিদ্রোহীর শিরশ্ছেদ করেছে, অবসান হয়েছে বিদ্রোহের। আবার শান্তি ফিরে এসেছে বোখারায়। সমরকন্দের বাগিচায় আবার ফল ফলেছে, ফুল ফুটেছে। মিষ্টি মিষ্টি রসাল ফল, রঙ-বেরঙের সুগন্ধি ফুল। হারেমে গুল্‌বদনা বেগমদের ঠোঁটের কাছে শরাবের পেয়ালা ধ'রে বোখারার আমীর স্বপ্ন দেখেছেন বেহেশ্‌তের।

স্বপ্ন দেখেছেন বেহেশ্‌তের, কিন্তু স্বপ্ন সত্য নয়। স্বপ্নস্বর্গ বোখারা, সমরকন্দ আসলে ছিল সপ্তম নরকের মতো ভীষণতম। আমীরের হারেম, আমীরের নীরেট পাথরের যমপুরী, আমীরের মৃত্যু দুর্গ, আমীরের

আম্‌লা-মোল্লা-কলিমুল্লার দল, আমীরের আমিরী বিলাসিতা ও বর্ব্বরতা—এই ছিল মধ্যএশিয়ার ইস্‌লাম-রাজ্যের বাস্তব ইতিহাস। বাইরে ছিল রেশম-গালিচা-বাগিচা, বাইরে ছিল প্রাসাদের চূড়া আর মসজিদের মিনার, অফুরন্ত ধনরত্ন ঐশ্বর্য্য এবং তাই নিয়ে আমীর-ওমরাহরা রচনা করেছিলেন মধ্যএশিয়ার স্বর্গরাজ্য, মধ্য এশিয়ার ইসলাম-ধর্ম্মরাজ্য, আর সভা-কবিরা রচনা করেছিলেন রোমান্টিক কাব্য ও বাদশাহ্‌-নামা।

ধর্ম্মরাজ্যে অধর্ম্মের বন্যাস্রোত বইত কোকন্দ, কিবা, বোখারার নদী-নালা-নর্দমায়, কাজীর বিচারশালায়, মোল্লার মসজিদে, আমীরের দরবারে ও হারেমে, সমরকন্দের বাজারে বাজারে, ক্যরাভান্‌-সরাইয়ে, মুসাফিরখানায়, চাখানায়। অন্যায়ের উদ্ধত শিলামূর্ত্তি ধারণ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল বোখারার বুকের উপর নস্‌রুল্লা খাঁর যমপুরী। তাই ইস্‌লামের ভ্রাতৃত্বের আদর্শ, ইস্‌লামের শরিয়ত্‌ মধ্যএশিয়ার খাঁদের গভীর আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধতে পারেনি কোনদিন। কোকন্দ-কিবা-বোখারা পরস্পরের দিকে বরাবর তলোয়ার উদ্যত ক'রে রেখেছে। গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে মধ্যএশিয়ার মরুপথে, গিরিপথে, আমু-দরিয়ায়, সির-দরিয়ায়, রাজধানীর বুকের উপর, মুসাফিরখানার নির্জ্জন কক্ষে রাজত্ব ও ঐশ্বর্য্যের লোভে মত্ত হয়ে পিতা-পুত্রে, ভাই-ভাইয়ে হানাহানি করেছে। বোখারা, সমরকন্দ, তাস্কেন্দের পথে পথে গোপন চক্রান্তের ফিস্‌-ফিসানি, হত্যার হতাশ চাপাকান্না ধ্বনিত হয়েছে। ক্ষমতালোলুপ খাঁদের পরস্পরের মধ্যে কেবল বিদ্বেষ আর হিংসা। কোথায় স্বর্গ, কোথায় ইস্‌লামের ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন? মরুভূমি সব যেন গ্রাস ক'রে নিয়েছে। একদিকে মরুভূমির বুকে ঘূর্ণীবায়ুর পৈশাচিক কান্নার ধ্বনি, আর একদিকে বোখারা-কিবা-কোকন্দের

নিরানন্দ চাষী, দিন মজুরদের বুকফাটা আর্ত্তনাদ। একদিকে শরাবখানার খোস্‌রোজের তরল কলোচ্ছ্বাস্‌, উদ্দাম বেপরওয়া বিলাস, আর একদিকে হারেমের বন্দিনীদের দীর্ঘশ্বাস, যমপুরীর বন্দীদের অসহ্য কাতরানি। তারই মধ্যে আমীর-ওম্‌রাহ্‌, কাজী-মোল্লা, আম্‌লা-বে, তারই মধ্যে মসজিদ-মাদ্রাসা, রাজপথ-ইঁদারা, বাগিচা-চাখানা-মুসাফিরখানা, তারই মধ্যে মশা-মাছি-ইঁদুর-কীট-পতঙ্গ-বীজাণু-ব্যাধি-অপমৃত্যু-শিশুমৃত্যু-মহামারী-দুর্ভিক্ষ-নরহত্যা-পিতৃহত্যা-ভ্রাতৃহত্যা-ব্যভিচার-উচ্ছৃঙ্খলতা—

এই সব নিয়ে এশিয়ার মধ্যমণি মধ্যএশিয়া—

এই সব নিয়ে বোখারা-সমরকন্দ-কিবা-কোকন্দ, ক্যাসপিয়ান্‌ থেকে থিয়েন্‌-শান্‌, নিঝ্‌ঝুম কিজিল্‌-কুম্‌ থেকে আসমান প্রমাণ ভয়ঙ্কর ধূসর তাক্‌লামাকান্‌—

এই নিয়ে মধ্যএশিয়া, মধ্য-যুগের মধ্য-এশিয়া, বিদেশী আলিবাবাদের রত্নগুহা, আমীর ওম্‌রাহদের স্বর্গপুরী, কাজী-মোল্লাদের বেহেশ্‌ত, আমলা-বে-দের "মগের মুল্লুক" আর গরীব দুঃখী চাষী মজুরদের যমপুরী—মধ্যএশিয়া—

হিমালয় স্বপ্ন দেখছে এই সেকালের এশিয়ার, ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন। হিমালয় দেখছে সেকালের এশিয়ার সেই বিভীষিকাময় দিনগুলি এপারে ভারতবর্ষে আজও বর্ত্তমানকাল রচনা ক'রে আছে—

হিমালয় স্বপ্ন দেখছে, মধ্যএশিয়ার মরুভূমির বালুকাগর্ভ গোরস্তান রচনা করেছে অতীতের সেই বর্ব্বর যুগের, অত্যাচারী ও বিলাসী মধ্য-যুগের—

আমীর-ওম্‌রাহদের পারস্পরিক বিদ্বেষ ও হানাহানির সুযোগ নিয়ে, পূবের সাইবেরিয়া, উত্তরের উরাল আর পশ্চিমের ক্যাস্‌পিয়ান সাগরের পথ ধ'রে সন্তর্পণে রুশ জারেরা তাঁদের হিংস্র থাবা বিস্তার

করেছেন মধ্য এশিয়ায়। সামাজিক বিশৃঙ্খলা, কুসংস্কার ও সর্ব্বাঙ্গীন অবনতির সুযোগ নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের দিকে ধীরে ধীরে তাঁরা সমগ্র মধ্য এশিয়াকে গ্রাস ক'রে ফেলেছেন, আমীর-ওম্‌রাহদের রোমানভ্‌ সাম্রাজ্যের আমলায় পরিণত করেছেন, মধ্যএশিয়ার অফুরন্ত ধনরত্ন, কাঁচামাল লুণ্ঠন ও শোষণ করেছেন—

ঠিক তেমনি একই উপায়ে, একই কারণে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের এই ভারতবর্ষের অধীশ্বর হয়ে বসেছেন, দিল্লীশ্বর জগদীশ্বর হয়েছেন। বণিকের ছদ্মবেশে প্রবেশ ক'রে, ভারতীয় সমাজের শোচনীয় বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতিপরায়ণতা, নবাব-বাদ্‌শাহদের পারস্পরিক বিদ্বেষ ও হানাহানির সুযোগ নিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের রাজসিংহাসন দখল ক'রে বসেছে। নবাবী আমলের সূর্য্য তখন অস্তাচলে—

তাতার মোগল চেংগিস্‌-তৈমুরের বংশধরদের, আমীর-ওম্‌রাহ, নবাব-বাদ্‌শাহদের রাজসিংহাসন তখন সমরকন্দ থেকে দিল্লী, কাবুল থেকে মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত টল্‌টলায়মান—

রুশ সাম্রাজ্যবাদ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সেই ঐতিহাসিক সুযোগে এশিয়ার অধীশ্বর হয়েছে—মস্কো থেকে সমরকন্দ, লণ্ডন থেকে দিল্লী পর্য্যন্ত বিরাট সাম্রাজ্যের সম্রাট—

এশিয়ার এই পথে এই দুই সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত হয়েছে দীর্ঘদিন। আফগানিস্তান, হিমালয়ের গিরিপথ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত—ভারত, মধ্যএশিয়া ও চীনের বহু দিনের পুরানো পথ, যুগযুগান্তের যোগাযোগের পথ—

সেই সব পুরানো পথ যার কথা আগে বলেছি—

চীনা পরিব্রাজকেরা এসেছিলেন যে-সব পথ ধ'রে, ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণেরা যে-পথ ধ'রে গিয়েছিলেন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে—

তাতার-তৈমুরের সেই অতি পরিচিত ভয়ঙ্কর পথ—

আজকের পথ নয়, একদিনের পথ নয়, একযুগের যোগাযোগও নয় এই পথে—

সমরকন্দ থেকে কাবুল, থিয়েন্-শান্ হয়ে তুর্ফান ও তাক্লামাকান্, তারপর চীন—

ভয় পাবারই কথা। পথের কথা চিন্তা ক'রে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সব সময় সন্ত্রস্ত—রুশ সাম্রাজ্যবাদের ভয়ে—

রুশ সাম্রাজ্যবাদ, রোমানভ্ বংশ, জারের সাম্রাজ্য, সব নিশ্চিহ্ন হয়েছে ১৯১৭ সালে—পেট্রোগ্রাদে, মস্কোয়, তাস্কেন্দে—১৯১৯ সালে কিবায়, ১৯২০ সালে বোখারায়। যুগযুগান্তের পুঞ্জীভূত অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচার নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। মধ্যএশিয়ায় আর আমীর-ওম্রাহরা নেই, জারের বংশধরেরা নেই, কাজী-মোল্লা-বে-রা নেই। রুশ-মোঙ্গল-তাতার-তুর্কী-তাজিক্-উজ্বেক সকলেই আছে, শুধু সেই গোপন হিংসা আর উদ্ধত উলঙ্গ বর্ব্বরতা নেই, সেই তৈমুর, নসরুল্লা, আলিম, ইব্রাহিম ও রোমানভ্দের বংশধরেরা নেই—

তবু তো সেই পথ আজও রয়েছে! রুশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হয়েছে, তাতার-তুর্কী-তাজিক্-উজ্বেক্রা স্বাধীন হয়েছে, সাম্যের ও ন্যায়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছে, সমাজতন্ত্রের জয় হয়েছে সমরকন্দে, চাষীমজুরের রাজ হয়েছে বোখারায়। কিন্তু তবু বিপ্লব তো সেই বহু শতাব্দীর পুরানো পথ নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি—যে-পথে তাতাররা ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছিল দিল্লীর দিকে, যে-পথে বৌদ্ধ ভিক্ষু, শ্রমণ, চীনা পরিব্রাজক ও বিদেশী বণিকরা যাতায়াত করেছিল একদিন, যে-পথে ভারত, মধ্য এশিয়া ও চীন একদিন এক হয়ে গিয়েছিল—

একদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভয় ছিল রুশ সাম্রাজ্যবাদের। কাবুলে

তাই এই পথ নিয়েই ঘন ঘন কূটনৈতিক ঘূর্ণীর সৃষ্টি হয়েছে রুশ দূত, বৃটিশ দূত আর আফগানিস্তানের আমীরের মধ্যে। রুশ সাম্রাজ্যবাদ আজ আর নেই। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তা জানে মর্ম্মে মর্ম্মে। কারণ তার পরিবর্ত্তে মধ্যএশিয়ায় আজ যে আদর্শের ধ্বজা উড়ছে, তার লাল রঙ, তার তারকা, তার কাস্তে আর হাতুড়ির প্রতীক-চিহ্ন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে আরও ভয়ঙ্কর, আরও প্রলয়ঙ্কর বিভীষিকা। তাই পথের গুরুত্ব আজ আরও শত-সহস্রগুণ বেশী। শুধু বৃটেনের কাছে নয়, দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে, চীনের ও ভারতের নবাব-বাদশাহ্, ধনিক-বণিক-রাজা-উজীরদের কাছেও।

তাই যা নেই তাই নিয়ে হল্লা। তাই রুশ সাম্রাজ্যবাদের প্রেতাত্মাকে কবর থেকে খুঁড়ে এনে কল্পনার রাজসিংহাসনে বসিয়ে বৃটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের, দুনিয়ার ধনিক-বণিক-রাজা-উজীরদের আজ রাজনৈতিক সভা-সম্মেলনে আর্ত্তনাদ ক'রে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে হ'চ্ছে। তা না হ'লে তাদের সাম্রাজ্য যায়, তাদের লুণ্ঠন ও শোষণের রামরাজত্ব যে চ'লে যায়!

যদি সমরকন্দ বোখারার আদর্শ গণবিপ্লবের বন্যাস্রোতে নেমে আসে দুর্দ্ধর্ষ বেগে সেই পুরানো ঐতিহাসিক পথ দিয়ে, ঘোরাবান্দ নদীর তীর ধ'রে, হিন্দুকুশ ও হিমালয়ের গিরিপথ অতিক্রম ক'রে—!

যদি "লালতারা" কার্পেথিয়ান্ ও আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতমালা পার হয়ে চ'লে আসে ইউরোপের মধ্য গগনে!

যদি "লালতারা" হিমালয়-শৃঙ্গে জ্ব'লে ওঠে!

যদি "লালতারা" গোবি মরুভূমির মাথার উপরে নির্মেঘ আকাশ-পথে চীনের প্রাচীর ডিঙিয়ে নেমে আসে—!

সাম্রাজ্যবাদীদের সামনে বিভীষিকা। ভয়ঙ্কর বিভীষিকা ইউরোপ

ও এশিয়ার, ইরান-তুর্কী,ভারত ও চীনের রাজা-উজীর-ধনিক-বণিক-আমীর-বাদ্‌শাহদের সামনে জীবন-মরণ সমস্যা! তাই তো তারা বিকারগ্রস্ত রুগীর মতো দেখছে চোখের সামনে মৃত জারের কঙ্কাল ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে জীবন্ত স্টালিনের কঠোর মূর্ত্তিতে ক্রেম্‌লিনের হলঘরে—

তা দেখুক, ক্ষতি নেই। তবু তারা জানে এ মিথ্যা বিকার, প্রলাপ। যতদিন সাম্রাজ্যবাদের শ্বাস থাকবে ততদিন এই মিথ্যাকে হল্লা ক'রে সত্য প্রতিপন্ন করার আশাও তাদের থাকবে। কিন্তু ইতিহাস এই 'মিথ্যাকে' আবর্জ্জনাস্তূপে নিক্ষেপ ক'রে এগিয়ে যাবে—

হিমালয় স্বপ্ন দেখছে, সে-দিনের সেই সুদূর অতীতের স্বপ্ন আর অনতিদূর ভবিষ্যতের স্বপ্ন—

সুদূর অতীতের স্বপ্ন—আর্য্যদের আদি বাসভূমি মধ্য এশিয়ার স্বপ্ন—পামিরবাসীদের (Pamirians) স্বপ্ন—

জাতিবিদ্‌ ও প্রত্নবিদ্‌দের তর্কের তুফান উঠেছে এই মধ্য এশিয়া কেন্দ্র ক'রে। তর্কের শেষ হয়নি আজও। তবু আজ অনেকেই এ-বিষয়ে একমত যে এশিয়ার বক্ষঃস্থলেই আর্য্যদের আদি বাসভূমি—মরুময় পার্ব্বত্য মধ্য এশিয়াই মানবসভ্যতার শৈশবকালের লীলাক্ষেত্র—

স্যর অরেল্‌ ষ্টাইন্‌ (Aurel Stein), উজফল্‌ভি (Ujfalvy প্রমুখ প্রত্নবিদ্‌রা পামির ও তুর্কিস্তানের বাসিন্দাদের আকার-বৈশিষ্ট্য বিচার ক'রে বলেছেন যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে পামির ও তাক্‌লামাকান্‌ মরুঅঞ্চলে আর্য্য জাতির গোলমাথাবিশিষ্ট (brachy-cephalic) একটা শাখা বাস করত। সুতরাং আর্য্যরা যে মধ্য এশিয়া থেকেই পূবে ও পশ্চিমে ভাগ হয়ে যায়, এ-কথা আজ মেনে নেওয়া চলে। পশ্চিমে যারা যায় তারা রুশ, গ্রীস্‌, ইতালী, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে উপনিবিষ্ট হয়। এই সব দেশের শ্লব্‌, গ্রীক্‌, ইতালীয়, টিউটন্‌, কেল্‌ট জাতির লোকেরা এক

প্রাচীন আর্য্যদেরই বংশধর। আর একদল মধ্য এশিয়া থেকে দক্ষিণে ইরানে আসে এবং সেখান থেকে আসে পূবে ভারতবর্ষে। এরাই হ'ল বেদ-রচয়িতা ভারতীয় আর্য্য। ভারতের আদিবাসীদের (তথাকথিত 'অনার্য্য') মধ্যে যারা আর্য্যদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে পারল না তারাই পালিয়ে গেল ভারতের বনে জঙ্গলে ও পার্ব্বত্য-অঞ্চলে—তাদেরই বংশধর আজকালকার কোল-ভীল-সাঁওতাল-মুণ্ডা, গোঁড়-খন্দ-ওরাঁও মালের, গারো-বোডো-কুকি-নাগা।

অতীতের সেই স্বপ্নস্মৃতি হিমালয় আজও ভোলেনি—স্বপ্নাবিষ্ট বৃদ্ধ হিমালয় দেখছে—ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান, সিন্ধু, গুজরাট, দাক্ষিণাত্য, উড়িষ্যা ও বাংলা দেশের অধিবাসীরা সেই পামিরের পাহাড়ী তাজিক্, সেই তুর্কীস্তান, খোরাসান ও আফগানিস্তানের তাজিক্, সেই আদি পামিরবাসীদের বংশধর সব—৮

কে জানৃত, তাজিক্‌রা আছে আফগানিস্তানে—তাজিকের বংশধরেরা আছে সিন্ধু-বেলুচিস্তানে, গুজরাটে, দাক্ষিণাত্যে— ?

কে জানৃত—আমরা বাঙ্গালীরা পামিরের তাজিক্‌দের বংশধর? প্রত্নবিদ্‌রা জানেন—জাতিবিদ্‌রা জানেন—আর জানে বৃদ্ধ হিমালয়—

হিমালয় তাই স্বপ্ন দেখছে—তাজিক্‌রা গড়েছে তাজিকিস্তান—আর আমরা হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের অন্তর্দ্বন্দ্বে, জাত্যভিমানে অন্ধ হয়ে গোরস্থানের দিকে এগিয়ে চলেছি।

হিমালয়ের স্বপ্ন বিকারের দুঃস্বপ্ন নয়—

হিমালয় জানে আমীরের পোড়ো প্রাসাদের শূন্য দালানে নূতন এশিয়ার বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার তৈরী হয়েছে, আমীর ফিরে আসবে না আর—

হিমালয় জানে, পুরানো বোবা স্মৃতির চাপা কান্না মধ্য এশিয়ার

মরুভূমিতে হয়ত মধ্যে মধ্যে হু হু করবে, মরাদিনের জমাট-বাঁধা অন্ধকার গুমরে উঠবে মধ্য এশিয়ার অচল অটল গিরিকণ্ঠে, কিন্তু মধ্য এশিয়ার বিগত যুগ আর ফিরে আসবে না। ফিরে আসবে না আর তাতার-তুর্কীর অত্যাচারের যুগ, আমীর মোল্লার বিলাসী বর্ব্বরতার যুগ, সাম্রাজ্যলোভী রুশ জারের শোষণের অন্ধকার যুগ—

সমরকন্দ-বোখারার আকাশে উজ্জ্বল 'লালতারার' দিকে চেয়ে চেয়ে, পামির-হিন্দুকুশ-থিয়েন্-শানের পর্ব্বতচূড়ায় উড্ডীন সাম্য ও স্বাধীনতার লাল পতাকার দিকে চেয়ে চেয়ে, হিমালয় আজ সেই সব বহু পুরাতন ঐতিহাসিক পথের স্বপ্ন দেখছে---

দুর্গম পার্ব্বত্য পথ—দারপথ, জন্নপথ, অজপথ, মেণ্ঢপথ, বংশপথ, শকুনপথ, মূষিকপথ, শঙ্কুপথ—

পেশওয়ার-সিন্ধ থেকে কাবুল, কাবুল থেকে কাফেরস্তান, কাফেরস্তান থেকে তাস্কেন্দ-সমরকন্দ—

---

৮ Ramaprasad Chanda : The Indo-Aryan Races : Pp. 71-78

সিংহ-ভালুক কথা

পেশওয়ার থেকে কাবুল—

আফগানিস্তান—

কাফেরস্তান, গান্ধার, নগরহার, লম্পাক্, উড্ডিয়ান—তাস্কেন্দ-সমরকন্দ—

ভারতবর্ষ থেকে মধ্য এশিয়া যাবার সব চাইতে প্রশস্ত পথ ছিল একদিন।

এই পথে আমরা তাতার-তুর্কী-মোঙ্গলদের পর বৃটিশ সিংহ ও রুশ ভালুকের সাক্ষাৎ পাই। বিগত শতাব্দীতে এই পথ নিয়ে সিংহ ও ভালুকের মধ্যে অনেক কাম্ড়াকাম্ড়ি হয়েছে। রুশ-আফগান সীমান্ত থেকে কাবুল নদীর উপর দিয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ছায়া পড়েছে রুশ ভালুকের, শিউরে উঠেছে বৃটিশ সিংহ। কেশর ফুলিয়ে গর্জ্জন করেছে বারম্বার। হিমালয়ের শৈলগুহায় ও গিরিবর্ত্মে, আফগানিস্তান সীমান্তে প্রতিধ্বনিত হয়েছে সেই গর্জ্জন।

তাস্কেন্দ-সমরকন্দ থেকে রুশ ভালুকেরও হুঙ্কার শোনা গিয়েছে। রুশ ভালুক আজ তুষারগর্ভে সমাধিস্থ। তবু প্রাচীনদের আতঙ্ক আজও যায়নি, লোল-চর্ম্ম বৃটিশ সিংহ আজও ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, আফগানিস্তানে ও ইরানে, সেই মৃত রুশ ভালুকের অশরীরী প্রেতাত্মা দেখে আঁৎকে উঠছে। আজকের ভয় আরও ভয়ঙ্কর। রুশ ভালুকের পরিবর্ত্তে আজ "বল্‌শেভিক দৈত্য" দাঁড়িয়ে আছে আফগান সীমান্তে। আর যাই হ'ক, ভালুক ছিল সিংহের মাসতুতো ভাই। সাম্রাজ্যের ক্ষুধা মিটে গেলে দু'জনের বন্ধুত্ব হতেও দেরী হ'ত না। আফগানিস্তানের আমীরের দরবারে ব'সে একজন যেমন আর একজনের দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে চেয়েছে, তেমনি সময় ও সুযোগ বুঝে পরস্পর পরস্পরের গাও চেটেছে। আমীর অবাক হয়ে দেখেছেন। একদিকে সিংহ আর একদিকে ভালুক, দু'য়ের মধ্যিখানে ব'সে আফগানিস্তানের আমীর যেমন দু'জনকেই নাচিয়েছেন, তেমনি আবার নিজেও নেচেছেন। একদিকে রুশ ভালুক, আর একদিকে বৃটিশ সিংহ, মধ্যে আফগানিস্তানের আমীর। ভালুকের দিকে সুনজর দিলে সিংহ কেশর ফুলিয়ে দাঁড়ায়, সিংহের দিকে সুনজর দিলে সমরকন্দ থেকে ভালুক গা-ঝাড়া দেয়। দীর্ঘদিন এইভাবে কাটে।

রুশ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ-সংঘাত ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করেছে কাবুলে। রুশ সাম্রাজ্যবাদ অবলুপ্ত, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ অবলুপ্তির পথে। তাই তার আতঙ্ক আজ এত উগ্র। বল্‌শেভিক দানব শুধু সিংহের নয়, সিংহ-সূর্য্য-স্বস্তিকা প্রভৃতি যাবতীয় সাম্রাজ্যবাদের নির্ম্মম শত্রু। সাম্যবাদী আদর্শের পরিপন্থী সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদের চিতাভস্মের উপরেই সাম্যবাদের ভিৎ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। বোখারা সমরকন্দে রুশ-সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসস্তূপের উপর সমাজতন্ত্রবাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী

উড়েছে। বিপ্লবের রক্তে রাঙ্গা তার রঙ। আফগান সীমান্ত থেকে দেখা যায়। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে দূরেও নয়।

সিংহ ভালুকের রেষারেষি আজকের কথা নয়, অনেক দিনের কথা। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত ইউরোপের অভিযাত্রী সাম্রাজ্যলোভীরা দক্ষিণ-পশ্চিমের পথ ধ'রে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতবর্ষে আসার চেষ্টা করেছে। নেপোলীয়নিক যুদ্ধের পর এই পথ সম্পূর্ণ বৃটিশের আয়ত্তে যখন এল, তখন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যলোভীরা ভিন্ন পথের সন্ধানে অভিযান আরম্ভ করলেন। নেপোলীয়নের মিশর আক্রমণ এবং গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের পথ ধ'রে তাঁর এশিয়া যাত্রা করার পরিকল্পনা, ভারতের উত্তর-পশ্চিম পথের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। রুশ জারদেরও অনুরূপ অভিসন্ধি প্রকাশ পায়। এই পথের মধ্যে পড়ে ইরান, ইরাক, মিশর প্রভৃতি দেশ এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিমের পার্ব্বত্য-অঞ্চল। এইসব অঞ্চলের দিকে তখন সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ। রুশ জার তখন পারস্যের শাহ্‌কে উস্কানি দিয়ে পূবের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন এবং নিজের প্রভাবও সেই সঙ্গে প্রসারিত করছেন। ১৮৩১ সালে কিবা, ১৮৩২ সালে খোরাসান্ দখল করা হ'ল। ১৮৩৭ সালে হীরাট্ অবরুদ্ধ করা হ'ল। জারের তাঁবেদার পারস্যের শাহ্ তখন তাঁর বিরাট হৃত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলি নিজে পুনরুদ্ধার করার পরিকল্পনা করেছেন। পারস্যের শাহ্ যখন এইভাবে তাঁর পূর্ব্বের সীমান্তের দিকে জারের প্ররোচনায় ও প্রভাবের বশবর্ত্তী হয়ে এগিয়ে চলেছেন তখন আফগানিস্তানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা শোচনীয়, গৃহযুদ্ধ চলেছে। বৃটিশ সিংহের ভয় হ'ল। পামার্ষ্টন্ তখন বৃটিশ বৈদেশিক মন্ত্রী, এবং ভারতে লর্ড উইলিয়াম্ বেণ্টিকের পর তখন লর্ড অক্ল্যাণ্ড বড়লাট হয়ে এসেছেন। ভারতের সীমান্তের দিকে রুশিয়ার

অগ্রগতির জন্যে পামার্ষ্টন্ চিন্তিত হলেন এবং এই অগ্রগতি প্রতিরোধ করার জন্যে লর্ড অক্ল্যাণ্ডকে তিনি নির্দেশ দিলেন। পামার্ষ্টন্ জানালেন যে এই অঞ্চলে রুশ প্রভাব বৃদ্ধির ফলে ভারতবর্ষে আমাদের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনা আছে। এ প্রায় ১৮৩৬ সালের কথা, আজকের কথা নয়। ১ তারপর এই সিংহ ও ভালুকের রেষারেষি নিয়ে প্রথম আফ্গান যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় আফ্গান যুদ্ধের কারণও এই একই সিংহ-ভালুকের পারস্পরিক বিদ্বেষ ও বৈরিতা। একপাশে ভালুক আর একপাশে সিংহ এবং মধ্যখানে আমীর থাকাতে সমস্ত ঝড়টা আফগানিস্তানের উপর দিয়ে ব'য়ে গিয়েছে।

দোস্ত্ মহম্মদ খাঁ তখন আফগানিস্তানের আমীর। ইংরেজদের রুশাতঙ্ক তখন প্রবল। এদিকে পারস্যের শাহ্ রুশ সেনাপতির অধীনে প্রায় হীরাটের কাছাকাছি এসে হাজির। দোস্ত্ মহম্মদ তাই ইংরেজের সাহায্য-প্রার্থী হলেন। ইংরেজের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের তাঁর প্রধান শর্ত্ত হ'ল, রণজিৎ সিংহের কাছ থেকে পেশওয়ার কেড়ে নিয়ে আবার আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ক'রে দিতে হবে। ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড অক্ল্যাণ্ড বিষম সমস্যার মধ্যে পড়লেন। কারণ রণজিৎ সিংহ ইংরেজের একান্ত অনুগত এবং তাঁর মতো একজন দুর্দ্ধর্ষ ইংরেজ-ভক্ত ভারতের সীমান্ত প্রদেশে থাকা বিশেষ প্রয়োজন। পারস্যের ও রণজিৎ সিংহের আক্রমণে দোস্ত্ মহম্মদ খাঁ ইংরেজের সামরিক সহায়তাও দাবী করলেন। লর্ড অক্ল্যাণ্ড তাঁর কোন আবেদনই মঞ্জুর

১ The Cambridge Shorter History of India : Edited by H. H. Dodwell (1943); Chap XIV, pp. 803-823

করলেন না এবং উত্তরে জানালেন যে স্বাধীন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা বৃটিশ সরকারের নীতি নয়। এ উক্তি অবশ্য কোন বৃটিশ শাসকের মুখেই শোভা পায় না। একান্ত স্বার্থের খাতিরেই লর্ড অকল্যাণ্ড সেদিন যেমন এই উক্তি করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তেমনি আবার অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি প্রমাণও ক'রে দিয়েছিলেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কোন উক্তি-চুক্তি বা অঙ্গীকারের মর্য্যাদা রাখতে রাজী নয়, যদি তাদের স্বার্থে আঘাত লাগে। ইংরেজের বন্ধুত্বলাভে ব্যর্থ হয়ে দোস্ত্ মহম্মদ খাঁ মহাসমারোহে যখন রুশ দূতকে তাঁর দরবারে অভ্যর্থনা করলেন তখন ইংরেজ দূত ভারতে ফিরে এসে জানালেন যে আমীর রুশদের সঙ্গে সন্ধি ক'রে ফেলেছেন। শঠচূড়ামণি ইংরেজ শাসকের মাথায় তখনই কূট চক্রান্তের ঢেউ খেলে গেল। লর্ড অকল্যাণ্ড ঠিক ক'রে ফেললেন যে রণজিৎ সিংহের সাহায্যে দোস্ত্ মহম্মদকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে সেখানে পলাতক সুজাউল মুলক্‌কে বসাতে হবে। প্রতিপক্ষ হিন্দুশক্তির সাহায্যে বেইমান শাহসুজাকে আমীরের সিংহাসনে বসানোর বুদ্ধি অনেক ঐতিহাসিকই তারিফ করেননি, ইংরেজ রাজনীতিকদের মধ্যেও অনেকে সেদিন এই নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু গর্ব্বান্ধ অকল্যাণ্ড সাহেব কারও কথায় কর্ণপাত না ক'রে হঠকারিতায় মেতে উঠলেন। স্বয়ং রণজিৎ সিং পর্য্যন্ত তাঁর পরিকল্পনা সমর্থন করলেন না এবং তাঁর রাজ্যের ভিতর দিয়ে আফগানিস্তান আক্রমণ করতে দিতে তিনি রাজী হলেন না। বাধ্য হয়ে সিন্ধুদেশের ভিতর দিয়ে বোলান্ গিরিবর্ত্ম অতিক্রম ক'রে আফগানিস্তান অভিমুখে অভিযান করা হবে স্থির হ'ল। সিন্ধুদেশের আমীরদের সঙ্গে ইংরেজদের চুক্তির শর্ত্ত অনুসারে ইংরেজ সৈন্য সে-দেশের মধ্য দিয়ে অন্যদেশ আক্রমণ করতে পারে না, কিন্তু ইংরেজের স্বার্থ

চুক্তির শর্তের চাইতে অনেক বড়ো। চুক্তি তাই ছিন্নপত্রের মতো পায়ে দ'লে ইংরেজ সৈন্য সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করল। দোস্ত্ মহম্মদ কাবুল পরিত্যাগ করলেন এবং পলাতক শাহ্-সুজাকে নিয়ে ইংরেজরা বুক ফুলিয়ে কাবুলে প্রবেশ করল।

কাবুলে প্রবেশ করল বটে, কিন্তু আফগান জাতিকে বশ করা অত সহজ নয়। দেখতে দেখতে আফগানিস্তানে বিদ্রোহের আগুন জ্ব'লে উঠল। ক্ষিপ্ত আফগান জনতা একদিন ইংরেজ দূতকে বাড়ীর ভিতর থেকে বাইরে এনে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেলল। গুলীগোলা কামান-বন্দুক কাবুলে ফেলে রেখে, দৈব ও দোস্ত্ মহম্মদের পুত্র আকবর খাঁর আশ্রয়ে প্রায় ১৬,০০০ ইংরেজ সৈন্য ভারত অভিমুখে রওনা হ'ল। কিন্তু আকবর খাঁর সাধ্য কি আফগান জাতির প্রতিহিংসার বন্যা রোধ করেন। পথের আশেপাশে বিদ্রোহীরা ওঁৎ পেতে ছিল। প্রতিহিংসার শানিত উদ্যত বল্লম চারিদিক থেকে এসে ইংরেজ সৈন্যদের বুকে বিঁধল। একমাত্র ডাঃ ব্রিডন্ নামক একজন ইংরেজ শেষ পর্য্যন্ত প্রাণটা নিয়ে কোনরকমে রক্তাক্ত দেহে জালালাবাদ এসে উপস্থিত হলেন। বাকী সকলে কাবুলের গিরিপথে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের দুর্নীতির ও বেইমানির খেসারৎ দিল।

লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের পর লর্ড এলেন্‌বোরো যখন ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন তখন জালালাবাদে, গজ্‌নীতে ও হীরাটে ইংরেজ সেনারা অবরুদ্ধ। তাঁরা প্রতিশোধ নেবার জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। অসীম বীরত্ব দেখিয়ে গজ্‌নী সহর শ্মশানে পরিণত ক'রে তাঁরা আবার এসে কাবুলে প্রবেশ করলেন। প্রথম আফগান যুদ্ধের এই মর্ম্মান্তিক অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্টই বুঝা গেল যে কাবুলে একজন শক্তিশালী আমীর না থাকলে যেমন আফগানিস্তানের কল্যাণ নেই, তেমনি ইংরেজেরও স্বস্তি নেই। আর

বেয়নেট দিয়ে দুর্দ্ধর্ষ আফগান জাতিকে বশ করাও যাবে না। তাই দোস্ত্ মহম্মদ খাঁকে আবার আফগানিস্তানের আমীরের সিংহাসনে বসানো হ'ল। কিন্তু দোস্ত্ মহম্মদের মৃত্যুর পর কাবুলের সিংহাসন নিয়ে আবার অন্তর্বিপ্লবের আগুন জ্ব'লে উঠল আফগানিস্তানে। দোস্ত্ মহম্মদের ষোলজন পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র আফজল খাঁকে তিনি জীবদ্দশায় কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত ক'রে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রিয় পুত্র শের আলী খাঁ তাঁর সঙ্গেই থাকতেন। পিতার মৃত্যুর পর শের আলী আফগানিস্তানের আমীর ব'লে ঘোষণা করলেন নিজেকে। সিংহাসনের পথের কাঁটা দূর করবার জন্যে কয়েকজন ভাইকে হত্যা ক'রে অন্যান্য ভাইদের ক্ষমতা কেড়ে নেবার জন্যে শের আলী চেষ্টা করতে লাগলেন। তাই আফগানিস্তানে আবার গৃহযুদ্ধ দেখা দিল।

শের আলীর সঙ্গে আফজল খাঁর তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল। শের আলী কাবুল থেকে বিতাড়িত হয়ে কান্দাহারে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তারপর কান্দাহার থেকে বিতাড়িত হয়ে এলেন হীরাটে। ইত্যবসরে আফ্জল খাঁর মৃত্যু হ'ল। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আবদুর রহমান খাঁ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হলেও তিনি তাঁর ভাই আজিম খাঁকে সিংহাসন ছেড়ে দিলেন। এদিকে শের আলীর পুত্র ইয়াকুব খাঁ কান্দাহার পুনরায় দখল করেন এবং শের আলী নিজে কাবুল আক্রমণ করেন। আবদুর রহমান ও আজিম খাঁ আফগানিস্তান ছেড়ে পারস্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মেশ্হাদ থেকে তেহারান যাবার পথে আজিম খাঁ মারা যান। আবদুর রহমান খাঁ বুঝতে পারলেন যে পারস্যের আশ্রয়ে থেকে কোনদিন তাঁর কামনা চরিতার্থ হবে না। তাই তিনি তাস্কেন্দে গিয়ে রুশ সরকারের আশ্রয় নিলেন। রুশ সরকার একজন ক্রুদ্ধ ও শক্তিশালী আফগান যুবরাজকে পেয়ে হাতছাড়া করলেন না।

এদিকে ১৮৬৪ সালে রুশ জার দ্রুতগতিতে প্রায় কোকন্দ, কিবা ও বোখারার সীমান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছেন। ১৮৬৫ সালে তাস্কেন্দ জারের করতলগত হয়েছে। ১৮৬৭ সালে রুশ-তুর্কীস্তান গঠন করা হয়েছে এবং বোখারা হয়েছে জারের অধীন রাজ্য। ১৮৭৩ সালে কিবার ভাগ্যেও তাই ঘটল। দেখতে দেখতে মধ্য এশিয়ার সম্রাট হয়ে সিংহাসনে বসলেন রুশ জার। উদ্দেশ্য হ'ল, তুর্কীস্তানে এমন একটি মজবুত সামরিক ঘাঁটি দখল ক'রে বসা যেখান থেকে ভারত আক্রমণের ভয় দেখিয়ে বৃটেনকে সংযত রাখা যাবে।

সেই একই সিংহ-ভালুকের রেষারেষি এবং নিয়ে হানাহানি। একদিকে ইংরেজরা অসভ্য এশিয়াকে সুসভ্য করার ঐশী দায়িত্ব পালনে ব্রতী হলেন, আর একদিকে রুশ জারও অসভ্য ও অর্দ্ধ-বর্ব্বর এশিয়ার সভ্যতার আলোক বিতরণের দায়িত্ব নিলেন। এশিয়ার বুকের উপর দুই সীমান্তে দুই শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদ এসে মুখোমুখী দাঁড়াল, মধ্যে রইল সেতুর মতো দুর্দ্দান্ত ও অশান্ত আফগানিস্তান।[২]

১৮৬৭ সালে রুশ জেনারেল কাউকম্যান্ রুশ-তুর্কীস্তানের শাসনকর্ত্তা হয়ে এলেন। ১৮৬৮ সালে বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লরেন্স সাহেব আফগানিস্তানের আমীর শের আলীকে বহু অস্ত্রশস্ত্র ও ন' লক্ষ টাকা উপঢৌকন পাঠালেন। আফগানিস্তানের আকাশে জমাট-বাঁধা মেঘ গুমরে উঠল। বৃটিশ সিংহ এবং রুশ ভালুকের গর্জ্জনে কেঁপে উঠল কাবুল, কান্দাহার। লর্ড লরেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর লর্ড মেয়ো এলেন ভারতের বড়লাট হয়ে। আফগান সমস্যার

২ A. Besant : England, India and Afganisthan
F. H. Fisher : Afganisthan and the Central Asian Question
Iqbal Ali Shah : Modern Afganisthan.

একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করার চেষ্টা করলেন তিনি। শের আলী তাঁকে জানালেন যে, বার্ষিক একটা টাকার বন্দোবস্ত করতে হবে, যখনই প্রয়োজন হবে সৈন্যসামন্ত অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে হবে এবং তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ইয়াকুব খাঁর বদলে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহ্ জান্‌কে তাঁর উত্তরাধিকারী ব'লে মেনে নিতে হবে। শের আলীর এই সব শর্ত্ত মেয়ো সাহেব মুখে মেনে নিলেন বটে, কিন্তু এর ভিত্তিতে কোন পাকাপাকি সন্ধি করতে রাজী হলেন না। লর্ড মেয়োর পর লর্ড নর্থব্রুক এলেন। ইংরেজরা ইয়াকুব খাঁকে আমীরের সিংহাসনে বসাতে, কিন্তু শের আলী এদিকে ঘোষণা ক'রে দিলেন যে ইয়াকুব খাঁর বদলে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহ্ জান্‌ই আফগানিস্তানের আমীর হবেন ভবিষ্যতে। লর্ড নর্থব্রুক পত্রের মারফৎ প্রতিবাদ জানালেন। লর্ড স্যালিসব্যারী তখন ভারত-সচিব। ওদিকে তাঁর রুশ-ভালুকের আতঙ্কে রীতিমতো ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে। এতদিন পর্য্যন্ত আফগানিস্তানে ইংরেজ দূতরূপে একজন ক'রে মুসলমানকেই নিয়োগ করা হ'ত। স্যালিসব্যারী সাহেব বৃটিশ রাজদূত নিয়োগ করার জন্যে এবং কাবুলে বৃটিশ দূতাবাস গঠন করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। লর্ড নর্থব্রুকের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হ'ল। নর্থব্রুক সাহেব লিখলেন যে, আমীর সম্বন্ধে এতো সন্দেহের কারণ নেই। তাতে অবশ্য লর্ড স্যালিসব্যারীর সন্দেহ গাঢ়তর হ'ল। তিনি লর্ড নর্থব্রুকের বদলে লর্ড লীটনকে ভারতের বড়লাট নিয়োগ করলেন। লর্ড লীটনের সঙ্গে শের আলীর আলাপ আলোচনা ব্যর্থ হ'ল। শের আলীর কাছে লীটন সাহেব প্রস্তাব করলেন যে আফগান দরবারে একটি বৃটিশ মিশন পাঠানো হবে। শের আলী সম্মত হলেন না। ১৮৭৬ সালে তিনি খেলাতের খাঁর সঙ্গে সন্ধি ক'রে কোয়েটায় ইংরেজ সৈন্য রাখার ব্যবস্থা করলেন। কোয়েটা থেকে বোলান্ গিরিপথের মধ্য দিয়ে আফগানিস্তান

যাওয়া যায়। শের আলী বিচলিত হলেন। শের আলীর সুযোগ্য মন্ত্রী সৈয়দ নূর মহম্মদ সন্ধিশর্ত্ত আলোচনার জন্যে আবার পেশওয়ার এলেন, কিন্তু আবার আলোচনা ব্যর্থ হ'ল।

ওদিকে আফগান সীমান্তের ওপারে তাস্কেন্দে ব'সে আবদুর রহমান খাঁ তার হৃত সিংহাসন পুনরুদ্ধারের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছেন। তিনি কাবুলের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করছেন। ১৮৭৮ সালের জুন মাসে রুশ সেনাপতি ষ্টোলেটফ্ তাস্কেন্দ থেকে কাবুল রওনা হন। শের আলী তাঁকে আফগানিস্তানে আসতে নিষেধ করেন, কিন্তু রুশ সেনাপতি জানান যে যদি তাঁকে গ্রহণ করা না হয় তাহ'লে অতি শীঘ্রই আবদুর রহমান খাঁ কাবুলের সিংহাসন পুনর্দখল করার জন্যে সসৈন্যে রওনা হবেন। আবদুর রহমান খাঁর বীরত্ব ও রণনৈপুণ্যের কথা শের আলী ভালভাবেই জানতেন। সুতরাং রুশিয়ার সঙ্গে সন্ধি করা ছাড়া তাঁর আর গত্যন্তর রইল না এবং রুশ মিশনকেও তিনি গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। এই সংবাদে লীটন সাহেব ক্রুদ্ধ হয়ে শের আলীকে জানালেন যে বৃটিশ মিশনকেও গ্রহণ করতে হবে, বৃটিশ অনুমতি ভিন্ন অন্য কোন সরকারের সঙ্গে আফগান সরকারের সন্ধি করার স্বাধীনতা থাকবে না এবং হিরাটে স্থায়ী বৃটিশ-রেসিডেণ্ট রাখতে হবে। এদিকে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট মিশন পাঠাচ্ছেন শুনে সেনাপতি ষ্টোলেটফ্ কাবুল পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন। মেজর ক্যাভানারীর অধিনায়কত্বে বৃটিশ মিশন পেশওয়ার থেকে রওয়ানা হ'ল। আলী মস্‌জেদের কাছে আফগান সরকারের সৈন্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল মিশনের। মিশন ফিরে এল পেশওয়ারে। লর্ড লীটন বৃটিশ সরকারের কাছে যুদ্ধের অনুমতি চেয়ে পাঠালেন। বৃটিশ মন্ত্রিসভা জানালেন যে আমীরের কাছ থেকে একটি শেষ জবাব চাওয়া হ'ক। আমীরকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে ২০শে নভেম্বরের

(১৮৭৮) মধ্যে যদি বৃটিশ শর্ত্ত না মেনে নেওয়া হয়, এবং বৃটিশ মিশন প্রত্যাখ্যানের জন্যে জবাবদিহি না করা হয়, তাহ'লে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে। ২০শে নভেম্বরের মধ্যে উত্তর এল না কাবুল থেকে। বৃটিশ ও আফগানে যুদ্ধ বাধল, দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ।

তিন দিক দিয়ে আফগানিস্তান আক্রমণ করা হ'ল। স্যার স্যামুয়েল ব্রাউন্ খাইবার গিরিপথের মধ্য দিয়ে আলী মস্‌জেদ দখল ক'রে জালালাবাদের দিকে অগ্রসর হলেন। মেজর জেনারেল রবার্টস্ আর একদল সৈন্য নিয়ে কুরম্ উপত্যকার দিকে এবং ষ্টুয়ার্ট বোলান্ গিরিপথের মধ্য দিয়ে কান্দাহারের দিকে অগ্রসর হলেন। এই ত্রিমুখী অভিযান প্রতিরোধ করা শের আলীর পক্ষে সম্ভব হ'ল না। তিনি রুশ-তুর্কীস্তানে পলায়ন করলেন। বৃটিশ সরকার শের আলীর জ্যেষ্ঠপুত্র ইয়াকুব খাঁকে আমীর ব'লে স্বীকার করলেন এবং ১৮৭৯ সালের মে মাসে গণ্ডমেক্ নামক স্থানে নূতন আমীরের সঙ্গে ইংরেজের সন্ধি হ'ল। সন্ধিতে স্থির হ'ল যে বৃটিশ সরকারের সম্মতি না নিয়ে আফগানিস্তান অন্য কোন শক্তির সঙ্গে সন্ধি করতে পারবে না, কাবুলে স্থায়ী বৃটিশ রেসিডেণ্ট রাখতে হবে এবং হীরাট ও অন্যান্য নগরে বৃটিশ এজেণ্ট থাকবে। কুরম্ ও বোলান্ গিরিপথের কাছাকাছি স্থানগুলি সম্পূর্ণ বৃটিশের অধীনে ছেড়ে দিতে হবে। তার বদলে ইংরেজ তাদের বিবেচনা মতো অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যসামন্ত দিয়ে সাহায্য করবে এবং বার্ষিক ছ'লক্ষ ক'রে টাকা দেবে। সন্ধি হ'ল বটে, কিন্তু ইয়াকুব খাঁর দরবারে বৃটিশ মিশনকে দেখে আফগান জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ইংরেজ রাজদূতরা রাজকার্য্যেও যখন হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করলেন তখন আফগান জাতির মধ্যে আবার বিদ্রোহানল ধূমায়িত হতে থাকল। রুশ মধ্য এশিয়ায় ব'সে ব'সে আবদুর রহমান খাঁ আফগানিস্তানের

এই করুণ পট পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করছিলেন। এতদিন পর সেই ঐতিহাসিক শুভ মুহূর্ত্ত এসেছে। বিধর্ম্মী ইংরেজকে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে আবদুর রহমান কয়েকশত অশ্বারোহী নিয়ে রুশ মধ্য এশিয়ার প্রান্তর গিরিপথ ডিঙিয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করলেন। আফগান জনতা তাঁর আহ্বানে ছুটে এল। আফগানদের মধ্যে আবদুর রহমানের এই অসাধারণ প্রভাব দেখে ইংরেজরা ভয় পেল। পত্র মারফৎ তাঁকে মৈত্রী জ্ঞাপন করা হ'ল এবং কাবুলের সিংহাসন অধিকার করার জন্যে সাদর আহ্বান জানানো হ'ল। আফগানিস্তানে বৃটিশ রেসিডেণ্ট রাখবার দাবী ইংরেজ তুলে নিল। আবদুর রহমান আবার স্বাধীন আফগানিস্তানের আমীর হয়ে বসলেন।

আবদুর রহমান খাঁর রাজত্বকাল থেকে বাদশাহ আমানুল্লাহ্‌র রাজত্ব পর্য্যন্ত আধুনিক আফগানিস্তানের নবজন্মের ইতিহাস, সংস্কার ও বিপ্লবের ইতিহাস।[৩] আফগানিস্তানের খণ্ড খণ্ড নানা উপজাতি ও উপদলগুলি বিরাট সম্মিলিত আফগান জাতির সংহত মূর্ত্তি ধারণ করল। শাসন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে আফগান জাতি আধুনিক পশ্চিমের পথে অগ্রসর হ'ল। আমীর আমানুল্লাহ্‌ আফগানিস্তানকে আধুনিক ইউরোপের মতো সুসভ্য ও সুশিক্ষিত করার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। রূঢ় ও দুর্দ্ধর্ষ আফগানরা আধুনিকতার পথে অভিযান করল।

এই সময় এক অঘটন ঘটল। প্রথম মহাযুদ্ধের আঘাতে ইতিহাসের চাকা ঘুরে গেল রুশিয়ায়। জারের রাজত্ব ও সাম্রাজ্যের পুরাতন পাকা বনিয়াদ গণ-বিপ্লবের বন্যায় ভেসে গেল। ইঙ্গ-রুশ মৈত্রী রাতারাতি নির্ম্মম শত্রুতায় পরিণত হ'ল। বিপ্লবের প্রচণ্ড জোয়ার রুশিয়ার প্রান্তর পার হয়ে মধ্যএশিয়ার মরু-প্রান্তর গিরিপথের দিকে এগিয়ে এল। কিবা,

৩ Iqbal Ali Shah : The Tragedy of Ama llah

বোখারা, তুর্কীস্তানের আমীর-ওমরাহ্, কাজী-মোল্লারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। এই সময় আফগানিস্তানের আমীর আমানুল্লাহ্ও সজাগ হলেন। ইতিহাসের এই সুবর্ণ সুযোগে আমানুল্লাহ্ বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ভারত সীমান্তের উপজাতিদের মধ্যে দেখা গেল আমানুল্লাহের স্বাক্ষরিত প্রচারপত্র বিলি হ'চ্ছে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করা হ'চ্ছে এইসব প্রচারপত্রের মধ্য দিয়ে। আমানুল্লাহ্ বল্‌শেভিকদের গুপ্তচর কি না, গুজব র'টে গেল। ভারত সীমান্তে বৃটিশে আফগানে আবার যুদ্ধ বাধল। তৃতীয় আফগান যুদ্ধ। ইংরেজরা থলেব রণাঙ্গনে আফগানদের কাছে পরাজিত হয়ে আফগানিস্তানকে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র ব'লে স্বীকার ক'রে নিল। কিন্তু এইখানেই এর শেষ হয়ে গেল না। আমানুল্লাহের বিরুদ্ধে ইংরেজদের মারাত্মক অভিযোগ রয়েই গেল। আমানুল্লাহ্ অবিশ্বাসী। কাবুলের সিংহাসনে যতদিন তিনি ব'সে থাকবেন ততদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা নেই। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্য জাতি হয়ত দুর্ব্বার গতিতে নেমে আসবে একদিন, তার সঙ্গে হয়ত পামির ও হিন্দুকুশের গিরিপথ অতিক্রম ক'রে বল্‌শেভিক দৈত্যকুল এসে মিলিত হবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিধন-যজ্ঞে। এবার আর জারাতঙ্ক নয়, বল্‌শেভিক দৈত্যের আতঙ্ক, বিপ্লবের আতঙ্ক। অতএব আমানুল্লাহ্‌কে সিংহাসন-চ্যুত না করতে পারলে বৃটিশ সিংহের শান্তি নেই। খাইবার ও বোলান গিরিপথের দিকে চেয়ে বৃটিশ সিংহ সদা-জাগ্রত প্রহরীর মতো ব'সে থাকে।

মধ্য এশিয়ায় তখন বিপ্লবের জোয়ার কানায় কানায় ভরা। বৃটিশ সিংহ সোৎসাহে তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমীর-মোল্লাদের ত্রাণকর্ত্তা হয়ে। খিবা-বোখারার আমীরের রাজসিংহাসন ও রাজপ্রাসাদের ভগ্নস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে বৃটিশ সিংহের সে কি হতাশ গর্জ্জন ও আস্ফালন!

আমীরের ফরমানের পর ফরমান বিপ্লবের ঝড়ে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাচ্ছে, মোল্লার প্রাণপণ চীৎকার শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। আফগানিস্তানের খাঁ-সর্দ্দার ও মোল্লারা এপার থেকে আতঙ্কে অসাড় হয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন কিবা-বোখারা তাস্কেন্দ-সমরকন্দের দিকে। এই হ'ল সুবর্ণ সুযোগ। পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত, আধুনিক আফগানিস্তানের স্রষ্টা বৃটিশ-বিদ্বেষী আমানুল্লাহ্‌কে সিংহাসন-চ্যুত করার এই হ'ল সুযোগ। আমানুল্লাহ্‌ বিধর্ম্মী, আমানুল্লাহ্‌ বেইমান, আমানুল্লাহ্‌ ইস্‌লাম-বিদ্রোহী ব'লে প্রচার করতে পারলে ক্ষিপ্ত আফগানদের বিদ্রোহের আগুনে আমানুল্লাহের সিংহাসন পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। বিভিন্ন আফগান উপজাতিদের মধ্যে যদি একবার বিভেদ-বৈষম্যের বিষ ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহ'লে আফগানিস্তানকে রক্ষা করার সাধ্য নেই কারও। ইংরেজের কূটবুদ্ধি সজাগ হয়ে উঠল। চারিদিকে আকাশ-বাতাসে আমানুল্লাহের ইউরোপ ভ্রমণের কাহিনী, তাঁর স্বেচ্ছাচার ও ইসলাম-দ্রোহিতার অতিকথা, তাঁর আধুনিকা বেগম-সাহেবার নামে নানারকম মিথ্যা রূপকথা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হ'ল। জাল ফটোও প্রচার করা হ'ল অনেক। অশিক্ষিত মোল্লারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ইসলামধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত দেশদ্রোহী আমানুল্লাহ্‌ আফগানিস্তানকে হয়ত বল্‌শেভিকদের কাছে বিকিয়ে দেবেন। বৃটিশের মিথ্যা প্রচার ও গোপন ষড়যন্ত্র চলল পূর্ণোদ্যমে। নাস্তিক, বিধর্ম্মী বল্‌শেভিকরা এলে আফগানদের মর্ত্ত্যের বেহেশ্‌ত ধূলিসাৎ হয়ে যাবে, ইসলাম ধর্ম্ম ধ্বংস হয়ে যাবে। এই হ'ল বৃটিশের মিথ্যা প্রচারের একটানা একঘেয়ে সুর। এই মিথ্যা প্রচারে আফগানিস্তানের মোল্লা-সর্দ্দাররা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বল্‌শেভিজম-এর আতঙ্ক তাদেরও কম নয় কিছু। আফগান সীমান্তে তাদেরই ধর্ম্ম ভাইদের শোচনীয় অবস্থা দেখে তারাও আতঙ্কিত

হয়েছে। তার উপর নূতন বিপ্লবী সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে দূরদর্শী আমানুল্লাহ্ ইংরেজের মন্ত্রণায় ও প্ররোচনায় বিরোধিতা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করেননি। ১৯২০ সাল থেকেই কাবুলে সোভিয়েট দূত যাতায়াত করছেন। ১৯২১ সালে সোভিয়েট-আফগান মৈত্রী ও নিরপেক্ষতার চুক্তিও আমানুল্লাহ্ করেছেন। ১৯২৬ সালে আবার এই চুক্তি নূতন ভাবে করা হয়েছে। বৃটিশ কুটনীতিকরা বুঝিয়ে দিলেন যে বল্‌শেভিকরা কাবুল থেকে কান্দাহার পর্য্যন্ত দূতাবাস গঠন করতে চাচ্ছে, আফগানিস্তানে বল্‌শেভিজম আমদানি করার জন্যে। আমানুল্লাহ্ নিজে ইসলাম-দ্রোহী, বিধর্ম্মী, তাই তাঁর মধ্যেও বল্‌শেভিজম-প্রীতি দেখা দিয়েছে। নির্ব্বুদ্ধি খাঁ সাহেবরা ক্ষেপে গেলেন। ধর্ম্মভীরু মোল্লারা ও অশিক্ষিত সর্দ্দাররাও ক্ষেপে উঠলেন। অজ্ঞ, কুসংস্কার-পীড়িত আফগান জনসাধারণও ক্ষেপে উঠল। উপজাতিদের উস্কানি দিয়ে একজনের বিরুদ্ধে আর একজনকে লেলিয়ে দেওয়া হ'ল। আমানুল্লাহের আবেদন-আরজি ব্যর্থ হ'ল সব। আমানুল্লাহ্ আবেদন করলেন, তিনি বিধর্ম্মী নন, তিনি বেইমান নন। ইসলামের তিনিও একজন দীন সেবক, খোদাতায়ালার অসীম অনুগ্রহজীবি একজন অতি-সাধারণ আফগান মাত্র। তাঁর জীবনের একমাত্র ধ্যান আফগানদের কল্যাণ। কিন্তু বৃটিশের বিষে এর মধ্যেই কাজ হয়ে গিয়েছে। আমানুল্লাহের আবেদনে কেউ কর্ণপাত করল না, বৃটিশের মিথ্যা প্রচার ও ভেদনীতিরই জয় হ'ল। ত্রিশ হাজার শিনোয়ারী সহসা পার্ব্বত্য প্রদেশ থেকে দুর্ব্বার বেগে নেমে এসে ডাক্কা গ্রাম ধ্বংস ক'রে জালালাবাদের দিকে অভিযান করল। জালালাবাদের রাজপ্রাসাদের চারিদিকে আগুন ধরিয়ে তারা কাবুলের দিকে রওনা হ'ল। ভাই-ভাইয়ে যুদ্ধ ক'রে রক্তক্ষয় করতে আমানুল্লাহ্ চান না, খোদাতায়ালার নির্দ্দেশও বোধ হয় তা নয়। ইসলামের প্রকৃত

অনুরাগী আমানুল্লাহ্ তাই অকারণ রক্তক্ষয়ের পথে না অগ্রসর হয়ে শিনোয়ারীদের সঙ্গে সন্ধিশর্তের আলোচনা করতে লাগলেন। এমন সময় আফগানিস্তানের পার্ব্বত্য প্রদেশের এক দুরন্ত দস্যুর মনে বহুদিনের লালিত বাদ্‌শাহ হবার কামনা জেগে উঠল। ভিস্তির ছেলে ব'লে এই দস্যুর নাম ছিল 'বাচ্চাই সাক্কা'। বিপুল সেনাদল নিয়ে বাচ্চাই সাক্কা কাবুলের পথে এগিয়ে চলল, বাদ্‌শাহ হবার বাসনা তার এইবার সে চরিতার্থ করবেই। ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ের আশঙ্কায় আমানুল্লাহ্ পদত্যাগ করলেন। তারপর বাচ্চাই সাক্কা নাম বদলে হলেন গাজী হবিবুল্লাহ্ খাঁ এবং বাচ্চাই সাক্কার বাদ্‌শাহী সুরু হ'ল। আফগানিস্তানের ছেলেমেয়ে নির্ব্বিশেষে সকলের শিক্ষা বন্ধ ক'রে দিয়ে, কাবুলের যাদুঘর ধ্বংস ক'রে, ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান অধ্যয়নকে ইসলাম-বিরুদ্ধ ব'লে ঘোষণা ক'রে, তার বিরুদ্ধবাদীদের কাফের ব'লে ফর্‌মানের পর ফর্‌মান জারী ক'রে, গাজী হবিবুল্লাহ্-রূপী 'বাচ্চাই সাক্কা' নিজেকে ইসলামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাদ্‌শাহ ব'লে জাহির করলেন। ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! খোদাতায়ালা নিশ্চয়ই মুচ্‌কি হাসলেন আসমানে। আমানুল্লাহ্ হলেন ইসলামদ্রোহী কাফের, আর 'বাচ্চাই সাক্কা' হ'ল আল্লাহের শ্রেষ্ঠ রসুল। অজ্ঞ ও অন্ধ আফগানদের এই হ'ল বিচার।

আফগানিস্তানের এই ইতিহাসটুকু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন হ'ল এইজন্যে যে বৃটিশ সিংহ ও রুশ ভালুকের বহু পুরাতন পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষই হ'ল আফগানদের হানাহানির মূল কারণ। একদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, আর একদিকে রুশ জারের সাম্রাজ্যবাদ, এই দুই বৃহৎ শক্তির মাঝখানে প'ড়ে সমস্ত ঝড়ঝাপ্‌টা গিয়েছে আফগানিস্তানের মাথার উপর দিয়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বল্‌শেভিক বিপ্লবের প্রচণ্ড

আঘাতে জীর্ণ রুশ সাম্রাজ্যবাদের সিংহাসন ধূলায় লুটিয়ে পড়ল, কিন্তু বিজয়ী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ শক্তিশালী হয়ে হাটু গেড়ে বসল পৃথিবীর বুকে।

রুশ সাম্রাজ্যবাদ একেবারে ধ্বংস হয়ে যাক এ-কামনা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কোনদিন করে নি। কোন সাম্রাজ্যবাদই আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর অবলুপ্তি কামনা করে না। তাকে দুর্ব্বল করতে চায়, নিজেকে শক্তিশালী করতে চায়, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের ভিৎ ধ্ব'সে পড়ুক, এ কোনদিনই সাম্রাজ্যবাদীরা চায় না। রুশিয়ায় যখন জারের সিংহাসন ধূলিসাৎ হয়ে গেল, বিপ্লবের লেলিহান শিখা দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠল মস্কো-পেট্রোগ্রাদ থেকে তাস্কেন্দ সমরকন্দ পর্য্যন্ত, তখন পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের পরিণামের কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। তারা সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে বিপ্লব দমন করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করল কিন্তু সফল হ'ল না। আজও সেই আতঙ্ক সাম্রাজ্যবাদীদের মনে পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করছে। পৃথিবীর অন্যতম সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ব'লে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদেরই আজ বিপ্লবাতঙ্ক ও সোভিয়েটাতঙ্ক সব চেয়ে বেশী। ইরান আজ সেই পুরাতন আতঙ্ক ও ঝঞ্ঝার কেন্দ্রস্থল।

যে-দেশের জনসাধারণ অশিক্ষিত, অজ্ঞ ও ধর্ম্মান্ধ, সে-দেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে বল্‌শেভিজম-বিরোধী ও সোভিয়েট-বিরোধী মিথ্যা প্রচার করা সহজ। আফগানিস্তানের মর্ম্মস্পর্শী ইতিহাস তারই অন্যতম নিদর্শন। কিন্তু বল্‌শেভিজমের প্রাথমিক জ্ঞান যাঁদের আছে, যাঁরা সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার মুসলমানদের বর্ত্তমান জীবনযাত্রার কাহিনী ও সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরাই স্বীকার করেন যে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা বল্‌শেভিকদের আদর্শ নয়। সভ্যতার আলোক বিতরণ করার জন্যে কামান-বন্দুক

হাতে নিয়ে, বেয়নেট্ উঁচিয়ে, দেশ থেকে দেশান্তরে অভিযান করা, দেশের নিরীহ-নির্দোষ জনসাধারণকে শোষণ ও শাসন করা সাম্রাজ্যবাদী শাস্ত্রবিধি-সম্মত। বল্‌শেভিজম বা সাম্যবাদের আদর্শ তা নয়। সভ্যতার মশাল জ্বালিয়ে, বন্দুক কিরিচ হাতে নিয়ে, বল্‌শেভিকরা দেশ থেকে দেশান্তরে অভিযান করেনি এবং নিজেদের রাজত্ব কোথাও কায়েম করেনি। বল্‌শেভিকদের কোন রাজত্ব নেই, সাম্রাজ্যও নেই, তাই কায়েম করার প্রশ্নই ওঠে না। রুশিয়ার বল্‌শেভিজম যেমন বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়নি, সেখানকার নিঃস্ব, শোষিত চাষী মজুর ও জনসাধারণ নিজেদের রক্ত দিয়ে তার প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তেমনি অন্যান্য দেশের চাষী মজুর ও জনসাধারণকেও রক্তক্ষয় ক'রে সেই সাম্যের ও স্বাধীনতার আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সোভিয়েট ইউনিয়নকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ব'লে একমাত্র সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের অনুচরেরাই প্রচার ক'রে থাকেন, আসলে এ অভিযোগ একটা আজগুবী মিথ্যা কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। 'সাম্যবাদ' বা বল্‌শেভিজম হ'ল আদর্শ, সকল দেশের, সকল মানুষের, সকল সময়ের।

বিপ্লবাতঙ্ক থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হ'ল মিথ্যা প্রচার। তাই তারা সোভিয়েট রাষ্ট্রকে, সোভিয়েট অ... কে স্বগোত্র ব'লে প্রচার ক'রে থাকে। কোন দেশের গণ-বিদ্রোহ ও গণ-অভ্যুত্থানকে তাই সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েট ষড়যন্ত্র ব'লে রটনা করে, তার প্রমাণ বর্ত্তমানে ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রের গণ-আন্দোলন, এবং প্রাচ্যের ইরান, চীন ও ভারতবর্ষ। আজারবৈজান্ ও তেহারানে যে গণ-বিপ্লবের পদধ্বনি শোনা যায় তা হ'ল ইতিহাসেরই জয়যাত্রার পদধ্বনি। সাম্রাজ্যবাদীরা তাকে রুশ ভালুকের পদধ্বনি ব'লে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। আফগানিস্তানেও একদিন এই পদধ্বনি

তারা শুনেছিল, তাই আমানুল্লাহ্ দেশবাসীর কাছে কাফের প্রমাণিত হলেন এবং তাঁকে সিংহাসনও ত্যাগ করতে হ'ল। বৃটিশ সৈন্য কতবার অভিযান করেছে কাবুলে তার রক্তাক্ত নজীর আছে ইতিহাসে, কিন্তু আফগান সীমান্ত থেকে বল্‌শেভিক দানবরা কাবুল অভিমুখে যাত্রা করেনি কোনদিন, করবেও না। আফগানরাই একদিন সাম্যবাদের আদর্শ কাবুলে প্রতিষ্ঠা করবে। বোখারা, সমরকন্দ, তুর্কীস্তানের মুসলমানেরা, তাজিক-উজ্‌বেকরা যেমন ঘোষণা করেছে যে আমীর-ওম্‌রাহ্‌, খাঁ-মোল্লাদের স্বেচ্ছাচারিতা, জুলুম-জবরদস্তি, শোষণ-লুণ্ঠন, ও হারেম-বিলাসিতা ইসলামের আদর্শ নয়, শরিয়তের বিধান-সম্মত নয়, কোরআন শরীফের কোন আয়াত-সম্মত নয়, তেমনি আফগানিস্তানের পুষ্টুন, হাজারা, তাজিক, উজ্‌বেক প্রভৃতি মুসলমান চাষী-মজুর-সাধারণও একদিন দৃপ্তকণ্ঠে এই বাণী ঘোষণা করবে। ভারত, চীন ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের মুসলমানদের কণ্ঠ থেকেও একদিন এই ঐতিহাসিক শোহরত্‌ই শোনা যাবে।

সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ভারতের আমীর-ওম্‌রাহ্‌-বাদ্‌শাহরা, খাঁ সাহেব ও কাজী-মোল্লারাও ব'লে থাকেন যে, সাম্যবাদ ইসলামের শত্রু, সোভিয়েট ইউনিয়ন ইসলামকে ধ্বংস করতে চায়। সাম্রাজ্যবাদীদের মিথ্যা অপপ্রচারকে খোদাতায়ালার বাণীর মতো ধ্রুব সত্য ব'লে বিশ্বাস না ক'রে যদি তাঁরা একবার মধ্য এশিয়ায় ঘুরে আসেন, তাহ'লে দেখতে পাবেন যে সাম্যবাদের আদর্শের মধ্যে সেখানে ইসলামেরই জয় হয়েছে, তাস্কেন্দ-বোখারা-সমরকন্দে শরিয়তের বিধিসম্মত বেহেশ্‌তই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। খোদাতায়ালার কেয়ামতের অনুষ্ঠান হয়েছে বিপ্লবের মধ্যে। বিধর্মী, অত্যাচারী কাফের আমীর-ওম্‌রাহ ও কাজী-মোল্লাদের আল্লাহ্‌ই দোজখের ভয়ঙ্কর আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ

করেছেন, তারা পুড়ে খাক্ হয়ে গিয়েছে। আল্লার কেয়ামতের ন্যায়-বিচার বিপ্লবের অগ্নিমূর্ত্তিতে দেখা দিয়েছে। মধ্য এশিয়ার মরুভূমির মতো বোখারা-সমরকন্দের তাজিক-উজ্‌বেক-তুর্কোম্যান্ মুসলমানদের বুকফাটা আর্ত্তনাদ আল্লাহ্ শুনেছেন এবং বিচারের দণ্ড ধরেছেন। বোখারা-সমরকন্দে কেয়ামতের অনুষ্ঠান হয়েছে। ইসলামের জয় হয়েছে সাম্যবাদের আদর্শের মধ্যে।

আমু-দরিয়ার তীরে দাঁড়িয়ে আফগানরা দেখছে, সীমান্তের ওপারে ঐ তাজিক-উজ্‌বেকরা ট্রাক্‌টর চালাচ্ছে, কলকারখানা গ'ড়ে তুলছে। মরুভূমির উপর দিয়ে, পর্ব্বতমালার উপর দিয়ে হাওয়াই জাহাজ উড়ে আসছে একেবারে কাবুল পর্য্যন্ত। সীমান্ত পার হয়ে মধ্যে মধ্যে দল বেঁধে আফগানরা চ'লে আসে তাজিকিস্তানে। কোন একজন তাজিক তরুণের সঙ্গে তাদের দেখা হয়, কথাবার্ত্তা হয়:

১ম আফগান: তোমরা আমাদের দেশে গিয়ে আমাদের শিখিয়ে দাওনা কেন—কি ক'রে ট্রাক্‌টর চালাতে হয়, কলকারখানা গড়তে হয়?

২য় আফগান: তোমরা কেমন সুখী ও স্বাধীন পরিবারের ভাইদের মতো মিলে মিশে রয়েছ। তোমাদের মধ্যে আমীর বাদ্‌শাহ নেই, সিংহাসন নিয়ে হানাহানি নেই। লেখাপড়া শিখে তোমরা নিজেরাই আজ শরিয়তের অর্থ বুঝতে পার, ইসলামের আদর্শ কি তা জানো। ধর্ম্মান্ধ মোল্লা-মৌলবীরা তোমাদের কাছে খুসীমতো ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করতে পারে না—

৩য় আফগান: আমাদের দেশে তোমরা যাও না কেন? আমরা কি তোমাদের ভাই নই?

তাজিক তরুণ: (হাসতে হাসতে) নিশ্চয়ই তোমরা আমাদের ভাই। কিন্তু আমরা কি করব বলো? যখন দেখি তোমরা ভাই

ভাইয়ে মারামারি কাটা-কাটি করো, ধর্ম্মের নামে মিথ্যা কথা ব'লে তোমাদের আমীর-বাদ্‌শাহ-মোল্লারা তোমাদের প্রতারণা করে, তোমাদের বঞ্চিত ক'রে নিজেরা ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ডুবে থাকে—তখন আমাদের দুঃখ হয়, মনে হয় কবে তোমরা এই মিথ্যা ও মহাপাপের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবে। আমরা তো যেতে পারি না ভাই! কারণ তোমাদের দেশ ওটা, তোমরাই ও-দেশের মানুষ, স্বাধীন ও সুখী পরিবার ও-দেশে তোমাদেরই গড়তে হবে। আমাদের কাছ থেকে শিখতে পার কেমন ক'রে গড়তে হয়, কিন্তু আমরা তোমাদের দেশে যেতে পারি না— আমাদের আদর্শ তা নয়—"৪

হতাশ হয়ে আফগানরা ফিরে এসেছে। মধ্যে মধ্যে দল বেঁধে তারা সীমান্ত পার হয়ে চলে গিয়েছে তাজিকিস্তানে। সেখানকার সমবায় কৃষি প্রতিষ্ঠানে, কলকারখানায় এই সব প্রবাসী আফগানদের আজও দেখা যায়।

কাবুলে ব'সে, দিল্লী ও সিমলায় ব'সে আজও বৃদ্ধ বৃটিশ সিংহ মৃত রুশ ভালুকের প্রেতাত্মার দুঃস্বপ্ন দেখছে। দুঃস্বপ্ন দেখছে ইরান ও আফগানিস্তানের আমীর-বাদ্‌শাহরা, ভারতের খাঁ সাহেব ও কাজী মোল্লারা—কিন্তু

স্বপ্ন দেখছে ইরান-আফগানিস্তান, আগামীকালের হিন্দুস্থান, পাকিস্তান—মৃত ভালুকের দুঃস্বপ্ন নয়—বৃদ্ধ বৃটিশ সিংহের গলিত নখদন্তও নয়—তাজিকিস্তানের স্বপ্ন—উজবেকিস্তান, কাজাকস্তান, তুর্কীস্তানের স্বপ্ন।

৪ Joshua Kunitz : Dawn over Samarkand (Calcutta Edition) p. 6

বাদ্‌শাহী বেহেশ্‌ত

বোখারা-সমরকন্দ বলতে চোখের সামনে যেন একরাশ তুল্‌তুলে রেশমী স্বপ্ন ঝল্‌মল্‌ ক'রে ওঠে। যেন পৃথিবীর সমস্ত রহস্য, সমস্ত সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য এশিয়ার বুকের মধ্যে (মধ্য এশিয়ায়) সযত্নে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। একদিকে প্রকৃতির অকৃপণতা, আর একদিকে নির্ম্মম রুক্ষতার এমন অপূর্ব্ব সমাবেশ সচরাচর দেখা যায় না। বিশাল ঔদার্য্য ও আমিরী বিলাসিতার সঙ্গে অপরিসীম ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার কাঠিন্য · ন এশিয়ার এই মাটির মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে। তার উপর আমীর-ওম্‌রাহ, কাজী-মোল্লারা "সবার উপরে মানুষ সত্যের" মতো চরম ও পরম সত্যরূপে বিরাজ করছেন। মধ্য এশিয়ার মরুভূমির মতো বোখারা কিবার আমীর-ওম্‌রাহদের দিগন্ত-বিস্তৃত উদাসীনতা ও অমানুষিকতা এবং মধ্য এশিয়ার উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালার মতো তাদের উদ্ধত অহমিকা। এরই মধ্যে মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন জাতি-উপজাতি যুগ যুগ ধ'রে বাস করছে। ইসলামের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে মধ্য এশিয়ার আদিম অধিবাসীরা

কখনও উদ্বুদ্ধ হয়নি। ইসলামের বাণী যাঁরা বহন ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন আরব দেশ থেকে এশিয়ার বুকে, তাঁরা তুরস্ক-তেহারান থেকে দিল্লী পর্য্যন্ত বিরাট এক সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন, কিন্তু ইসলামের মহান্ আদর্শকে মানুষের অন্তরের মণিকোঠায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। নূতন এক জাগ্রত শক্তির কাছে ক্ষয়িষ্ণু শক্তি মাথা হেঁট করেছে মাত্র। উদ্যত বর্শা ও বল্লম ইসলামের জয় ঘোষণা করেছে। সাধারণ মানুষ, পীড়িত ও অত্যাচারিত মানুষ "ইসলামের" মধ্যে মুক্তি ও সাম্যের বাণী শুনে মুগ্ধ হয়েছে, নূতন এক বিশ্বমানবতার মঙ্গল আহ্বান কানের ভিতর দিয়ে বাস্তবিকই তাদের মর্ম্মে পৌছেচে। তাই তারা ইসলাম ধর্ম্মে দলে দলে দীক্ষা গ্রহণ করেছে। শুধু আরবের মরু-প্রান্তরে নয়, অথবা এশিয়ায় নয়, ইউরোপে পর্য্যন্ত ইসলামের প্রভাব-বিস্তার একদিন ঐতিহাসিক সত্য হয়ে উঠেছিল। সপ্তম শতাব্দীর শেষ-ভাগ থেকে ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্ম্মের সংঘর্ষ বাধে এবং প্রায় চার শতাব্দী ধ'রে এই সংঘর্ষের চরম পরিণতিরূপে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে "ক্রুসেড্" দেখা যায়। দুটি ধর্ম্ম ও দুটি সমাজের এই সংঘর্ষের পরিণতিই ইতিহাসে "ক্রুসেড্" ব'লে খ্যাত। যাই হ'ক, ইসলাম ধর্ম্ম বা মুসলমান রাজ্যের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক। কথা হ'ল, ইসলাম ধর্ম্ম যখন এশিয়ায় উত্তরোত্তর জয়লাভ করে তখন এশিয়ার, বিশেষ ক'রে মধ্য এশিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই আদিম বর্ব্বর জীবন যাপন করত। পশু-পালন, চাষবাস, শীকার এই ছিল তাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়। যাযাবর জীবনের প্রতি তাদের আকর্ষণ ছিল বেশী। কোন স্থায়ী সমাজ-ব্যবস্থা বা সভ্যতা তাই তারা মধ্য এশিয়ায় গঠন করতে পারেনি। মধ্য এশিয়ার বুকে তাই সেকালের সমৃদ্ধিশালী হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতার পদচিহ্ন আজও আঁকা রয়েছে। প্রত্নবিদ্‌রা মধ্য এশিয়ার মৃত্তিকাগর্ভ থেকে অনেক মঠ,

বৌদ্ধ বিহার, গুহামন্দির, প্রাচীরচিত্র ও বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি আবিষ্কার করেছেন। মধ্য এশিয়ার বুকের উপর দিয়ে যখন হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতা এইভাবে তার পায়ের চিহ্ন এঁকে গিয়েছে তখনও মধ্য এশিয়ার সাধারণ অধিবাসীরা যাযাবর বর্ব্বর জীবনের স্তরেই বাস করত। তারপর ইসলামের জোয়ার এসে যখন সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল, তখন মন্দিরের বদলে মসজিদ, বৌদ্ধ বিহারের বদলে মাদ্রাসা গ'ড়ে উঠল মধ্য এশিয়ায়, কিন্তু মরুভূমির মতো একঘেয়ে সাধারণ মানুষের বর্ব্বর জীবন-যাত্রা ঠিক আগের মতোই একটানা ব'য়ে চলল। কোন পরিবর্ত্তনই তার হ'ল না, কোন চাঞ্চল্যই তার বুকে দেখা দিল না। ইসলামের প্রচণ্ড জোয়ার মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন জাতি-উপজাতির সাধারণ জীবনযাত্রায় আঘাত দিলেও কোন গভীর তরঙ্গের সৃষ্টি করতে পারল না।

এশিয়ার প্রাচীন খণ্ড-স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্মী সামন্ততন্ত্রকে ইসলাম সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মের বন্ধনে সংহত ও কেন্দ্রীভূত করতে সক্ষম হয়নি। সংহতি ও ঐক্যের পথে ইসলাম ধর্ম্মের আংশিক সাফল্য অস্বীকার করা যায় না। মধ্য এশিয়ার সাধারণ মানুষের যাযাবরবৃত্তি, অথবা তাদের যাযাবর জীবনের উত্তেজনা ও সঙ্কট-বৈচিত্র্যের আকর্ষণ ইসলাম ধর্ম্ম বিলুপ্ত করতে পারেনি। তবু তারা সকলে দলে দলে 'ইসলামের' আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল, কারণ বৃহত্তর ও বিচিত্রতর জীবনের ইঙ্গিত, সাম্যের ও মুক্তির আস্বাদ তারা পেয়েছিল ইসলামের বাণীর মধ্যে। অতীতের বর্ব্বর যাযাবর জীবনের সাম্য, স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শের সঙ্গে 'ইসলামের' আদর্শ এমন চমৎকার ভাবে এক হয়ে মিশে গিয়েছিল যে মধ্য এশিয়ার আদিম মানবসন্তানদের পক্ষে মুসলমান হওয়া অত্যন্ত সরল, স্বাভাবিক পরিণতি বলেই মনে হয়েছিল সেদিন। এশিয়ার অন্যান্য দেশেও এই কারণেই একদিন সঙ্কীর্ণতা, নীচতা ও সামাজিক দাসত্বের কবল থেকে সাধারণ

মানুষ 'ইসলামের' মধ্যে মুক্তির আস্বাদ পেয়েছিল এবং ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছিল।

কিন্তু ইসলামের উদ্দাম গতিও এশিয়ার খণ্ডস্বাতন্ত্র্যধর্ম্মী ফিউড্যাল্ পদ্ধতিকে ভেঙে চুরমার ক'রে একধর্ম্মরাজ্য পাশে বাঁধতে পারেনি। কারণ সমাজের মূল অর্থনৈতিক ভিত্তিতে 'ইসলাম' কোন আঘাতই হান্‌তে পারেনি বলা চলে। সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি একই ভাবে অটুট ছিল। যাযাবরবৃত্তি, পশুপালন ও কৃষি-ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তনই হ'ল না। সুতরাং প্রাথমিক সামন্তযুগীয় সামাজিক সম্বন্ধও অপরিবর্ত্তিত রইল। সমাজের বিভিন্ন স্তরগুলি ঠিক মিশরীয় পিরামিডের মতো ঠেলে উঠল আকাশে। এই স্তরবিন্যস্ত সামাজিক পিরামিডের চূড়ায় বোখারা-কিবা-কোকন্দের আমীরদের সিংহাসন। তারপর তাঁর আমলা-অমাত্য-পারিষদবর্গ, মন্‌সবদার-ফৌজদার, মোল্লা-মৌলবী-মুন্সী-কাজীর দল। তারপর ভূস্বামী-বে' বা ধনিক কৃষকদের দল। তারপর অসংখ্য নিঃস্ব চাষী-মজুর, কামার-চামার-ভিস্তী-ছুতারের দল।

আমীর

প্রধান দেওয়ান, প্রধান
কাজী, সেনাপতি, প্রধান
মৌলবী-মোল্লা ইত্যাদি
সাধারণ মোল্লা, মৌলবী, মুফ্‌তী, কাজী,
দারোগা, মুস্তোফী, খাজাঞ্চী, পেস্কার,
ভূস্বামী, মহাজন, অবস্থাপন্ন চাষী ইত্যাদি
সহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, মজুর শ্রেণী,
চামার, কামার, ভিস্তী, ছুতার ও বিভিন্ন কারিগর শ্রেণী
সাধারণ মানুষ, চাষী, মরুপ্রান্তরের যাযাবর উদাসীন জাতি-উপজাতি।

এই যে সামাজিক পিরামিড, এই পিরামিডই হ'ল আমিরী বা বাদ্‌শাহী বেহেশ্‌ত। আমীরের সিংহাসন, দরবার, বাগিচা, বেগমখানা, আবদারখানা পর্য্যন্ত বাদ্‌শাহী বেহেশ্‌ত, আর মোল্লা-মৌলবীদের মসজিদ ও মাদ্রাসা পর্য্যন্ত বেহেশ্‌তের উপকণ্ঠ বলা চলে। তারপর সাধারণ মানুষ, যাযাবর মানুষ। তারা পশু পালন করে, চাষবাস করে, তাঁবু ঘাড়ে ক'রে এক প্রান্তর থেকে আর এক প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায়, নিঃস্ব চাষীমজুর সব, জল টেনে টেনে হয়রাণ হয় যত ভিস্তী, চামড়া লোহা আর কাঠের যত পদমর্য্যাদাহীন কারিগর, চামার-কামার-ছুতার—সকলকে নিয়ে এক বিরাট মরুভূমির মতো সর্ব্বগ্রাসী দোজখ (নরক)। এই হ'ল মধ্য এশিয়ার আমিরীযুগের বা মধ্যযুগের ইসলাম ধর্ম্মরাজ্যের গঠন-বৈচিত্র্য, বাদ্‌শাহী বেহেশ্‌তের স্বরূপ ও বনিয়াদ।

ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ এইভাবেই মধ্য এশিয়ায় কলঙ্কিত হয়েছে। ইসলামের ঘোষণা "কানান্না সো উম্মাতান্ ওয়াহেদা-তান্" (কোর্‌আন), অর্থাৎ "সমগ্র মানবমণ্ডলী এক জাতি", [১] সেদিন মধ্য এশিয়ার বুকে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সংহত বাস্তব সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। হজরতের বাণী: "প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানের ভাই", মধ্য এশিয়ার কোন গর্ব্বান্ধ, স্বার্থান্ধ আমীর প্রতিপালন করেন নি। পিতাপুত্রে, ভাই-ভাইয়ে পরস্পরে হানাহানি ক'রে কিবা-বোখারার আমীর-ওম্‌রাহরা ইসলাম ধর্ম্ম কলঙ্কিত করেছেন। অথচ এই অর্থলোভী, ক্ষমতালোলুপ আমীর-ওম্‌রাহরাই ছিলেন ইসলামের রক্ষক ও পালক। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন হ'চ্ছে কিনা তার শ্রেষ্ঠ বিচারক ছিলেন এই অবিবেচক ও

---

১ গোলাম মোস্তফা: ইসলাম ও কমিউনিজম্: পৃঃ ৫০

অত্যাচারী আমীর-বাদ্‌শাহরা। আল্লার একমাত্র বরপুত্র যেন ভোগ-লালসার কদর্য্য প্রতিমূর্ত্তি এই সব আমীর বাদ্‌শাহ্। কোর্‌আনে আল্লাহ্‌-তা'লা যাই ব'লে থাকুন, আমীর-ওম্‌রাহদের দালাল মোল্লারা তার যা ব্যাখ্যা ক'রে দেবেন তাই আল্লাহ্‌র বাণী ব'লে বিশ্বাস করতে হবে। বিশ্বাস না করলে, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা আমীরের আদেশে কাজী বিচার করবেন এবং বিচারে মুণ্ডচ্ছেদের আদেশ হবে। কোর্‌আন-পাঠক আবৃত্তি ক'রে বলবেন : "লা হু মা ফিচ্ছাগাওয়াতে ওয়া মা ফিল্‌ আরদে"— "আকাশ-পৃথিবীর যা-কিছু সবই আল্লার"।[২] আবৃত্তি করবেন, কিন্তু "আকাশ-পৃথিবীর সব কিছুই আল্লার", এ-কথার ব্যাখ্যা করবেন কি? মোল্লা বলবেন না যে, আলো-বাতাসের মতো সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য এই পৃথিবীর সমস্ত ধনসম্পদ, ঐশ্বর্য্যও। সব কিছুই আল্লাহ্‌র, বোখারার আমীর অথবা কিবার খাঁর নয়।' মোল্লা বলবেন, সব কিছুই আল্লাহ্‌র এবং বোখারার আমীরই যেহেতু এই দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিনিধি, অতএব ধনসম্পদ, ঐশ্বর্য্য সব কিছু আমীরের, আর তাঁর প্রসাদ-জীবী দেওয়ান-কাজী-মোল্লাদের। সাধারণ মানুষের সহিষ্ণুতার বাঁধ প্রায় ভেঙ্গে যায় যায় যখন, বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ দেখা দেয় প্রায়, মোল্লার কণ্ঠে তখন আবৃত্তি শোনা যায় : "অমা-হা-জেহিল্‌ হায়্যা-তোদ্‌ দুন্‌য়্যা— ইল্লা লাহ্‌বোও্‌ অ লায়েব"—"এই পার্থিব জীবন অর্থহীন ক্রীড়া কৌতুক-ময় ভিন্ন আর কিছুই নয়"।[৩] অর্থাৎ ব্যাখ্যা হ'ল এই যে পার্থিব জীবনের উপর আসক্ত হয়ে, পার্থিব সুখের আশায়, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, দুঃখ

---

২ গোলাম্‌ মোস্তফা : ইসলাম ও কমিউনিজম্‌ : পৃঃ ৬১

৩ মোহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ : কোর্‌আন শরীফ (মূল আরবী ও উহার বাংলা উচ্চারণ ও তফছীরসহ বঙ্গানুবাদ) : প্রথম সংস্করণ—পৃঃ ১০৬২

কষ্টের বিরুদ্ধে, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে না কোনদিন। আল্লাহ্‌ তাতে অসন্তুষ্ট হবেন। কোর্‌আন শরীফের আয়াত উদ্ধৃত ক'রে মোল্লা-মৌলবীরা বলবেন: "তিনিই (আল্লাহ্‌ই) তোমাদের ভূসম্পত্তির অধিকারী করেছেন এবং একজনকে আর একজনের চাইতে বড়ো করেছেন, যাতে তিনি তাঁর দান সম্বন্ধে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন" (৬—১৬৬), "আল্লাহ্‌ যাকে খুশি তারই রুজি বাড়ান বা কমান এবং তারা এই দুনিয়াদারীতেই আনন্দ পায়" (১৩ : ২৬); "আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের কখনও কখনও ভীতি, অনশন, সম্পদহানি, শস্যহানি অথবা প্রাণহানির দ্বারা পরীক্ষা করব, এবং সহনশীলদের সুসংবাদ দিও" (২ : ১৫৫)।[৪] কোর্‌আনের আয়াত আবৃত্তি ক'রে আমীরবল্লভ মোল্লা-মৌলবীরা জনসাধারণকে এইভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে আল্লাহ্‌ই যখন মানুষের মধ্যে সাম্য স্থাপন করতে পারেন নি, আল্লাহ্‌ই যখন ধনী-নির্ধন, আমীর-গরীব সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ্‌ই যখন অনশন, মহামারী, সম্পদহানি, প্রাণহানি থেকে মানুষকে একেবারে মুক্ত করতে পারেন নি, তখন খোদার উপর খোদকারি ক'রে সাম্যের দুরাশায় মেতে লাভ নেই, গরীবের আমীর হবার বাসনা থাকা অন্যায় এবং দুর্ভিক্ষ, মহামারী বা সম্পদহানিতে ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে বিদ্রোহ করা ইসলাম-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ।[৫] 'ই-ভাবে কোর্‌আনের আয়াতের ব্যাখ্যা ক'রে ইসলামের মহান্‌ আদর্শকে

---

৪ গোলাম মোস্তফা : ইসলাম ও কমিউনিজম্‌ : পৃঃ ৮৪-৮৮

৫ উক্ত 'ইসলাম ও কমিউনিজম্‌' গ্রন্থে গ্রন্থকার গোলাম মোস্তফা 'ইসলামের সহিত কমিউনিজমের পার্থক্য' শীর্ষক অধ্যায়ে যেভাবে কোর্‌আন শরীফের উদ্ধৃতির সাহায্যে পুঁজিবাদের প্রয়োজন, ধনী-নির্ধনের, আমীর-গরীবের ভেদাভেদ ও মানুষের দুঃখকষ্টের স্বাভাবিকতার প্রতি ইসলাম-ধর্ম্মের সমর্থন রয়েছে ব'লে ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে মনে হয় তাঁর ব্যাখ্যা ও যুক্তি দুই-ই পরিপূর্ণ নয় এবং আংশিক ও অসম্পূর্ণ ব'লেই বিকৃত। স্বতন্ত্রভাবে খণ্ডাকারে কোর্‌আন শরীফের আয়াত উদ্ধৃত ক'রে আল্লাহ্‌র বাণীর মর্ম্ম প্রচার করা বোধ হয় সম্ভব নয়।

অপমানিত ও কলঙ্কিত ক'রে, আমীরের বেহেশ্‌ত গঠন করা হয়েছে রূপরহস্যাবৃত বোখারায়, কিবায়। মধ্য এশিয়ার সাধারণ মানুষ, সাধারণ তাজিক, তুর্কী, উজ্‌বেক, কিরগিজ্‌, কাজাক্‌, যাযাবর মানুষ, সরলভাবে বিশ্বাস করেছে কোর্‌আনের কথা, ইসলামের আদর্শের কথা। তারা বিদ্বান নয়, পণ্ডিত নয়, অসভ্য, অশিক্ষিত, আদিম সরল মানুষ। মৌলবী বা মোল্লার সঙ্গে স্বয়ং আল্লার কোন পার্থক্যই নেই তাদের কাছে। তারা জানে মোল্লা বিদ্বান, মৌলবী পণ্ডিত, কোর্‌আন তাঁদের কণ্ঠস্থ, আল্লার প্রিয়পুত্র তাঁরা। তাঁরা কখনও মিথ্যা বলতে পারেন না। তাঁরা কখনও ইসলাম-ধর্ম্মের সুবিধাবাদী অপব্যাখ্যা করতে পারেন না। কিন্তু অপব্যাখ্যা তাঁরা করেছেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে, নিজেদের হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্যে, আমীর-খাঁদের ব্যভিচার-বিলাসিতার পথ পিচ্ছিল করার জন্যে। এইভাবে শুধু ইসলাম-ধর্ম্মের নয়, হিন্দুধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম এবং জগতের আরও অনেক ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত মহান্‌ মানবিক আদর্শকে পরবর্ত্তী কালের ধর্ম্মধ্বজী শাস্ত্রকার ও টিকাকারেরা জলাঞ্জলি দিয়ে অন্তঃসারশূন্য খোলসে পরিণত করেছেন এবং সেই খোলসটিকে অবলীলাক্রমে তাঁরা তাঁদের শোষণ-শাসন ও যাবতীয় অধর্ম্মাচরণের অস্ত্র রূপেও ব্যবহার করেছেন। মধ্য এশিয়ার আমীর ও কাজী-মোল্লারাও তাই করেছেন। কিন্তু অধর্ম্মের জয় হয় না, অন্যায়ের পরাজয় নিশ্চিত। তাই আমীর-বাদ্‌শাহের বিকৃত ও কলঙ্কিত "ইসলাম-ধর্ম্মের" জয় হয়নি বোখারা-সমরকন্দে। জয় হয়েছে সেখানে খাঁটি ইসলাম ধর্ম্মের, খাঁটি মানবসন্তান মুসলমানদের মানবিক ধর্ম্মের। ইসলামের ন্যায়ের আদর্শ, ইসলামের মুক্তি ও সাম্যের আদর্শ, ইসলামের মানবতা ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে রূপায়িত হয়েছে মধ্য এশিয়ায়, বোখারা-তাস্কেন্দ-সমরকন্দে। কেমন ক'রে হয়েছে সে-কাহিনী আমরা পরে বর্ণনা করব।

আমীর-খাঁ-মোল্লা-শাসিত অতীতের বোখারা-সমরকন্দের কাহিনী এবারে আমরা কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিকের মুখ দিয়ে বর্ণনা করব। শুধু আমীর-ওম্‌রাহ্‌দের জীবনযাত্রা নয়, রুশ তুর্কীস্তানের পুরাতন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাও এই সব বর্ণনার ভিতর দিয়ে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে। এই সব প্রত্যক্ষদর্শী পর্য্যটক ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে ভ্যাম্‌বেরী, ভ্যালিখানফ্‌, স্টাম্‌, হাটন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

হাটন সাহেব লিখেছেন * যে খাঁটি উজ্‌বেকী চোগাচাপ্‌কান প'রে, মন্ত্রি-পারিষদ-প্রহরী পরিবেষ্টিত হয়ে কিবার খাঁ তাঁর সিংহাসনে উপবেশন ক'রে থাকেন। ভোরে উঠে খাঁ যথারীতি নামাজও পড়েন। মধ্যে মধ্যে মৌলবী-মুফ্‌তী ডেকে তিনি নানা গভীর দার্শনিক বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। তারপর শাস্ত্রালোচনায় ক্লান্ত হয়ে খাঁ সুন্দরী বেগম ও পরিচারিকা সমভিব্যাহারে বিশ্রামাগারে নিদ্রা যান। খাওয়াস, সরবৎদার, আল্‌দার, তোষকচী খিদ্‌মৎগার প্রভৃতি খাঁর একান্ত সেবক ভৃত্যরা তাঁর দর্শনালোচনার ক্লান্তি দূর করার জন্তে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে যায়। বিশ্রামান্তে দেওয়ান, মীরবক্সী, উজ্‌বেগী, কোরবেগী, খুস্কবেগী প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীদের নিয়ে তিনি রাজকার্য্যে মনোযোগ দেন। রাজকার্য্যের পর পাশাখেলা আরম্ভ হয়। তারপর খাঁ প্রজাদের দর্শন দেন, আমিরীচালে, গম্ভীরভাবে তিনি প্রজাদের অভাব-অভিযোগ শোনেন। কুর্নিশ, তস্‌লিমের সঙ্গে "আল্লাহ্‌ আক্‌বার" ধ্বনিতে চারিদিক প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। অপর দিকে আর একদল প্রতিধ্বনি করে "জিলে জেলালে হু" (ভগবানের ঐশ্বর্য্যই তাঁর প্রভা)। মধ্যে মধ্যে কাজী-উল্‌-কোজাৎ-এর (প্রধান কাজী) উপরেও খাঁ নিজে বিচারের

* J. Hutton : Central Asia : From the Aryan to the Cossack : Pp. 231-32.

আসনে বসেন। এইভাবে খাঁর দিন কাটে এবং এরই মধ্যে সাড়ম্বরে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তেও তিনি ভুল করেন না।

দিনের পর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, সন্ধ্যার পর রাত্রি। দিনের ক্লান্তি, অবসাদ, বিরক্তি সব দূর করতে হবে। হাটন সাহেব লিখেছেন: "দিনের শ্রান্তি শেষ হ'ত ভূরিভোজ ও শরাব পানে। তারপর বাইজী নর্ত্তকীরা নাচগান করত, জাদুকরেরা ক্রীড়াকৌতুক করত। সূর্য্যাস্তের ঘণ্টা দু'য়ের মধ্যেই খাঁ হারেমে প্রবেশ করতেন।"[৭] কিবার খাঁর এই বিলাসিতার বর্ণনা শুনে আমাদের ভারতীয় বাদ্শাহদের কথা মনে হয়। আবুল ফজল্ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "আইন-ই-আকবরী"-তে এই বাদ্শাহী বিলাসিতার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। সন্ধ্যা হ'লেই বাদ্শাহের সামনে বারোটি কর্পূরের বাতি নীরেট সোণার বাতিদানের উপর বসিয়ে জেলে রাখা হ'ত; পরে বিচিত্র বসনভূষণে বিভূষিতা সুন্দরী ষোড়শী কামিনীরা মধুরকণ্ঠে প্রণয়সঙ্গীত করতে করতে বাদ্শাহের সামনে উপস্থিত হ'ত। বাতিদানসহ একটি ক'রে বাতি নিয়ে অপূর্ব্ব নৃত্য ও অঙ্গভঙ্গিমা করতে করতে বাদ্শাহকে আরতি করত এবং শেষে আল্লার কাছে বাদ্শাহের মঙ্গলকামনা ক'রে বিদায় নিত। এইভাবে পর্য্যায়ক্রমে বারোজন নর্ত্তকী বাদ্শাহকে আরতি করত।[৮] ভারতীয় বাদ্শাহের এই সান্ধ্য বিলাসিতার সঙ্গে কিবা-বোখারার আমীর-খাঁদের সান্ধ্য-বিলাসের সাদৃশ্য আছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবার পর খাঁ শরাবপানে মশ্গুল হয়ে হারেমে প্রবেশ করতেন। এই হারেমের বর্ণনা "আইন-ই-আকবরী" থেকে এখানে

৭ J. Hutton ; Op. Cit ; Ibid

৮ শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : আইন-ই-আকবরী ফ্রান্সিস্ গ্লাড-উইন কর্ত্তৃক অনূদিত ইংরেজী হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বাংলায় ভাষান্তরিত। ১৩০৬ সনে প্রকাশিত। পৃঃ ৪৪

উদ্ধৃত করছি। কিবা-বোখারা-সমরকন্দের হারেমের সঙ্গে এই হারেমের কোন পার্থক্য নেই। চারিদিক উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটা প্রকাণ্ড মাঠ, তার মধ্যে এক একদল বেগমের জন্যে এক-একটা মহল তৈরী থাকে। দু'তিনটে মহলের মধ্যে একটা ক'রে বাগান, বাগিচা, পুষ্করিণী ও কূয়া থাকে। এই প্রকাণ্ড মহলকে বলে 'হারেম'। এক-একটি হারেমে পাঁচশ সাতশ হাজার ক'রে বেগম থাকে; এক-একদল বেগমের উপর একজন ক'রে স্ত্রীদারোগা নিযুক্ত থাকে। এইসব দারোগাদের যিনি সর্দ্দার তিনি হারেমের কর্ত্রী। প্রত্যেক বেগমেরই মাসহারা ঠিক থাকে। বয়স ও রূপগুণানুসারে মাসহারা কমেবাড়ে। হারেমের প্রত্যেক মহলে চেড়ীরা পাহারা দেয়, বাইরে খোজারা পাহারা থাকে। এই হ'ল হারেম বা বেগমখানা, যেখানে আমাদের ভারতীয় বাদশাহরা চরম বিলাসিতার মধ্যে দেহমন শিথিল ক'রে দিতেন।[১] এই শ্রেণীর হারেমই কিবা-বোখারার আমীরদের পাশাবক প্রবৃত্তি চরিতার্থের কেন্দ্র ছিল। জানি না, কোর্‌আনের কোন্ আয়াতে এই জাতীয় বন্য 'হারামী' বিলাসিতা ও বর্ব্বরতাকে আল্লাহ্‌ 'ফর্‌জ্‌' করেছেন।

হাটন সাহেব বোখারার আমীর সম্বন্ধে বলেছেন যে স্বেচ্ছাচারী আমীর নিজের মর্জি অনুযায়ী রাজ্য পরিচালনা করেন, তাঁর মন্ত্রী ও কর্ম্মচারীদের অস্তিত্বও তাঁর খেয়াল-খুসীর উপর নির্ভর করে। মধ্যে মধ্যে দামামা বাজিয়ে, পেয়াদা সেনা-সামন্ত নিয়ে, মোল্লা-মৌলবী পরিবেষ্টিত হয়ে আমীর মসজিদে যান নামাজ পড়তে। এইভাবে নামাজ পড়তে যাওয়ার উদ্দেশ্য হ'ল আল্লার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি জনসাধারণের কাছে জাহির করা। এদিকে আমীরের ব্যভিচার ও লাম্পট্য ইতিহাসে অতুলনীয়। মিঃ হাটন বলেছেন যে খাঁ একটা পহেলা নম্বরের দুশ্চরিত্র ব্যক্তি,

১ শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়: ঐ

তাঁর চারজন বেগম এবং প্রায় হু'শ বাঁদী দেখা যায়।[১০] এই হ'ল বোখারার শাসকের স্বরূপ, সেই বোখারা যার নাম করলে আজও কল্পনাবিলাসী কবির মানসচক্ষে হাজার হাজার অশরীরী রঙিন স্বপ্ন ঝল্‌মল্‌ ক'রে ওঠে, সেই মর্ত্যের স্বর্গ বোখারা, কবিতা কল্পনাপ্রিয়া বোখারা। কিন্তু বোখারার বোর্‌কার অন্তরালে কি? "বসন্ত, কলেরা, যক্ষা প্রভৃতি প্রত্যেক উৎকট ব্যাধির প্রকোপ অবর্ণনীয়।" (হাটন) এই হ'ল বোখারা।[১১] বেরন্‌ মিয়েন্‌ডর্ফের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন হাটন সাহেব,[১২] বোখারার বাইরের সৌন্দর্য্যের অন্তরালে যে কদর্য্যতা লুকিয়ে আছে তাকে প্রকাশ করার জন্যে। বাইরে থেকে মনে হয়, বোখারা সত্যই যেন স্বপ্নের মায়াপুরী, এ-হুনিয়ার বেহেশ্‌ত। মসজিদের গম্বুজ, মিনার, মাদ্রাসা, হ্রদ, প্রাচীর, মধ্যযুগীয় ইসলামী স্থাপত্যের বনেদী সৌন্দর্য্য দূর থেকে যেন বোখারাকে স্বপ্নাবিষ্ট ক'রে তোলে। কিন্তু বোখারার বুকের কাছে এগিয়ে গেলে তার জীর্ণশীর্ণ অস্থিপঞ্জরসার বীভৎস কঙ্কাল মূর্ত্তি প্রকট হয়ে ওঠে। মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদ, স্নানাগার, বিশ্রামাগার, সরাইখানা, চাখানা ভিন্ন আর কিছুই দেখার নেই। আর আছে চারিদিকে মাটির কুঁড়েঘর, ধূসর রঙের তালপাকানো মৃত্তিকাপিণ্ডের মতো, কোন শোভা, কোন পরিকল্পনা নেই তার, একটার গায়ে একটা হেলান দিয়ে, একটার উপর আর একটা মুখ থুবড়ে প'ড়ে রয়েছে। শ্রী নেই, সামঞ্জস্য নেই, সমতা নেই, সৌন্দর্য্য নেই। তারই আশপাশ দিয়ে এঁকে-বেঁকে সাপের মতো বিষাক্ত এঁদো সব অলিগলি কোথায় কোন্‌দিকে যে গিয়েছে শেষ পর্য্যন্ত তার হদিশ্‌

১০ J. Hutton ; Op. Cit ; P. 281

১১ J. Hutton ; Op. Cit ; Ibid

১২ J. Hutton ; Op. Cit ; P. 285

মেলা ভার। সবচেয়ে ভাল পথ চওড়া ছয় ফুটের বেশী নয়, তাছাড়া অধিকাংশই তিনচার ফুট চওড়া মাত্র। এ-দেশের অধিকাংশ লোকই হয় ঘোড়ার পিঠে, উটের পিঠে অথবা গাধার পিঠে চ'ড়ে বেড়ায়। কথায় বলে, "গাধা হ'ল এদেশের বুট জুতো, আর উট হ'ল উঁচু হয়ে ভর দিয়ে চলার লাঠি।" সেইজন্যে এই সব সরু সরু আঁকাবাঁকা পথের উপর প্রায়ই ঘোড়া-উট-গাধা-মানুষের চীৎকার হল্লা ও ঠেলাঠেলির অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়।

আমীর-খাঁদের মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতার কথাও বর্ণনা করা যায় না। আমিরী বর্ব্বরতার কাহিনী শুনলে মনে হয়, কিজিলকুম্ মরুভূমিরও হৃদয় আছে, থিয়েন্‌শান-পামিরেরও পার্ব্বত্য নিষ্ঠুরতার সীমা আছে, কিন্তু বোখারা-কিবার আমীর-খাঁদের হৃদয়হীনতার কোন তুলনা নেই। মধ্য এশিয়ার মরুভূমির নির্ম্মম উদাসীনতা তার কাছে হার মেনে যায়, পর্ব্বতমালার নির্দ্দয়তা তার কাছে মাথা হেঁট করে। আমীরের বাদ্‌শাহী বদান্যতা মরূদ্যানের মতো মনে হ'লেও বাদ্‌শাহী বর্ব্বরতার কাছে সেই বদান্যতা উত্তপ্ত মরুবুকে বারিবিন্দুর মতো। বর্ব্বরতার অসংখ্য দৃষ্টান্ত থেকে একটি দৃষ্টান্ত এখানে আমি উল্লেখ করছি। প্রত্যক্ষদর্শী ভ্যাম্‌বেরী (M. Vambery) তাঁর "Sketches of Central Asia' গ্রন্থে বন্দীদের উপর অত্যাচারের একটি মর্ম্মান্তিক দৃশ্য বর্ণনা করেছেন। "লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে দশবারো জন বন্দীকে দলবদ্ধ ক'রে খাঁর সামনে আনা হয়। চল্লিশ বছরের কম যাদের বয়স তাদের খাঁ তাঁর প্রিয় মোসাহেব ও কর্ম্মচারীদের ক্রীতদাসরূপে বকশীস্ দেন। নেতৃস্থানীয় যারা তাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। একেবারে অথর্ব্ব বৃদ্ধ বন্দী যারা, কোন কাজই আর যাদের দ্বারা হবার সম্ভাবনা নেই, তাদের মাটিতে শুইয়ে ফেলা হয়। তারপর তাদের হাত-পা বেঁধে চিৎ ক'রে বুকের

উপর ব'সে জল্লাদ্‌রা চোখ উপ্‌ড়ে ফেলে দেয়। রক্তাক্ত ছুরি বৃদ্ধ বন্দীদের পাকা দাড়িতে মুছে ছেড়ে দেয়। হতভাগ্য বৃদ্ধরা মুক্তি পেয়ে দুই হাত দিয়ে হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে কোনরকমে মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। এইভাবে তারা মাথা ঠোকাঠুকি ক'রে, আছাড় খেয়ে, গোঙাতে গোঙাতে মাটিতে উঠে দাঁড়ায় আবার প'ড়ে যায়। সে-দৃশ্য ভোলা যায় না, মনে হ'লে শরীর শিউরে ওঠে আতঙ্কে।"

ভ্যাম্‌বেরী কেন, মানুষ মাত্রেই আঁৎকে উঠবে এই নৃশংসতার কাহিনী শুনে। কিন্তু বোখারা-কিবার খাঁদের কাছে নামাজের মতোই এই সব নৃশংসতা নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁরা ছিলেন "অতিমানব," আল্লার তথাকথিত 'বরপুত্র' সব, তাই জঘন্য পাশবিকতাতেও তাঁরা তিলমাত্র বিচলিত হতেন না।

এইবার মধ্য এশিয়ার বাসিন্দা বিভিন্ন জাতি-উপজাতির কথা বলব। এই সব জাতি-উপজাতির মধ্যে কাইসাক বা কাজাক্, উজ্‌বেক, তাজিক, কারা-কাল্‌পাক্, তূর্ক্‌মেন, আফ্‌গান, আরব, পার্শী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রুশ অধিকারের পূর্ব্বের অবস্থার সঙ্গে পরবর্ত্তীকালের অবস্থার বিশেষ কোন তারতম্য ছিল না। এই সব জাতির পরিচয় আমরা ক্যাপ্টেন্ ষ্টাম্, ক্যাপ্টেন ভ্যালিখানফ্, লা ষ্ট্রেঞ্জ্ প্রভৃতি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে সংগ্রহ করব।

কাজাক। ক্যাপ্টেন ষ্টাম্ তাঁর গ্রন্থে[১৩] কাইসাক্ বা কাজাকদেরই তুর্কীস্তানের যাযাবর জাতিগুলির মধ্যে অন্যতম ব'লে উল্লেখ করেছেন। কাজাকরা গোঁড়া মুসলমান। এরা অধিকাংশই যাযাবর জীবন যাপন করে। মুষ্টিমেয় কাজাকদের তুর্কীস্তানের সহরের কাছাকাছি বা উপকণ্ঠে ঘর বেঁধে অথবা তাঁবু খাটিয়ে বসবাস করতে দেখা যায় এবং এই সব

১৩ Capt. H. Stumm ; Russia in Central Asia ; Pp. 275-'76

স্থায়ী বাসিন্দারা চাষবাসও করে। কিন্তু যাযাবর জীবনের বেপরওয়া বৈচিত্র্যের প্রতি কাজাকদের এত দুর্দ্ধর্ষ আকর্ষণ যে নিদারুণ দারিদ্র্য ও খাদ্যাভাবের তাড়না ভিন্ন তারা কখনই সহরাভিমুখী হয় না, এবং একস্থানে দীর্ঘদিন ঘর বেঁধে বা তাঁবু খাটিয়ে বসবাস ও চাষবাস করতে চায় না। চাষবাস ক'রে কিছুদিন স্থায়ী হবার পর যখনই অবস্থা তাদের একটু স্বচ্ছল হয়, দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা সাময়িকভাবেও দূর হয়ে যায় তখনই তারা আবার বাঁধা ঘর ফেলে রেখে, তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে মুক্ত প্রান্তরের বুকে ছড়িয়ে পড়ে। দিগন্তলীন প্রান্তরের বাধাবন্ধহীন স্বাধীনতার আস্বাদ তারা কিছুতেই যেন ভুলতে পারে না। প্রান্তর-মরুর মুক্তির আহ্বান তাদের কানে সবসময় প্রতিধ্বনিত হয়। প্রান্তরের মুক্তজীবনকে তারা বাঁধাঘরের চারদেয়ালের মধ্যে বন্দী করতে চায় না।

কিরগিজ্। পার্ব্বত্য কিরগিজদের ক্যাপ্টেন ষ্টাম্ অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ, অসংযত ও কঠোর প্রকৃতির ব'লে বর্ণনা করেছেন।[১৪] তুর্কীস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে কিরগিজদের মতো দুর্দান্ত, উচ্ছৃঙ্খল জাত আর নেই। এরা কোন শাসন, বাঁধন, কোন নিয়মকানুন, কোন বিধিনিষেধ মানতে চায় না। নিজেরাই নিজেদের সর্ব্বময় কর্ত্তা। খাঁ-আমীর অথবা রুশ জারদের মতো অত্যাচারী শাসকরাও এদের বশ করে বা পোষ মানাতে পারে নি। যাযাবরবৃত্তি ও দস্যুবৃত্তিই ছিল এদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। মরুপ্রান্তরে ভ্রাম্যমান পথিক ও ক্যারাভান্ লুণ্ঠন ক'রেই এরা দিন কাটাত। ক্যাপ্টেন ভ্যালিখানফ্ বলেছেন যে কিরগিজদের মতো অপরিচ্ছন্ন, ম্লেচ্ছ জাতি সচরাচর দেখা যায় না। অপরিচ্ছন্নতা কিরগিজদের জীবনের ধর্ম্ম বলা চলে। আহারের পাত্র অথবা পোষাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার করলে তাদের ক্ষতি হবে, বিপদ হবে,

১৪ Capt. H. Stumm ; Op. Cit ; P. 278

এই ছিল তাদের বদ্ধমূল ধারণা। এই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হয়ে কিরগিজরা নিজেদের পরিধানের আল্‌খাল্লা পর্য্যন্ত কখনও পরিষ্কার করত না, ছাড়তও না। ময়লা হয়ে হয়ে ছিঁড়ে শেষ পর্য্যন্ত তাদের গায়ের আল্‌খাল্লা গা থেকে খ'সে প'ড়ে যেত। কিরগিজদের যৌনজীবন ও পারিবারিক জীবনও আদৌ সংযত ছিল না। ব্যক্তিগত জীবনে সংযম ও শৃঙ্খলার কোন চিহ্ন ছিল না কিরগিজদের মধ্যে। যদিও তারা ইসলাম ধর্ম্মে বিশ্বাসী তাহ'লেও তাদের জীবনে ইসলামের পবিত্রতার কোন স্পর্শই ছিল না বলা চলে। নিজেদের তারা গোঁড়া মুসলমান ব'লে জাহির করলেও, মুহম্মদ কে তাও তারা জানত না। আর সমস্ত কিরগিজ জাতির মধ্যে একজনও লিখতে পড়তে জানত কিনা সন্দেহ। ক্যাপ্টেন ভ্যালিখানফ্ বেশ জোর দিয়েই বলেছেন এই কথা।[১৫]

উজ্‌বেক। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সর্ব্বপ্রথম মধ্য এশিয়ার ইতিহাসে উজ্‌বেকদের আবির্ভাব হয়। তুর্কী ও মধ্য এশিয়ার নানাজাতির সংমিশ্রণে উজ্‌বেক জাতির সৃষ্টি। বিজয়ী জাতি হিসেবে আমরা উজ্‌বেকদের মধ্য এশিয়ায় পদার্পণ করতে দেখি। স্থানীয় তাজিক ও অন্যান্য জাতিকে জয় ক'রে সদম্ভে উজ্‌বেকরা মধ্য এশিয়ার শাসকশ্রেণীর আসন অধিকার ক'রে বসে। কোকন্দ, বোখারা ও কিবায় এই উজ্‌বেকরাই ছিল অভিজাত শাসকশ্রেণী—রাষ্ট্রবিভাগ, সেনাবিভাগ সবই ছিল তাদের অধীনে। এইভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল ক'রে, অধিকতর ক্ষমতার মোহে, উজ্‌বেকরা দীর্ঘদিন মধ্য এশিয়ার খাঁ ও

১৫ Capt. Valikhanof; The Russians in Central Asia; Pp. 42, Pp. 80-85—ক্যাপ্টেন ভ্যালিখানফ্ পুরাতন রুশ সেনাবাহিনীর একজন অফিসার ছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন কিরগিজ সুলতানের পুত্র। রুশ জারের শাসনকালীন কিরগিজদের অবস্থার কথাই তিনি এখানে বলেছেন।

আমীরদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও বিরোধের ইন্ধন যুগিয়েছে। উজ্‌বেকরা মুসলমান এবং তীব্র ধর্ম্মান্ধতার জন্যে তারা মধ্য এশিয়ায় বিখ্যাত। মধ্য এশিয়ার স্থায়ী অভিজাত শ্রেণী, প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী শাসক ও বণিকশ্রেণী বলতে এই উজ্‌বেকদেরই বুঝায়। কিন্তু তাহ'লেও যাযাবরবৃত্তির প্রতি উজ্‌বেকদের আকর্ষণ কম নয়। সহরে ও নগরে এসে তারা বসবাস করত অর্থের জন্যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে। অবসর পেলেই আবার তারা প্রান্তরের যাযাবর জীবনও যাপন করত।[১৬]

তা জি ক। মধ্য এশিয়ার প্রাচীন জাতির মধ্যে তাজিকরাই অন্যতম। যদিও উজ্‌বেকরা তাদের জয় ক'রে তাদের উপর প্রভুত্ব কায়েম ক'রে বসেছিল, তাহ'লেও দীর্ঘদিন ধ'রে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য কাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকার ফলে তাজিকরা যে সামাজিক আধিপত্য অর্জ্জন ক'রেছিল, উজ্‌বেকদের কোন প্রভুত্বই তা ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। তাজিকরা অত্যন্ত ধীর, স্থির, সহিষ্ণু ও পরিশ্রমী জাতি। মধ্য এশিয়ায় চাষবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে তারা বহুদিন ধ'রে জড়িত। সুদক্ষ কারিগর ও ধনিক ব্যবসায়ীদের মধ্যে তাজিকদের সংখ্যাই বেশী। এদিক দিয়ে মধ্য এশিয়ার তাজিকদের অবস্থার সঙ্গে ইউরোপের ইহুদীদের সাদৃশ্য আছে। ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি, মুনাফা ও বাণিজ্য-স্বার্থের দিকেই তাদের নজর বেশী। ব্যবসাই তাদের প্রাণ এবং এই ব্যবসার জন্যে তাজিকরা করতে পারেনা এমন কোন কাজ নেই। বিবেক, মানসম্ভ্রম, দেশপ্রেম, সততা সব তারা সামান্য মুনাফার জন্যে বিসর্জ্জন দিতে পারে নিঃসঙ্কোচে। এই মুনাফার জন্যে দেশ থেকে দেশান্তরে যাত্রা করতে তাদের দ্বিধা নেই, প্রাণপণ পরিশ্রম করতেও তারা কুণ্ঠিত নয়। যুদ্ধ-

১৬ Capt. H. Stumm ; Op. Cit, Ibid

বিগ্রহ, বিদ্রোহ, বিপ্লব, এসব তারা যমের মতো ভয় করে এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্যে মোসাহেবি করতে তাদের সমতুল্য আর কেউ নেই।[১৭]

এ-ছাড়া তুর্ক্‌মেন, আফগান, আরব, পার্শী প্রভৃতি জাতিও আছে। তুর্ক্‌মেনরা দীর্ঘদিন যাবৎ কিবার খাঁদের অধীনস্থ। তাদের ভাষা ও চেহারা ঠিক তুর্কীদের মতো। তুর্ক্‌মেনরা সাধারণতঃ চাষবাসই করে, তবে অশ্বপালনই তাদের প্রধান কাজ। মেয়েরা গালিচা তৈরী করে। আরবেরা প্রথম যুগের বিজয়ী মুসলমান শাসকদের বংশধররূপে আজও মধ্য এশিয়ায় বাস করছে, তবে তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি মধ্য এশিয়ার এখন বিশেষ কিছু নেই। অশ্ব ও অন্যান্য পশুপালনই তাদের প্রধান কাজ। আফগানরা প্রায়ই তাস্কেন্দেই থাকে এবং তাদের অধিকাংশই ব্যবসায়ী। পার্শীরা ক্রীতদাস, বাজারে তাদের বেচাকেনা হয়ে থাকে। পার্শীরা 'সিয়া' সম্প্রদায়ভুক্ত ব'লে তারা 'সুন্নীদের' অবজ্ঞার পাত্র এবং শত্রুও বটে।[১৮]

এই হ'ল মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন জাতির পরিচয়। আমীর-খাঁদের রাজত্বকালে এদের অবস্থা যা ছিল, রুশিয়ার জারের রাজত্বকালে তার চেয়ে যে বিশেষ কিছু উন্নত হয়নি তা পূর্ব্বোক্ত লেখকদের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছে। জারের আমলে মধ্য এশিয়ার শাসন-ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। এই সব আদিম, দুর্দ্ধর্ষ যাযাবর জাতির সমাজ ও শাসন-ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি পরিবর্ত্তন করা রুশ জার যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নি। পরিবর্ত্তন করার অথবা উন্নতি সাধন করার কোন প্রয়োজন ছিল না জারের দিক থেকে। রুশ জারের লক্ষ্য ছিল মধ্য এশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যে একচেটিয়া প্রভুত্ব করা এবং

১৭ Capt. H. Stumm : Op. Cit : Ibid.
১৮ Capt, H. Stumm : Op. Cit : Ibid

মধ্য এশিয়াকে কাঁচামালের আড়তে পরিণত করা। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের জন্যে যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকু উন্নতিসাধন রুশ জার করেছিলেন, বিশেষ ক'রে যানবাহনের ক্ষেত্রে। বড় বড় কয়েকটা রেলপথ ও বাণিজ্যপথ জারের আমলে মধ্য এশিয়ায় গ'ড়ে উঠেছিল। নিজেদের জন্যে এবং বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে কয়েকটা সহর ও নগরও তাঁরা নূতন ক'রে গ'ড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কাঠামো মধ্য এশিয়ায় পূর্ব্বের মতো একই অবস্থায় ছিল বলা চলে। শাসনব্যবস্থার শৃঙ্গদেশে গবর্ণর জেনারেল এবং তাঁর অধীনস্থ প্রত্যেক জেলার সামরিক গবর্ণররা বিরাজ করতেন। তার নীচে সেই আদিকালের আদিম দেশী শাসন-ব্যবস্থাই অটুট ছিল।[১৯] প্রায় ১০০ থেকে ২০০ "কিবিৎকা" (Kibitka) বা ফেল্টের তাঁবু ঘিরে এক একটি অল্ (Aul) বা ভ্রাম্যমান গ্রাম। এই ভ্রাম্যমান গ্রামের মোড়ল গ্রামবাসীরাই নির্ব্বাচন করত। কয়েকটা এই ধরণের ভ্রাম্যমান গ্রাম নিয়ে এক একটি "ভোলস্ত্" (Volost) বা চক্র (কতকটা আমাদের মহকুমার মতো) বলা হ'ত। এই চক্র বা মহকুমার হাকিম বা "বে" গ্রামবাসীদের দ্বারাই নির্ব্বাচিত হ'ত এবং এই বে-রা ছিল সামরিক গবর্ণরের অধীন।[২০] এই হ'ল মোটামুটি শাসন-সংস্থার কাঠামো। পুরাতনের সঙ্গে নূতনের অত্যন্ত বেখাপ্পাভাবে খাপ্ খাওয়ানোর চেষ্টা। জারের আমলে আমীর-খাঁদের প্রভুত্ব ও স্বেচ্ছাচারিতা আদৌ কমেনি, বরং আরও বেড়ে গিয়েছিল। কারণ নিজেদের কোন দায়িত্বই তখন তাঁদের ছিল না। কি নৈতিক, কি রাষ্ট্রিক, কি সামাজিক, সমস্ত দায়িত্বই পরম নিশ্চিন্তে তাঁরা রুশ জারের সামরিক কর্ম্মচারীদের স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা ভোগবিলাসিতায় দ্বিগুণ

১৯ Capt. Valikhanof : Op. Cit : Ibid
২০ Capt. H. Stumm : Op. Cit : Ibid

উৎসাহে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। জারের কর্ম্মচারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমীর-খাঁ-মোল্লা-বে'রা দীর্ঘদিন ধ'রে মনের আনন্দে মধ্য এশিয়ার নিরীহ জনসাধারণকে লুণ্ঠন ও শোষণ করেছেন।

কিন্তু ইতিহাসের চাকা দীর্ঘদিন কখনও একস্থানে এক অবস্থায় অচল হয়ে আটকে থাকে না। ইতিহাসের রথ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে মধ্য এশিয়ার মধ্যযুগীয় পাঁকের মধ্যে আটকে ছিল, কারণ বোখারা-সমরকন্দ-কিবা-কোকন্দ-তাস্কেন্দের লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত জনসাধারণের সমবেত কণ্ঠ থেকে কোনদিন "ঠ্যালোরে জোয়ান্ হেঁইও" আওয়াজ ওঠেনি। একদিন ভোরে সেই আওয়াজ উঠল, ইতিহাসের রথ ন'ড়ে উঠল, তারপর সেই রথের চাকা ঘর্ঘরিয়ে চলল মধ্য এশিয়ার মরু-প্রান্তরের বুকের উপর দিয়ে নবযুগের সূর্য্যোদয়ের দিকে। আজও তার যাত্রার বিরাম নেই। যুগ-যুগান্তের পুঞ্জীভূত বেদনার ধূমায়িত বহ্নি বিপ্লবের দাবানল হয়ে জ্ব'লে উঠল ক্যাস্পিয়ান থেকে থিয়েন্-শান পর্য্যন্ত। বাদ্শাহী বেহেশ্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

কেয়ামত

"যেদিন কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে সেদিন সকলে পৃথক হয়ে যাবে। যারা ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে সৎকাজ করেছে তারা বেহেশ্‌ত উদ্যানে আনন্দ উপভোগ করবে। যারা ধর্ম্মদ্রোহিতা করেছে, যারা আমার নির্দ্দেশগুলি উপেক্ষা করেছে এবং পরকালে আমার কাছে উপস্থিত হওয়া মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তারাই শাস্তি পাবে।"[১]

—কোর্‌আন শরীফ

কবিতা ও কদর্য্যতা, স্বপ্ন ও বিভীষিকা-মিশ্রিত সেকালের বোখারা-সমরকন্দ, তুশাখে-তাস্কেন্দ, কিবা-কোকন্দ, 'the whole hodge-podge of poetry and filth'—আমরা পিছনে ফেলে এসেছি। আমীর

১ মোহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ : কোর্‌আন শরীফ (মূল আরবী ও উহার বাংলা উচ্চারণ ও তফছীরসহ বঙ্গানুবাদ) : পৃঃ ১০৬৭ (প্রথম সংস্করণ)

মোল্লার বেহেশ্‌ত, দীন-দুঃখীর দোজখ্‌ বোখারা-সমরকন্দের আবর্জ্জনা-স্তূপে সমাধিস্থ হয়ে যাক। আমরা এগিয়ে চলি ইতিহাসের অগ্রগতির তালে তালে পা ফেলে, বিশ্বমানবের বিশ্রামহীন যাত্রাপথে। আমাদের মৃত্যু নেই, আমাদের ভয়-ডর নেই। যুগে যুগে ইতিহাসের কঠোর ন্যায়-বিচার আমরা দেখেছি। আমরা জানি—

"মহা-মানবের মহা-বেদনার আজি মহা-উত্থান,
ঊর্দ্ধে হাসিছে ভগবান, নীচে কাঁপিতেছে শয়তান।"

পূর্ব্বরঙ্গ

বোখারার বিশ্রী সহরতলীতে ভোর হ'ল। হায় ওমরখৈয়ম্‌! ভোর হ'ল, কিন্তু কেউ তার ঘুমন্ত প্রিয়ার কানে কানে বল্‌ল না—"জাগো, জাগো রাত পোহাল"—

মসজিদের মিনার থেকে মুয়াজ্জীনের আজান ভেসে আসছে কানে। কেয়ামতের দিন এল কি বোখারায়? দূর থেকে আমীরের গড়বন্দী রাজপ্রাসাদ, মৃত্যুর মেঘচুম্বী দুর্গের চূড়ো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সব ছাড়িয়ে বৃদ্ধ মুয়াজ্জীনের মাথা যেন ঠেলে উঠেছে। কেয়ামতের দিনে মুয়াজ্জীনের মাথা সবচেয়ে উঁচুতে থাকবে, বোধহয় সেইজন্যে।[২] হারেমের উন্মত্ত বিলাসিতার অবসাদে ক্লান্ত আমীরের ঘুম ভাঙল না। ঘুম ভাঙল কামারের, চামারের, মুটে-মজুরের, ভিস্তী-ছুতোর-মুর্দাফরাশের। ঝির্‌ঝিরে হাওয়ায় দুল্‌তে দুল্‌তে আজানের ধ্বনি ভেসে এল—[৩]

---

২ মাওলানা আবদুছ্‌ ছোব্‌হান ও কাজী আমির হোছাইন্‌ প্রণীত "কোর্‌আন ও দীনিয়াত-শিক্ষা" (দ্বিতীয় ভাগ)—"কেয়ামতের দিন মোয়াষ্‌যেনের মাথা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ থাকিবে" (মুছ্‌লেম শরীফ): পৃঃ ২২

৩ মাওলানা আবদুছ্‌ ছোব্‌হান ও কাজী আমির হোছাইন্‌ প্রণীত "কোর্‌আন ও দীনিয়াত-শিক্ষা" (দ্বিতীয় ভাগ): পৃঃ ২২-২৭

আল্লাহু আক্‌বার
আল্লাহু আক্‌বার
আল্লাহু আক্‌বার
আল্লাহু আক্‌বার

'আল্লাহ্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ'। আমীরের ঘুম ভাঙল না, চাষারের ঘুম ভাঙল। মুয়াজ্জীনের সুললিত কণ্ঠ ভোরের কুয়াশা ভেদ ক'রে প্রতিধ্বনিত হ'ল—

আশ্‌হাদু আল্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্
আশ্‌হাদু আল্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ব্যতীত আর অন্য কোন উপাস্য নাই।'[৪] দেওয়ানের ঘুম ভাঙল না, ভিস্তীর ঘুম ভাঙল। ভিস্তীও মনে মনে বলল: "আশ্‌হাদু আল্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। মুয়াজ্জীনের আজানের সুর আবার তরঙ্গায়িত হয়ে এল কানে—

হাইয়া আলাছ্ ছালাহ্
হাইয়া আলাছ্ ছালাহ্
হাইয়া আলাল্ ফালাহ্
হাইয়া আলাল্ ফালাহ্

'নামাজের জন্যে শীঘ্র এস, মঙ্গলের জন্যে শীঘ্র এস।'[৫] মৌলবীর ঘুম ভাঙল না এখনও, কোতোয়ালের ঘুম ভাঙল না। কামার-ছুতোর চাষী-মজুর সকলের ঘুম ভাঙল। সকলেই মনে মনে বলল: "লা' হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল্ 'আলিয়্যাল্' আজীম্"—"সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

৪ কোর্‌আন ও দীনিয়াত-শিক্ষা (২য় ভাগ)

৫ কোর্‌আন ও দীনিয়াত-শিক্ষা (২য় ভাগ)

ও মহান্ আল্লাহ্‌তায়ালার দয়া ভিন্ন কারও গুণাহ্ থেকে বেঁচে থাকার ও ভাল কাজ করার ক্ষমতা নাই।"[৬]

নামাজ পড়বার জন্যে সকলে এসে জমা হ'ল মসজিদে। শেষ হ'ল নামাজ পড়া। মিনার থেকে নেমে এসে মসজিদের পাশে দাঁড়াল মুয়াজ্জীন। সকলকে ডেকে বলল: "ভাইসব! খাজনা মকুব করাবার জন্যে আমরা গিয়েছিলাম দেওয়ানজীর কাছে। দেওয়ানজী দাবী মঞ্জুর করলেন না, মুখ বিকৃত ক'রে তাড়িয়ে দিলেন আমাদের সেপাই দিয়ে। জাঁহাপনার কাছে আবেদন করলাম, মঞ্জুর হ'ল না, সদম্ভে তিনি তাঁর নিভৃত কক্ষে চলে গেলেন।" মুয়াজ্জীনের কথা শুনে সকলে নীরবে মাথা হেঁট ক'রে রইল। মুয়াজ্জীনের কণ্ঠে নূতন সুরে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল কোর্‌আনের বাণী: "ইয়্যা বোনাইয়্যা...অলা-তোছায়েব খাদ্দাকা লিন্না-ছে অলা-তাম্‌শে ফিল্ আরদে মারাহা"— "হে আমার পুত্র! তুমি মানুষের প্রতি মুখ বিকৃত করিও না, পৃথিবীতে দম্ভ সহকারে চলিও না।"[৭] সকলে একবার পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে আবার চুপ ক'রে রইল। মুয়াজ্জীন বলল:..."দেওয়ানজী থেকে মোল্লা-মৌলবী-কাজী-মুৎসদ্দী-মহাজন সকলেই গরীব চাষার খুন চুষে ঘুষ খায়, সুদ খায়। গরীবের প্রতি কারও দুয়ামায়া নেই। আল্লাহ্ এমন কথা বলেন নি যে আমীরের আমিরী আর গরীবের গরীবী চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। মোল্লা-মৌলবীদের কোর্‌আন ব্যাখ্যার মুন্‌শীয়ানা আমরা অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি, আর শুনতে রাজী নই। দিন আসছে, বিচারের দিন আসছে, কেয়ামতের দিন। আল্লাহ্ বলেছেন: 'সেই কেয়ামত-দিনে কত চেহারা উজ্জ্বল হবে, কত চেহারা মলিন হবে। যাদের চেহারা

৬ কোর্‌আন ও দীনিয়াত-শিক্ষা (২য় ভাগ)

৭ মোহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ: কোর্‌আন শরীফ: পৃঃ ১০৮৩

মলিন হবে তাদের বলা হবে যে তোমাদের ঈমান্ আনবার পরেও তোমরা কাফের হয়ে গিয়েছিলে, অতএব নিজেদের কোফ্রীর জন্যে শাস্তি ভোগ করো।' সর্ব্বশক্তিমান মহান্ আল্লাহ্‌র বাণী আমরা শুনতে পাচ্ছি কানে—

"অইন্না জাহান্নামা লামোহীতাতোম্ বেল্ কাফেরীণা, য়্যাওমা য়্যাগ্‌শা-
হুমোল্ আজ্জাবো মেন্
ফাওকেহিম্ অমেন্ তাহ্‌তে আর্-জোলেহিম্ 'অয়্যাকুলো জুকু
মা-কোন্তুম তা' মূলূন্।"

"দোজখ (নরক) সর্ব্বদ্রোহীদের আবেষ্টন ক'রে আছে। যেদিন শাস্তি তাদের মাথা ও পা থেকে আচ্ছাদন ক'রে ফেলবে—সেদিন আল্লাহ্ বলবেন—যেমন তোমরা জগতে করতে তার আস্বাদ গ্রহণ কর।"[৮]

বোখারাবাসী সকলে অবাক্ হয়ে মুয়াজ্জীনের মুখের দিকে চেয়ে রইল। এ তো সেই মুয়াজ্জীন নয়, এতো সেই মোল্লা নয়, মসজিদের মিনার থেকে যার কণ্ঠের আজান শুনলে, যার কোর্‌আন ব্যাখ্যার মুন্‌শীয়ানা শুনলে মনে হয়—

"হায়রে ভজনালয়,
তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয়!"

এ হ'ল নবযুগের মুয়াজ্জীন। আজান হাঁকে নবযুগের মুয়াজ্জীন

'হাইয়া আলাল্ ফালা'হ'
'মঙ্গলের জন্যে শীঘ্র এস।'

৮ মোহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ : কোর্‌আন শরীফ : পৃ: ১০৬০

প্রথম অঙ্ক

আমীরের ঘুম ভাঙল। প্রত্যাশিত বিদ্রোহের নিঃশব্দ পদসঞ্চরণ শুনতে পেলেন আমীর। একটা অজানা, অনভিজ্ঞ আতঙ্ক সরীসৃপের মতো যেন কিল্‌বিল্‌ ক'রে আমীরের সুরভিত শরীর বেয়ে উঠছে। কিসের আতঙ্ক? বোখারার আমীরের আবার আতঙ্ক কিসের? দুর্ভেদ্য প্রাকার-বেষ্টিত বোখারা নগরীর এগারটি প্রবেশদ্বারে সশস্ত্র প্রহরীরা দণ্ডায়মান। পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে প্রহরীর পাথরের কক্ষ, সামনে তার প্রকাণ্ড এক চাবুক ঝুলছে। অজ্ঞ, অসহায়, নিরস্ত্র জনসাধারণের বিদ্রোহ শুধু কশাঘাতেই দমন করা যায়, আমীর মনে মনে ভাবছেন আর পায়চারী করছেন। নগররক্ষক, দুর্গের প্রহরী, সৈন্য সামন্ত, চাবুক, বর্শা, বল্লম, ভল্ল, বন্দুক, কামান, মোল্লা, মৌলবী, বেক্‌, বে, আমলা ও অমাত্যবর্গ, কোতোয়াল, মনসব্‌দার—

ভাবতে ভাবতে আমীর নেমে আসছেন, বিরাট ঘূর্ণায়মান সোপান পংক্তির একটার পর একটা অতিক্রম ক'রে, শয়নকক্ষ থেকে মন্ত্রণাকক্ষে। সিঁড়ির দুইপাশে ছোট ছোট অন্ধকূপ, পাথরের তৈরী ভূগর্ভস্থ কারাকক্ষ, আমীরের গড়বন্দী প্রাসাদের আভ্যন্তরীণ শোভা বর্দ্ধন করছে। আমীর আলিম খাঁ, বোখারার সর্ব্বেসর্ব্বা, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, আমিরী ভঙ্গীতে অবতরণ করছেন। সিঁড়ির দুইপাশের অন্ধকূপ থেকে দণ্ডিত বিদ্রোহী বন্দীদের গোঙানি শোনা যাচ্ছে। পাথরের অচলায়তন ভেদ ক'রেও সেই গোঙানি প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে বাইরে। আমীর নির্ব্বিকার, উদাসীন, তাঁর কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করছে না সেই গোঙানি। বেগমখানার বিগত রাত্রির নর্ত্তকীর নূপুরশিঞ্জনের রেশ তখনও তাঁর কানে লেগে আছে। অন্ধকূপগুলোর দিকে তিনি ফিরেও চাইছেন না। অলস মন্থর গতিতে

তিনি চলেছেন, পিছনে খানসামার দল। এপাশে-ওপাশে ছোট ছোট শিলাফলকের গায়ে মৃত বন্দীদের নাম খোদাই করা আছে, কেউ 'জাদিদ্', কেউ 'লিবারেল', কেউ তরুণ বোখারা আন্দোলনের নেতা, কেউ 'সোশ্যালিষ্ট' কেউ বা 'বল্‌শেভিক'। অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে অন্ধকূপের মধ্যে তাদের হত্যা করা হয়েছে। সাধারণ কাজীর বিচার নয়, স্বয়ং আল্লার পার্থিব প্রতিমূর্ত্তি আমীর আলিম খাঁর ন্যায়বিচারের সাক্ষী এই শিলাফলকগুলি। আমীর তখনও জানেন না যে তাঁর অন্ধকূপ, তাঁর নগরদুর্গ, তাঁর ন্যায়বিচারের প্রতীক গিরিশৃঙ্গের ঐ বিরাট চাবুক, সব অদূর ভবিষ্যতে মধ্যএশিয়ার যাদুঘরে স্থানান্তরিত হয়ে আগামীকালের বালক বালিকাদের মনে ঘৃণা ও কৌতুহল জাগিয়ে তুলবে।

মন্ত্রণাকক্ষে আমীর আলিম খাঁ প্রবেশ করতেই দেওয়ান্-ই-আলা (প্রধান সচিব), দেওয়ান-ই বেয়ুতাৎ (স্বরাষ্ট্র সচিব), মীর বক্সীকুল্ (প্রধান সেনাপতি), কোতোয়াল্ (নগরের পুলিশ অধ্যক্ষ) সকলে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানালেন। কিছুক্ষণ সকলে নিস্তব্ধ। বাদ্‌শাহ আলিম খাঁ সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। প্রধান মন্ত্রী বললেন: "কয়েদখানা সব ভর্ত্তি হয়ে গেল জাঁহাপনা, বিদ্রোহ তো দমল না?" চিন্তান্বিত আমীর বললেন: "বিল্‌কুল্ কয়েদ করো!" সকলের একসঙ্গে উত্তর এ'ল: "জাঁহাপনার হুকুম!"

প্রথমে 'জাদিদ্‌দের' কয়েদ করার হুকুম হ'ল। কারা এই 'জাদিদ্'? 'জাদিদ্' কথার অর্থ 'নয়া' বা 'নূতন'।[১] বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে, বিশেষ ক'রে রুশ-জাপান যুদ্ধ, ১৯০৫ সালের রুশবিপ্লব এবং ১৯০৮ সালের তুরস্ক ও পারস্যের বিপ্লবের পর মধ্য এশিয়ায় জাতীয় আন্দোলনের

১ Joshua Kunitz ;- Dawn over Samarkand (Calcutta Edition).

সূত্রপাত হয়। আমাদের দেশে ভারতবর্ষে যেমন জাতীয় আন্দোলন প্রথম যুগে মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবি ও শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, বোখারা-তুর্কীস্তানের 'জাদিদ্' আন্দোলনও ঠিক তেমনি ছিল। জাদিদ্ আন্দোলনের নেতাদের তখন উদ্দেশ্য ছিল শাসন-ব্যবস্থা ও শিক্ষা-ব্যবস্থার কিছু কিছু সংস্কার করা। কিন্তু ক্রমেই এই আন্দোলন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত শ্রেণীর সীমাবদ্ধ লক্ষ্য ছাড়িয়ে এক বিরাট জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হ'ল। আমীরের মধ্যযুগীয় শাসন-ব্যবস্থা বিলুপ্ত ক'রে আধুনিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হ'ল এই আন্দোলনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বা আদর্শ হ'ল বোখারা-তুর্কীস্তানের উদীয়মান ধনিক ও বণিকশ্রেণীর আদর্শ, মধ্যবিত্ত জনসাধারণের আদর্শ। আধুনিক তরুণ তুরস্কের শাসন ও শিক্ষা-ব্যবস্থাই ছিল এই আন্দোলনের প্রেরণা স্বরূপ। আমাদের দেশে যেমন জাতীয় বিদ্যালয়গুলি একসময় জনসাধারণের জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ করতে সহায়তা করেছে, জাদিদ্‌রাও নূতন বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে, আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলন ক'রে, দেশের মধ্যে তেমনি এক নূতন জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলেছে। কিন্তু তুললে কি হবে? মৌলবী ও মুফ্‌তীদের এক অধিবেশনে স্থির হ'ল যে জাদিদ্‌রা দেশে বিধর্ম্মী শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলন করছে। ছাত্ররা ও শিক্ষকরা আর মাটিতে উপবেশন করছে না, চেয়ারে বেঞ্চিতে বসছে। কাজী ও মৌলবীর বিচারে এসব হ'ল বিধর্ম্মী ব্যাপার। জাদিদ্‌রা স্কুলে ধর্ম্মশিক্ষা দিচ্ছে না, কোর্‌আন ও দীনিয়াত-শিক্ষা দিচ্ছে না, তার বদলে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। সুতরাং মৌলবী মুফ্‌তীরা বললেন, এসব ধর্ম্মদ্রোহিতা, ইসলাম-বিরোধিতা, গোটা দেশটাকে কাফের তৈরী করার হীন ষড়যন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই নূতন শিক্ষা ও নূতন আন্দোলনের মধ্যে মৌলবী-মুফ্‌তী, কাজী-মোল্লারা দেখতে পেলেন যেন জাদিদ্‌রা

বাইবেল হাতে ক'রে কোর্‌আনের বিরুদ্ধে অভিযান করেছে। অর্থাৎ আধুনিক ধনতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-ব্যবস্থা, এসব ইউরোপের, এসব বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছ খৃষ্টানদের, আর মক্তব-মাদ্রাসা, মসজিদ, গড়বন্দী প্রাসাদ, অন্ধকূপ, ঘিন্‌জি অলিগলি, জীর্ণ পর্ণকুটির এবং রোগজরাব্যাধি নিয়েই যেন এশিয়ায় ধর্ম্মধ্বজী মুসলমানদের ইসলাম রাজ্যের অবিনশ্বর ব্যবস্থা। অতএব 'জেহাদ' ঘোষণা করা হ'ল জাদিদ্‌দের বিরুদ্ধে।

ইতিমধ্যে রুশ ইতিহাসের পট পরিবর্ত্তন হ'ল। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর জারের কর্ত্তৃত্ব লোপ পেল, কেরেন্‌স্কীর অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হ'ল। রুশ-বিপ্লবের প্রেরণায় বোখারা-তুর্কীস্তানের জাদিদ্‌রা অনুপ্রাণিত হ'ল বটে, কিন্তু জারের আধুনিক সংশোধিত সংস্করণ কেরেন্‌স্কী বেশীদিন তাদের উৎসাহিত হবার সুযোগ দেন নি। কর্ণেল মিলারকে কেরেন্‌স্কী প্রতিনিধিরূপে বোখারায় পাঠালেন। উদ্দেশ্য হ'ল শাসন-ব্যবস্থার যৎকিঞ্চিৎ সংস্কার ক'রে গণবিপ্লব দমন করা। কর্ণেল মিলার বোখারায় এসে আমীরকে পরামর্শ দিলেন যে গণবিক্ষোভ দমন করতে হ'লে প্রথমে উদারতার ভান করার প্রয়োজন। অতএব আর বিলম্ব না ক'রে আমীরের উচিত জনসাধারণের দাবী ২১টা সম্ভব মেনে নিয়ে এখনই এক ফরমান্ জারী করা। আমীর ১৭ই মার্চ্চ (১৯১৭) এক ফরমান্ জারী করলেন এই মর্ম্মে :

"আমাদের চিরদিনের লক্ষ্য জনসাধারণের সুখ-শান্তির কথা মনে করেই আজ আমরা স্থির করেছি যে আমাদের শাসন-ব্যবস্থার প্রত্যেক বিভাগেই রীতিমত সংস্কার প্রয়োজন এবং সেই উদ্দেশ্যে যাবতীয় দুর্নীতি ও অন্যায়ের মূলোচ্ছেদ করার জন্যে আমরা সাধারণের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের দাবীও স্বীকার ক'রে নিচ্ছি।

"সকলে নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে আমাদের পবিত্র শরিয়তের বিধান অনুযায়ী এই সব সংস্কার প্রবর্ত্তন করা উচিত এবং প্রগতি ও জ্ঞানের আলোকে বোখারাকে উজ্জ্বল করার মহৎ ও দুরূহ কর্ত্তব্য পালনে আমরা সকলের আন্তরিক সহযোগিতাও নিশ্চয়ই দাবী করতে পারি।

"খাজনা ও রাজস্ব আদায়ের যাতে সুব্যবস্থা হয়, দেশে যাতে শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় সেদিকে আমরা এখন থেকে সতর্ক দৃষ্টি দেব প্রতিজ্ঞা করছি। সরকারী কর্ম্মচারীরা তাঁদের ন্যায্য ধার্য্য বেতন ছাড়া যাতে অন্যায় উপায়ে অর্থ রোজগার করতে না পারেন এবং প্রজাদের উপর খেয়ালখুসী মতো জুলুম জবরদস্তি না করেন, সেদিকেও আমরা অত্যন্ত কড়া নজর রাখব। এ-ছাড়া শরিয়তের বিধান অনুযায়ী দেশে নানাবিষয় শিক্ষার সুযোগ সুবিধা যাতে সকলে পায় সে-ব্যবস্থাও আমরা করব। এবার অমরা সরকারী খাজনাখানা স্থাপন ক'রে রাজস্ববিভাগের আয়ব্যয়ের নিয়মিত হিসেব রাখব ঠিক করেছি।

"আমরা স্বীকার করি যে সরকারী নীতি ও কাজকর্ম্ম মঙ্গলের জন্যেই সকলের জানা প্রয়োজন। সেইজন্যে আমরা দেশে ছাপাখানা তৈরী করতে এবং প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রকাশ করতে অনুমতি দিচ্ছি।...

আজকের এই পবিত্র ঘোষণাকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে এবং দেশব্যাপী উৎসব করার জন্যে আমরা সকলশ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির আদেশ দিচ্ছি।"

বলা বাহুল্য, আমীরের এই ঘোষণাতে বিপ্লবীরা আদৌ খুসী হয় নি। কিন্তু সামান্য এই সংস্কারের ইঙ্গিতেই প্রাচীনপন্থীরা ক্রুদ্ধ হয়ে গেল!

গেল!' রব তুললেন। অর্থাৎ সব গেল, বিধর্মী, ম্লেচ্ছ আধুনিকতার স্পর্শে ইসলামের আদর্শ, শরিয়তের পবিত্রতা সব কলঙ্কিত হয়ে গেল। জনসাধারণের মধ্যে প্রাচীনদের প্রভাব তখনও নগণ্য নয়। কুসংস্কার, অশিক্ষা ও অজ্ঞতার প্রভাব যেখানে বেশী সেখানে প্রাচীনপন্থীদের প্রভাব উপ্‌ড়ে ফেলা খুব সহজ কাজ নয়। অতএব প্রাচীন মৌলবী-মুফ্‌তী-কাজী-মোল্লা সকলে এই ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন। প্রতিবাদের সাফল্য দেখে আমীর মনে মনে খুসী হলেন, কারণ তিনি তো এই চান। শুধু একটা ইঙ্গিত ক'রে তিনি দেখলেন তাঁর চেলাচামুণ্ডাদের আজও জনসাধারণের উপর কতটা প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। যখন তিনি দেখলেন যে প্রভাব তাদের এখনও যথেষ্ট আছে, অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণের উপর এখনও ভরসা করা যায়, তখন আমীর রাতারাতি তাঁর নিজস্ব উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি বিপ্লবী নেতাদের গ্রেপ্তার করার পরওয়ানা জারী করলেন এবং নির্ম্মমভাবে তাদের বেত্রাঘাত করার আদেশ দিলেন। একজন নেতা, মিরজা নসরুল্লা, পরদিন মারা গেলেন। মিরজার মৃত্যুতে বোখারার প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক দেশপ্রেমিক ব্যথিত ও বিচলিত হলেন। আমীরের হুমকি উপেক্ষা করেও মিরজার শবযাত্রায় বিক্ষুব্ধ জনতা উদ্বেল হয়ে উঠল। ভয় পেলেন আমীর। আর আতঙ্কিত হলেন জাদিদ্‌ আন্দোলনের প্রবীণ, কাপুরুষ নেতারা। তাঁরা সংস্কার চান, বিপ্লব চান না। বিপ্লবকে তাঁরা আমীর ও তাঁর আমলা অমাত্যদের মতোই ভয় করেন। দক্ষিণপন্থী জাদিদ্‌ নেতারা আমীরের সঙ্গে আপোষরফার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি এবং তাঁদের রাজনৈতিক দলকে বৈধ করার শর্ত্তে আমীরের সঙ্গে আপোষ করতে তাঁরা রাজী আছেন। কর্ণেল মিলারের মধ্যস্থতায়

এ-সম্বন্ধে আমীরের সঙ্গে জাদিদ্ নেতাদের আলাপ আলোচনা হয়। জাদিদ্দের অন্যতম নেতা ফৈজুল্লা খোজায়েভ্ এই আলাপ-আলোচনার অতি চমৎকার এক নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। ফৈজুল্লা লিখেছেন :

"আমরা আশা করেছিলাম যে আমাদের এই নরম মনোভাব দেখলে হয়ত আমীর আমাদের রাজনৈতিক দলকে বৈধ ঘোষণা করবেন এবং প্রকাশ্যে কাজকর্ম্ম করার সুবিধা আমরা পাব। আমরা ঠিক করলাম যে মানসুরভ্, বুর্খানভ্ আর আমি,এই তিনজন প্রথমে কর্ণেল মিলারের সঙ্গে এই বিষয় আলোচনা করব। যথাসময়ে আমরা যাত্রা করলাম। মিলার আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। মান্সুরভ আলোচনা আরম্ভ করলেন। মিলার বললেন যে তিনি আমাদের সাফল্য সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না, তবে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন যাতে আমরা ব্যর্থ না হই। তাঁর মতে এ-বিষয়ে আমীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনাই ভাল।

"মিলারের কথা অনুযায়ী পরদিন আমরা আমীরের সঙ্গে দেখা করার জন্যে যাত্রা করলাম। একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ক'রে আমরা বোখারার দিকে চলেছি। বোখারাবাসীরা তখন মসজিদ থেকে নামাজ প'ড়ে ফিরছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনতা পথের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের বিদ্রূপ করছে, গালিগালাজ করছে এবং আমাদের লক্ষ্য ক'রে ইটপাটকেল ছুড়ছে। আমাদের প্রতিনিধিদের দুর্ভোগের কথা ভাবতে ভাবতে চলেছি। চারিদিক থেকে ক্ষিপ্ত জনতার হল্লা কানে আসছে। এইভাবে আমীরের কাছে আমরা পৌছলাম। একেবারে সোজা আমাদের আমীরের দরবারে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

"দেখলাম, দরবারে আমীরের আমলা-অমাত্যবর্গ সকলেই উপস্থিত রয়েছেন। সারি সারি মোল্লা-মৌলবীদের দল, ফৌজদার, কোতোয়াল,

দেওয়ানজী সকলেই অপেক্ষা করছেন। দূর থেকে আমাদের দেখেই মোল্লা মৌলবীরা তারস্বরে চীৎকার ক'রে উঠলেন এবং আমাদের লক্ষ্য ক'রে যথেষ্ট কটূক্তিও করলেন। বাইরে ক্ষিপ্ত জনতার আস্ফালন ও গর্জ্জন, আর ভিতরে মোল্লা-মৌলবীদের রক্তচক্ষু—এই অবস্থায় আমাদের বুঝতে দেরী হ'ল না আমাদের অদৃষ্টে কি আছে। আমাদের পক্ষ থেকে মান্‌সুরভ বিনীতভাবে আমীরের কাছে আবেদন করলেন এই মর্ম্মে যে যদিও আমরা আমীরের ফরমান্ মধ্যে মধ্যে অমান্য করেছি, অনেক অন্যায় ও অপরাধ করেছি, তাহ'লেও আমরা এবার সত্যই অনুতপ্ত হয়েছি। বোখারা আমাদের জন্মভূমি, বোখারা আমাদের প্রাণ। বোখারার আমীরের আদেশ নির্দ্দেশ আর অমরা অমান্য করব না কোনদিন। দয়ার অবতার আমীরের কাছে এই আমাদের বিনীত নিবেদন। আল্লাহ্ আমীরের ইচ্ছাই পূর্ণ করুন।

"মান্‌সুরভ আবেদন সুরু করতে না করতেই মোল্লা-মৌলবীরা ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে লাফিয়ে উঠলেন, ছড়ি ঘুরিয়ে আমাদের প্রতি কটূক্তি করতে আরম্ভ করলেন—আমরা কাফের, আমরা বিশ্বাসঘাতক, আমরা বেইমান, আমাদের জাহান্নমে পাঠানো উচিত। দু'চার ঘা ছড়ি আমাদের পিঠে ও মাথায় শপাশপ্ পড়ল। আমরা অবশ্য ধৈর্য হারাই নি।

"আমীর সিংহাসন ছেড়ে উঠলেন এবং আমাদের সকলকে লক্ষ্য ক'রে বললেন: 'তোমরা সকলেই আমার প্রজা। নিজেদের মধ্যে তোমরা এইভাবে হানাহানি ক'র না। পরস্পরকে তোমরা ভুল বুঝেছ। আবার তোমাদের মধ্যে সদ্ভাব ও শান্তি ফিরে আসবে। ভয় নেই, যেমন তোমরা ছিলে, তেমনি থাকবে আবার,' এই কয়েকটি কথা বলেই আমীর দরবার ছেড়ে চ'লে গেলেন!

"বাইরে এক বিশাল উন্মত্ত জনতা তখন প্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে। তাদের তর্জ্জন-গর্জ্জন, হৈ-হল্লা আমরা তখন শুনতে পাচ্ছি। তারা চীৎকার ক'রে দাবী করছে যে বিচারের জন্যে তাদের কাছে আমাদের সকলকে সমর্পণ করা হ'ক। এইবার আমরা পরিষ্কার আমীর ও তাঁর পরামর্শদাতা মিলারের মতলব বুঝতে পারলাম। যাই হ'ক, উন্মত্ত জনতার হাতে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের সমর্পণ করা হ'ল না। আমাদের স্থানান্তরিত করা হ'ল। সেখানে আমরা সারাটা দিন কাটালাম, বাইরে ক্রুদ্ধ জনতার হল্লা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। মিলার ঘন ঘন আমীরের কক্ষে যাচ্ছেন আর আসছেন। মধ্যে মধ্যে তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্ত জনতাকে শান্ত করার ভাব দেখাচ্ছেন। মনে মনে তাঁর এবং আমীরেরও ইচ্ছে যে ঐ ক্ষুধার্ত্ত ক্রোধোন্মত্ত জনতার কাছে আমাদের সমর্পণ করা হয় এবং আমাদের তারা ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেলে।

"শেষ পর্য্যন্ত আমরা রক্ষা পেয়ে গেলাম। আমীর ও তাঁর বন্ধু মিলারের দয়ায় নয়, নূতন বোখারায় বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর সম্মিলিত দাবীর জোরে। আমরা মুক্তি পেলাম। ফিরে গেলাম নূতন বোখারায়, জার ও আমীরের কবলমুক্ত নূতন বোখারায়। ষ্টেশনে ষ্টেশনে, পথে পথে সেখানে শ্রমিক ও কৃষকদের জনতা আমাদের বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছে।—"

আমীরের সঙ্গে আপোষ করার পরিণাম যে কতদূর ভয়াবহ হতে পারে তা এর পর আর কারও বুঝতে দেরী হ'ল না। জাদিদ্‌দের মধ্যে প্রাচীনপন্থী যাঁরা, আপোষপন্থী যাঁরা, নরমপন্থী যাঁরা, তাঁরা এই আলাপ আলোচনার ব্যর্থতার পর বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। জাদিদ্‌রা *"ইয়ং বোখারা পার্টি" (Young Bokhara Party) নামে

নূতন আর একটি দল গঠন করল। সংস্কার ও আপোষের সঙ্কীর্ণ অলিগলি থেকে মুক্ত হয়ে বোখারার মুক্তি আন্দোলন বিপ্লবের উন্মুক্ত রাজপথের উপর নির্ভয়ে এসে দাঁড়াল। এইবার বৈপ্লবিক অভিযানের আহ্বান, আপোষের নাকীকান্না আর নয়, কখনও নয়—

দ্বিতীয় অঙ্ক

অক্টোবর বিপ্লব, ১৯১৭। রুশিয়ায় বল্‌শেভিকদের সাফল্য ঘোষিত হ'ল। কেরেন্‌স্কী পলাতক। বজ্রাঘাত! বিনামেঘে বজ্রাঘাত! কর্ণেল মিলারের ভবিষ্যদ্বাণী তো সত্য হ'ল না? কেরেন্‌স্কী আজ কোথায়? মাত্র কয়েকমাসের ব্যবধান, এর মধ্যেই কেরেন্‌স্কীর রামরাজ্যের পরমায়ু শেষ। বিপ্লব! বিপ্লব; অসংখ্য, কোটি কোটি মানুষের পদধ্বনি, লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের বজ্রমুষ্ঠি। বিপ্লব! এই তো সেদিন, ক্রোধোন্মত্ত জনতা হল্লা ক'রে বলেছে: জাঁহাপনা! আদেশ দিন! বিপ্লবী, বিধর্ম্মী কাফেরদের জবাই করি।" আজ কি হ'ল? কেরেন্‌স্কী পলাতক! বল্‌শেভিকরা বিজয়ী! বিরাট রুশিয়া, বিশাল রুশ সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা আজ বল্‌শেভিক দুশ্‌মনরা। দুর্দ্দিন! ঘোর দুর্দ্দিন তোমার আমীর আলিম খাঁ! বল্‌শেভিকদের ঔদ্ধত্য দেখ! ক্ষমতা হাতে পেয়ে দুশ্‌মনরা এক ফরমান্ জারী করেছে। জারের অধীনস্থ সমস্ত পরাধীন জাতিকে আহ্বান ক'রে তারা বলেছে: "এতদিন পরে সকলের মুক্তির দিন এসেছে। যারা এতদিন সাম্রাজ্যবাদী জারের নির্য্যাতন ও শোষণ সহ্য করেছ, যারা এতদিন অত্যাচারী জারের উদ্যত লৌহদণ্ডের ভয়ে মাথা তুলতে পারনি, জাতিভেদ ও বর্ণবৈষম্যের অমানুষিক বর্ব্বরতার মধ্যে বাস করেছ, তারা সকলে এবার মুক্তির ও স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলছে।

পায়। রুশিয়ার জারের সিংহাসন আজ ধূলিসাৎ হয়েছে। রুশিয়ায় শ্রমিক ও কৃষকদের 'রাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শ্রমিক ও কৃষকেরা সাম্রাজ্য চায় না, লুণ্ঠন ও শোষণ করা ধনদৌলত তারা চায় না, পরাধীনতা তারা ঘৃণা করে, জাতিভেদ ও বর্ণবৈষম্যের বর্ব্বরতা তাদের কল্পনাতীত। শোষিত ও নিঃস্ব যারা, পরাধীন ও দাস যারা, তাদের কোন জাত নেই, বর্ণ নেই, তারা একজাত, এক শ্রেণী। তাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে তোমরাও চলো। তাদের বিপ্লবের আদর্শকে তোমরাও বহন ক'রে এগিয়ে যাও, বিপ্লবকে জয়যুক্ত করো। সাম্য, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার পথে আমরা তোমাদের সহযাত্রী।" আমীর শিউরে উঠলেন, ঘৃণায় ও ভয়ে। এ হ'ল বল্‌শেভিকদের কারসাজি! দুশ্‌মনদের দুর্বুদ্ধির আর অন্ত নেই। আমীর ভাবছেন আর পায়চারী করছেন নিভৃত কক্ষে। দেয়ালে তলোয়ার ঝুলছে, কোষমুক্ত তলোয়ার, আমীরের বীরত্ব ও পৌরুষের প্রতীক বল্‌শেভিকরা এই কৌশলে গোটা রুশসাম্রাজ্যের জনসাধারণকে বশ করতে চায়। স্বাধীনতা! সাম্য! স্বাতন্ত্র্য! হাঃ—হাঃ—

আমীরের বিদ্রূপাত্মক কাষ্ঠহাসি প্রতিধ্বনিত হ'ল নির্জ্জন কক্ষে। লেনিন! কে লেনিন? মিলার সাহেব বলেছিল—'একজন উন্মাদ জার্মান গোয়েন্দা'। উন্মাদ! জার্মান গোয়েন্দা! লেনিন! বিপ্লব! বল্‌শেভিক! হায় আল্লাহ্! সাম্য? সাম্য কি? অর্থাৎ আমীর সৈয়দ মীর আলিম খাঁর যে ১০ কোটি রুব্‌ল্ রুশিয়ার শিল্পবাণিজ্যে খাটছে, যে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সোনারূপো আছে, তা সব বাজেয়াপ্ত ক'রে বিতরণ করা হবে এবং এই উঁচুনীচু সমাজকে সমতল করা হবে? এই সাম্য? বিস্‌মিল্লা! বিস্‌মিল্লা! আমীর মুচ্‌কি হেসে একবার কোষমুক্ত তরবারির দিকে ফিরে চাইলেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন তরবারির

দিকে, বললেন : "ইজ্জৎ রাখা চাই শমশের ! খুন্‌-খোস্‌রোজ আস্‌ছে, শম্‌শের হুঁশিয়ার !" তলোয়ার চুম্বন ক'রে আমীর আলিম খাঁ কক্ষান্তরে প্রবেশ করলেন।

আমীর তাঁর বিশ্বস্ত মন্ত্রীদের ও মোল্লা মৌলবীদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। তাঁরা বললেন, দুশ্‌মনদের বিল্‌কুল্‌ সাফ ক'রে ফেলা উচিত। তাছাড়া জাঁহাপনার কোন দুশ্চিন্তার কারণও নেই। বোখারার সামাজিক পিরামিড দুর্ভেদ্য, ইসলামধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। দেওয়ানরা বললেন, জাঁহাপনার রাজ্যে কোন অন্যায় ও অবিচার নেই, শরিয়তের বিধান অনুযায়ী তিনি তাঁর ধর্ম্মরাজ্য পরিচালনা করছেন। কাফেরদের বিদ্রোহ আল্লাই দমন করবেন। মোল্লা-মৌলবীরা ঘাড় নেড়ে দাড়ি চুমরে মন্ত্রীদের কথায় সায় দিলেন। আমীর আলিম খাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল বোখারার বিশাল মেঘচুম্বী সামাজিক পিরামিড। একদিকে আমীরের বিরাট নরসিংহ মূর্ত্তি, সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। উপরের স্তরে মন্ত্রীরা, প্রধান কাজী, প্রধান মোল্লা ও মৌলবীরা, আমীরের অন্ধভক্ত ও মোসাহেব-গোষ্ঠী। তারপর কাজী-মোল্লা-মৌলবীদের দল, আমলার দল, ধনিক ও বণিকের দল। তার নীচে গ্রামের ও নগরের মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ধনিক কৃষক, মহাজন, বেনে, আর নগরের ব্যবসায়ী ও কর্ম্মচারীরা। তার নীচে সহরের শ্রমিকশ্রেণী, কামার-চামার-ভিস্তী-ছুতার-কারিগর। সকলের নীচে দারিদ্র ও নিঃস্ব বিরাট কৃষকশ্রেণী, চেতনহীন, বোধশক্তিহীন জড়পিণ্ডের মতো দলা পাকিয়ে রয়েছে যেন, নড়েও না, সাড়াও দেয় না, কেবল সময়মতো মসজিদে যায় আর নামাজ পড়ে, আল্লার প্রিয়পাত্র আমীরের মঙ্গলের জন্যে আল্লার কাছে কাতর প্রার্থনা জানায়, নিজের মঙ্গল-অমঙ্গল জানে না। দুঃখদৈন্যে যখন বুকের পাঁজর পর্য্যন্ত ভেঙ্গে যায় তখন 'হা আল্লা !

হা আল্লা!' ব'লে বুক থাবড়ায়, তবু বিদ্রোহ করে না, আমীরের গড়বন্দী প্রাসাদের দিকে চোখ লাল ক'রে ভুলেও চায় না, আমীরের রাজপ্রাসাদ আর কাবার মসজিদ তার কাছে এক—কারণ মোল্লা বলেছেন।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন আমীর। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার মেঘ জমল মনের কোণে। আমীর কিছুতেই যেন নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। কালো কালো দুশ্চিন্তা সব দেয়ালে, সিলিঙে প্রেতের মতো ঘুরে বেড়ায়। রুশিয়ার বল্‌শেভিকদের বিপ্লব সফল হয়েছে। রেলশ্রমিক ও বল্‌শেভিকরা তাস্কেন্দে এক বিপ্লবী সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট গঠন করেছে। বিপ্লবের ঢেউ মধ্যএশিয়ার অচল অটল সামাজিক পিরামিডেও ধাক্কা দিয়েছে। ভেঙ্গে পড়েছে পিরামিড তুর্কিস্তানে, তাস্কেন্দে। রাজদূত ও গোয়েন্দারা এসে সংবাদ দিয়েছে যে বোখারার বিপ্লবীরাও গোপনে আমীরকে সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করছে। তারা নাকি তুর্কিস্তানের সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের চেয়ারম্যান্ কোলেসভের সঙ্গে এক গোপন চুক্তি করেছে। কোলেসভ্ বোখারার বিপ্লবীদের অস্ত্রশস্ত্র ও লোকজন দিয়ে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্যে প্রস্তুত হ'চ্ছে বোখারার বিপ্লবীরা। আমীর দুশ্চিন্তায় মুশ্‌ড়ে পড়লেন।

মধ্য এশিয়ার বিপ্লবী বল্‌শেভিক পার্টিগুলির একটি প্রধান ত্রুটির কথা এখানে বলা প্রয়োজন। বল্‌শেভিক পার্টিগুলি ছিল রুশ-প্রধান। রুশ শ্রমিক ও রুশ নেতাদের আধিপত্য ছিল ব'লে আমীর ও তাঁর অনুচরদের বিপ্লব-বিরোধী প্রচারের সুবিধা হয়েছিল খুব। বিপ্লব যে বিদেশী ও বিধর্ম্মীদের ষড়যন্ত্র, এ-কথা তাঁরা জনসাধারণের মধ্যে জোর ক'রে প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। জনসাধারণও বাইরে থেকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ খুঁজে পেল না। আমীরের ভাড়াটে প্রচারকরা তাদের মধ্যে অন্ধ জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুললেন, তাদের উগ্র ধর্ম্মান্ধতাকে

কৌশলে বিদেশীদের বিরুদ্ধে চালিত করলেন। বল্‌শেভিকদের মারাত্মক ত্রুটির জন্যে তাদের প্রথম বিপ্লবের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। দেশের অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে বল্‌শেভিকরা প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তাদের নিশ্চেষ্টতা বা নিষ্ক্রিয়তাকে তারা ভাঙতে পারে নি। তাদের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা তারা জাগিয়ে তুলতে পারে নি। আমীর তাই সুযোগ বুঝে তাদের লেলিয়ে দিলেন, বললেন, বিদেশীদের গুপ্তচর বল্‌-শেভিকরা, আমাদের সোনার বোখারাকে তারা ছারখার করতে চায়, তাদের উচ্ছেদ করো। অপ্রত্যাশিত ভাবে জনসাধারণ সাড়া দিল আমীরের শা... ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে বোখাবার বিপ্লবীরা যে সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন করল তা সফল হ'ল না। কোলেসভও তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারলেন না প্রথম দিকে, কারণ তুর্কীস্তানের সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট তখন বিপন্ন। জেনারেল ডুটভের সেনাবাহিনীর সঙ্গে কোলেসভ তখন জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত। জেনারেল ডুটভ্ সাইবেরিয়ার ধনী কসাক্ ও জারের সেনাপতিদের সহযোগিতায় মস্কো-তাস্কেন্দ রেলপথের মধ্যে ওরেনবুর্গ ষ্টেশন দখল ক'রে রুশিয়ার সঙ্গে তুর্কীস্তান ও মধ্য এশিয়ার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলেছেন। কোলেসভ্ তার বিরুদ্ধে সং' ম করছেন। কোকন্দে একটি সোভিয়েট-বিরোধী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু কোকন্দের গবর্ণমেণ্ট বেশীদিন টিকলো না। সেখানে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টই প্রতিষ্ঠিত হ'ল। কোকন্দের বিপদ দূর হবার পর কোলেসভ্ বোখারার দিকে দৃষ্টি দিলেন। আমীরকে চরম পত্র দেওয়া হ'ল। আমীর আবার কারসাজি ক'রে সময় চাইলেন এবং তার মধ্যে তিনি ভালভাবে প্রস্তুত হ'য়ে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করলেন। বিপ্লবীরা ফাঁদে পড়ল। কোলেসভ্ কোনরকমে যুদ্ধ করতে করতে তাস্কেন্দে ফিরে এলেন। এইবার আমীরের প্রতিহিং..র পালা। বিপ্লবে

যারা নেতৃত্ব করেছিল তাদের বন্দী করা হ'ল এবং প্রায় ৩২০০ বিপ্লবীকে হত্যা করা হ'ল অন্ধকূপের মধ্যে অত্যাচার ক'রে। বিপ্লবীদের প্রতি যাঁরা সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন তাঁদের ঘর থেকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে বাইরে এনে অকথ্য নির্য্যাতন করা হ'ল। এবারে আমীর আলিম খাঁ অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন।

আমীর আলিম খাঁর উল্লসিত ও আশান্বিত হবার আরও কয়েকটা কারণ ঘটল। আমীর সংবাদ পেলেন জুনায়েদ্ খাঁ নামে কে এক ব্যক্তি যাযাবর তুর্কোম্যান্‌দের বিরাট এক বাহিনী নিয়ে কিবার খাঁ-কে নাকি সিংহাসনচ্যুত করেছে। সংবাদ শুনে প্রথমে আমীর হতাশ হয়ে পড়লেন, ভাবলেন বোধ হয় বিপ্লবীদের মধ্যে কেউ হবে। কিন্তু তারপর যখন আমীর শুনলেন যে জুনায়েদ খাঁ বিপ্লবী নয়, বিদ্রোহীও নয়, একজন বাদ্‌শাহের সিংহাসন-লোভী ব্যক্তি মাত্র এবং অত্যাচারী ও ব্যভিচারী হিসেবেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী তখন আমীর খুশী হলেন। সিংহাসন যেই অধিকার করুক ক্ষতি নেই, বিপ্লবী বল্‌শেভিকরা না করলেই হ'ল। সিংহাসন নিয়ে গোপন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ইতিহাস, হানাহানি ও বীভৎস হত্যাকাণ্ডের কাহিনী মধ্য এশিয়ায় নূতন নয়। আমীর তাই জুনায়েদ খাঁর কাহিনী শুনে বিচলিত হলেন না। যখন তিনি শুনলেন জুনায়েদ খাঁর স্বেচ্ছাচারিতা সমগ্র কিবায় ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে, অত্যাচারের দাপটে জুনায়েদ খাঁ গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য মরুভূমিতে পরিণত করেছে, কিবার অর্দ্ধেক গোরস্তানে পরিণত হয়েছে, তখন আমীর আরও আনন্দিত হলেন। কারণ এইরকম দুর্দ্ধর্ষ অত্যাচারী শাসকই এখন মধ্য এশিয়ায় প্রয়োজন। বল্‌শেভিক দুশমনদের সায়েস্তা করতে হ'লে শত শত জুনায়েদ খাঁর প্রয়োজন আছে বোখারায়, কিবায়, কোকন্দে।

আমীর আরও উল্লসিত হলেন "বাস্‌মাচি" আন্দোলনের প্রভাব-বৃদ্ধির সংবাদ শুনে। এই বাস্‌মাচি আন্দোলনের ইতিহাস কি? মধ্য এশিয়ায় এই আন্দোলনের তিনটি পর্য্যায় আমরা দেখতে পাই।[১০] প্রথমে বাস্‌মাচিদের আবির্ভাব হয় প্রথম মহাযুদ্ধের আগে। দস্যুবৃত্তি, গুণ্ডামি ও খুনখারাবিই ছিল তখন বাস্‌মাচিদের লক্ষ্য। জারের আমলে দেশের সাধারণ কৃষকদের দুর্দ্দশার আর সীমা ছিল না। মধ্য এশিয়ায় যে তুলার চাষ হয় তার তদারক করতেন রুশ সাম্রাজ্যবাদীরা। বড় বড় ভূস্বামীরা তুলা বেচে মোটা মুনাফা করতেন। মধ্য এশিয়ার ভূস্বামীদের এ-সুবিধা রুশ সাম্রাজ্যবাদীরা দিতেন। যে মূল্যে তাঁরা আমেরিকা বা মিশরের তুলা কিনতেন প্রায় সেই মূল্যেই মধ্য এশিয়ার ভূস্বামীদের কাছ থেকেও তাঁরা তুলা কিনতেন। কারণ তাহ'লে ভূস্বামীরাই তুলার উৎপাদনের বৃদ্ধির দিকে নজর দেবেন। কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে দরিদ্র কৃষকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হ'ল। তাদের পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে তুলার চাষ করা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠল। বীজ কিনে, জল সেচনের ব্যবস্থা ক'রে, 'কর' দিয়ে, কর্জ্জ ক'রে নিজে চাষ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হ'ত না। মহাজনদের সুদ সমেত ঋণ শোধ করতেই সব ফসল উবে যেত। ঘরবাড়ী, ঘটিবাটি বন্ধক দিয়ে চাষ করলেও তার ন্যায্য মূল্য পাওয়া সম্ভব ছিল না। দালাল ও মহাজনরাই তার ফল ভোগ করত এবং মুনাফা করতেন জমিদারেরা। এই শোচনীয় দুরবস্থার মধ্যে প'ড়ে চাষীরা ক্রমে ঘরবাড়ী ছেড়ে পেটের দায়ে পাহাড়-পর্ব্বতের গুহায় কন্দরে আশ্রয় নিল। বণিক ও পথিকদের লুণ্ঠন ক'রে, দস্যুবৃত্তি ক'রে, তারা জীবন ধারণ করত, নিজেদের রিক্ততা ও দারিদ্র্যের প্রতিশোধ নিত। এইভাবেই হ'ল "বাস্‌মাচি" আন্দোলনের জন্ম। বাস্‌মাচি আন্দোলনের

১০ **Hans Kohn : Changing Asia**

দ্বিতীয় পর্য্যায় সুরু হ'ল বিপ্লবের পর। আমীরের সঙ্গে নবজাত সোভিয়েট রাষ্ট্রের শত্রুতার জন্যে উভয়ের মধ্যে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে গেল প্রায়। নূতন সোভিয়েট রাষ্ট্র মোটা মুনাফা যুগিয়ে মধ্য এশিয়ার ভূস্বামী ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আর তুলা কিনতে পারে না। সুতরাং মধ্য এশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হ'ল। বেকারের সংখ্যাও বেড়ে গেল, কারণ ব্যবসা-বাণিজ্য অনেক অচল হয়ে গেল। মোল্লারা প্রচার ক'রে বেড়ালেন দেশে দেশে যে কমিউনিস্টরাই এই দুরবস্থার জন্যে দায়ী। বেকারের দল মোল্লাদের কথা বিশ্বাস করল এবং মোল্লার উস্কানিতে মেতে উঠে তারা বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে গুণ্ডামি, দস্যুবৃত্তি ও গেরিলাযুদ্ধ করতে আরম্ভ করল। এই হ'ল 'বাস্‌মাচির' দ্বিতীয় পর্য্যায়। তৃতীয় পর্য্যায়ে বাস্‌মাচি আন্দোলন, অর্থাৎ গুণ্ডামি, লুঠতরাজ, খুনজখম ও দস্যুবৃত্তি বাইরের রাষ্ট্রের; বিশেষ ক'রে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় ও সহযোগিতা'য় দিন দিন বাড়তে থাকে। এইভাবে বাস্‌মাচিরা যখন দিব্যি মথা চাড়া দিয়ে উঠছে, গুণ্ডামি ও দস্যুবৃত্তি পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হয়েছে, তখন আমীর আরও উল্লসিত হলেন। কারণ তিনি ভাবলেন এইবার এই গুণ্ডা ও দস্যুদের হাতেই বিপ্লবীরা জব্দ হবে।

বাস্‌মাচিদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে দেখে আমীর আশান্বিত হলেন। দেশের মধ্যে বিপ্লবের শত্রুরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, আমীরের আশান্বিত হবারই কথা। শুধু বাস্‌মাচিরা নয়, দেশের বাইরে বিপ্লবের যত নির্ম্মম শত্রু সকলেই ধীরে ধীরে গা-ঝাড়া দিতে আরম্ভ করেছে। বাইরে রীতিমত 'সাজ-সাজ' রব প'ড়ে গিয়েছে। পড়বারই কথা। কারণ যে-বিপ্লবের সূত্রপাত হ'ল রুশিয়ায় তাকে যদি অঙ্কুরেই বিনাশ না করা যায়, বিপ্লবের বীজ মানবতার উর্ব্বর মাটিতে যদি নূতন এক সভ্যতার মহীরুহে পরিণত হয়, বিপ্লবের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ যদি পশ্চিমে ও

পূবে, ইউরোপে ও এশিয়ায় প্রচণ্ড আঘাত হানে, তাহ'লে সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের লুণ্ঠন ও শোষণের সেই সোনার দিনগুলি আর থাকবে না, তার চিতাভস্মের উপর নূতন এক রক্তিম প্রভাতের উদয় হবে, সাম্যের ও মুক্তির প্রভাত। অতএব দস্যুমহলে গগনভেদী আর্ত্তনাদ উঠল। সর্ব্বনাশ! বিপ্লব! পূবে-পশ্চিমে-উত্তরে-দক্ষিণে চারিদিকে বিপ্লবের শত্রুরা উন্মাদের মতো ছুটে চলল, বিপ্লবের নবজাত সন্তান সোভিয়েট রাষ্ট্রকে অবিলম্বে শিশুহত্যা করার জন্যে। এদের মধ্যে সেদিন দস্যু-সর্দ্দার ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। বনেদী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পৃথিবীব্যাপী বিরাট সাম্রাজ্যের ভিৎ পর্য্যন্ত কেঁপে উঠল। বিপ্লবের ঢেউ দ্রুতগতিতে এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল। এশিয়ায় বিপ্লব? বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চোখে সেদিনও যেমন ঘুম ছিল না, আজও তেমনি নেই। সেই ১৯১৭ সাল থেকে আর এই ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য প্রয়োগ ক'রে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে কুৎসা রটনা করেছে, মিথ্যা অপপ্রচার করেছে, ষড়যন্ত্র করেছে এবং একদিন সেনাবাহিনী নিয়ে তাকে ধ্বংস করতেও গিয়েছিল, কিন্তু কোন প্রচেষ্টাই তাদের সার্থক হয়নি। আজ পর্য্যন্ত তাদের অপচেষ্টার বিরাম নেই, ষড়যন্ত্র ও অপকৌশলের শেষ নেই, মিথ্যা অপপ্রচারেরও অন্ত নেই। একদিন কাবুলের উপর দিয়ে তাদের কূটনীতির ঝড় ব'য়ে গিয়েছে, কারণ সেদিন আফগানিস্তানের আমীরের বন্ধুত্ব সোভিয়েট-বিরোধী ষড়যন্ত্রের জন্যে প্রয়োজন ছিল (সে-কাহিনী আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি)। আজ প্রয়োজন শতগুণ বেড়েছে, কারণ সোভিয়েট আজ প্রচণ্ড শক্তিশালী, আজ আর সে নবজাত শিশু নয়, আজ সে যৌবনে পা দিয়েছে, আজ তার শক্তি কানায়-কানায় ভরা; আজ তাই আফগানিস্তানের আমীরের বন্ধুত্বই যথেষ্ট নয়, আজ ভারতের

বন্ধুত্বও প্রয়োজন। আজ তাই কাবুল থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কূটনৈতিক লীলাখেলার 'হেড্ কোয়ার্টার' দিল্লী ও সিমলায় স্থানান্তরিত হয়েছে।

আজকের কথা থাক। আমরা বলছি ১৯১৭-'১৮ সালের কথা। বিরাট এক দৈত্য লম্বা লম্বা বীভৎস পা ফেলে এশিয়ার বুকের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। সে-দৈত্য রূপকথার দৈত্য নয়, তার চাইতেও ভয়ঙ্কর, তার চাইতেও কুৎসিত, এই বিংশ শতাব্দীর আধুনিক দৈত্য, নাম তার 'কমিউনিজম্'। এশিয়ায় বিকট মূর্ত্তি ধারণ করল এই 'কমিউনিজম্'-দৈত্য। দৈত্য নিধনের প্রয়োজন। অতএব "সকল দৈত্যের সেরা" দৈত্য দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদীরা, দৈত্যকুলের প্রপিতামহ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নেতৃত্বে 'কমিউনিজম্'-রূপী দৈত্য নিধনের জন্যে প্রস্তুত হতে আরম্ভ করল। নিশিদিন শুধু এই নূতন "দৈত্যের" দুঃস্বপ্ন। ঘুমের ঘোরে, রাত্রে দিনে, 'কমিউনিজম্-দৈত্য' সাম্রাজ্যবাদীদের বুকের উপর এসে হাঁটুগেড়ে ব'স বলে, "অনেক রক্ত পান করেছ বন্ধু! দুনিয়ার সকলের রক্ত পান ক'রে তোমার নিজের রক্তের আস্বাদ কেমন হয়েছে আজ আমাকে একটু চেখে দেখতে দাও!"

লণ্ডন থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর গোঙানি শোনা যায়: "এশিয়া! এশিয়া! সোনার এশিয়া! সোনার ভারত! সোনার বর্ম্মা, মালয়! গ্রাস করবে কমিউনিস্ট দৈত্য! সাত সমুদ্র তের নদীর পারে আজ যদি জেগে ওঠে 'চম্পা', কমিউনিস্ট-দৈত্য যদি ডাক দিয়ে বলে—সাত ভাই চম্পা জাগো! দৈত্যের ডাকে যদি এশিয়ার মরু-প্রান্তর, গিরি-নদী, বন-উপবন, শ্যামল ক্ষেত, বন্য পশু আর আদিম অসভ্য কোটি কোটি ঘুমন্ত 'নরপশুর' দল সাড়া দেয়, তাহ'লে যে সাম্রাজ্য যায়, রাজত্ব যায়, রাজকীয় ঔদ্ধত্য যায়, বিলাসিতা যায়, আভিজাত্য যায়, সাদা চামড়ার

শ্রেষ্ঠতাভিমান যায়, শাসকের বিক্রম ও শোষকের স্বর্গরাজ্য যায়, ধূলিসাৎ হয়ে যায় সব! অতএব দুনিয়ার শোষক ও শাসকেরা জাগো!"

প্যারিস্ থেকে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীর গোঙানি শোনা যায়: "বৃটিশ ভাই! জাগো! আর সময় নেই! দুরন্ত শিশুকে আর গোকুলে বাড়তে দিও না বন্ধু! সাত ভাই চম্পার ঘুম যেন ভাঙ্গে না—"

সমুদ্র-পার থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের গোঙানি শোনা যায়: "তাই তো! তাই তো! এ আবার কি হ'ল! বেশ তো ছিলাম বন্ধু! ঋণ দিয়ে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ নিয়ে, মাল যোগান দিয়ে মুনাফা ক'রে, গোটা দুনিয়াটাকে ডলারের কামান দেগে জয় ক'রে ফেলব ভেবেছিলাম। কিন্তু, তাই তো! এ আবার কি অঘটন ঘটালে যীশু! এ যে বড়ো ভয়ঙ্কর শিশু! দুনিয়ার কালো আদ্‌মিরা 'মানুষ' হবে? সর্ব্বনাশ! কালো বুনো আদ্‌মি সভ্য হবে, গাড়ী চড়বে, হোটেলে খাবে, নাচবে গাইবে, পাশে বসবে, আবার ঘাড় তুলে বলবে 'কম্‌রেড'! বাপ্! চলো, তোমরা যে যেখানে আছ—লণ্ডন, প্যারিস, ভিয়েনা, রোম, বার্লিন, প্রাগ্, ওয়ার্স, হেলসিঙ্কি, মাদ্রিদ থেকে নেপাল, ভুটান, পাঞ্জাব, কাবুল পর্য্যন্ত যে যেখানে আছ চলো, আমিও আছি। শিশু-হত্যা? ক্ষতি কি?"[১১]

[১১] Michael Sayers and Albert E. Kahn : The Great Conspiracy against Russia (Third Printing, Paper Edition, Sept. 1946): নবজাত সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বৃটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের গভীর ষড়যন্ত্রের লোমহর্ষক কাহিনী যাঁরা বিস্তারিতভাবে জানতে চান তাঁরা অবশ্যই এই বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থখানি পড়বেন। সোভিয়েট সরকারী দপ্তর থেকে নয়, বৃটিশ, ফরাসী, মার্কিন ও অন্যান্য রাষ্ট্রের রাজদূত, এজেন্ট, গোয়েন্দা ও সেনাপতিদের 'স্মৃতিকথা' ও গ্রন্থ এবং এইসব দেশের রাষ্ট্রীয়

ধর্ম্মযুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা অবতীর্ণ হ'ল। বিপ্লবের বিরুদ্ধে, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে, চারিদিক থেকে অভিযান করার পরিকল্পনা তারা করল এবং অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করল। 'ব্যাঙ্কার' এবং 'অর্‌গেনাইজার', দুই কাজের জন্যেই বৃটেন প্রস্তুত। মেন্‌শেভিকদের ট্র্যান্‌স্‌-ক্যাস্‌পিয়ান্‌ গবর্ণমেণ্টকে তারা অর্থ সাহায্য করল। কোকন্দ গবর্ণমেণ্টও বৃটেনের তাঁবেদার। ভারতবর্ষ ও চীন ঘুরে ১৯১৮ সালের ১৭ই আগষ্ট তাস্কেন্দে এসে সরকারী বৃটিশ মিশন তুর্কীস্তানের সামরিক সংগঠনে অর্থ ও বুদ্ধি যোগাতে থাকল। ডুটভের সেনাবাহিনীও ওরেন্‌বুর্গের যুদ্ধে বৃটিশের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হ'ল না। পারস্যের মেশ্‌হাদ্‌ থেকে বৃটিশ সেনাপতি ম্যাম্‌সন্‌ সামরিক বিদ্রোহের অজুহাতে চেষ্টা করলেন তাঁর ভারতীয় গুর্খাবাহিনী ও স্কটিশ হাইল্যাণ্ডারদের নিয়ে তুর্কমেনিস্তান অভিমুখে অভিযান করতে। কাশগরের (চীনা তুর্কীস্তান) বৃটিশ কন্‌সাল জর্জ ম্যাক্‌কার্টনি ক্যারাভান্‌-বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র পাঠাতে আরম্ভ করলেন। বৃটিশ ক্যাপ্‌টেন রেজিন্যাল্ড টিগ-জোন্‌স্‌ আশ্‌খাবাদের নয়জন, বাকুর ছাব্বিশজন এবং তাস্কেন্দের চৌদ্দজন 'কম্যিউনিস্টকে' আন্নাউতে হত্যা করার হুকুম দিলেন। টিগ-জোন্‌স

বিভাগের গোপন নথিপত্তর থেকে মাইকেল সেয়ার্স ও এ্যালবার্ট কাহন যে সোভিয়েট-বিরোধী আন্তর্জ্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের রোমাঞ্চকর অথচ বর্ণে বর্ণে সত্য ইতিহাস রচনা করেছেন তা এর আগে আর কারও দ্বারা সম্ভব হয়নি। এই গ্রন্থের কোন তথ্য, এমন কি কোন শব্দ ও বাক্য পর্য্যন্ত গ্রন্থকারদের কল্পনাপ্রসূত নয়। নিঃসংশয়ে বলা যায়, তথ্যসম্বলিত ইতিহাস হিসাবে এই গ্রন্থ অদ্বিতীয়। আমাদের দেশে যাদের সোভিয়েট-বিরোধী স্বাভাবিক শ্রেণী-বিদ্বেষ আছে এবং এক সম্প্রদায়ের 'বাবু-সোশ্যালিস্ট' যাঁরা সোভিয়েট-বিরোধী কুৎসা প্রচারে সাম্রাজ্যবাদীদেরও টেক্কা দেন তাঁরা এই বই প'ড়ে দেখবেন একবার।

ফার্গানা থেকে প্রায় পঁচিশ হাজার বাস্‌মাচিকে প্রচুর অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তাস্কেন্দে আমাদানি করলেন। কমিউনিস্ট-নিধন যজ্ঞের বিপুল আয়োজন হ'ল,—প্রধান হোতা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ।

সেই রুশ জার, রুশ সাম্রাজ্যবাদ এবং রুশ ভালুক আর নেই। সিংহ ও ভালুকে গা-চাটাচাটি ক'রে আপোষ-রফার, অথবা সাম্রাজ্যের বিলি-বন্দোবস্তের কোন সুদূর সম্ভাবনাও নেই। বিপ্লব দমন করতে না পারলে, সোভিয়েট রাষ্ট্রকে শিশুহত্যা না করতে পারলে, সমগ্র এশিয়ার উপর বিকটাকার কমিউনিস্ট দৈত্যের কালো ছায়া পড়বে। বৃটিশ সিংহের বিক্রম অদূর ভবিষ্যতেই চূর্ণ হয়ে যাবে। সপ্তদ্বীপে সাত ভাই চম্পা জাগবে। অজ্ঞতা ও পরাধীনতার ঘুম তাদের ভাঙবে। অতএব জাগো! দেশ-বিদেশের শোসক-শাসকেরা, ধনপতি সদাগর ও জমিদারেরা, দুনিয়ার নরঘাতকরা, বকধার্ম্মিকরা, কাজী-মোল্লা-মৌলবী-পণ্ডিত-পুরোহিতরা, দালাল মধ্যবিত্ত ও নিধিরাম সর্দ্দাররা, জাগো! বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আহ্বান! দুনিয়ার সাম্রাজ্যলোভী, মুনাফালোভী, ধনকুবেরদের আহ্বান! সাড়া দাও! বিপ্লবের বিরুদ্ধে একত্রে পা মিলিয়ে অভিযান করো!

আনন্দে আত্মহারা আমীর। বোখারার অধীশ্বর আমীর আলি খাঁ খুশীতে মশ্‌গুল। মধ্যে মধ্যে আমীর উন্মত্ত উল্লাসে চীৎকার ক'রে উঠছেন: "দুশমনদের বিল্‌কুল খুন চাই! বান্দারা হাজির?"

বান্দারা হাজির। আমীর বললেন, হারেমে এই খোশখবর পৌঁছে দিতে। হারেমে নওরাত্তির আয়োজন হবে, জাঁহাপনার হুকুম। গোলাপী রঙ্গীন শরাবে পেয়ালা ভরপুর। বাইজীদের নাচগানে গুল্‌জার হারেম, আর বিপ্লবীদের কাল্পনিক খুন পান ক'রে আমীর মশ্‌গুল। খুশীতে সব বাগে বাগ্‌।

বিপ্লবীরা আর মাথা তুলবে না কোনদিন। আমীর নিশ্চিন্ত। আমীরের আমলা-অমাত্য ও মোসাহেবরাও নিশ্চিন্ত। কাজী-মোল্লা-মৌলবীরা সকলে 'দরুদ' (শান্তিবাণী) পাঠ করছেন :

'সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম্' !

"তাঁর উপর খোদার শান্তি ও করুণাধারা বর্ষিত হ'ক!" কিন্তু খোদার করুণাধারা হাম্মামের গোলাপজল নয়। কেয়ামতের অনুষ্ঠান শেষ হয়নি আজও। বোখারার আমীর! ভরপুর পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বেগমখানায় স্ফূর্তি করো হরদম্, হয়রান হয়ে যাও! বিপ্লবীরা মরেনি আজও। তারা সত্য ও ন্যায়ের নির্ভীক বীর যোদ্ধা! আল্লাহ্ তাদের আবার বাঁচিয়ে তুলবেন কবর থেকে কেয়ামত-দিনে! সেই দিনের প্রতীক্ষায় থাকো, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর মতো!

দূর থেকে আজানের শব্দ শোনা যায় না কি? 'আল্লাহু আক্‌বার!' রাত্রির অবসাদে অবশ আমীরের হাত থেকে পেয়ালা ঢ'লে পড়ল মাটিতে, বাইজীদের ক্লান্ত কিঙ্কিনী থেমে গেল। বস্‌রাই গোলাপ ও নার্গিসলালার পাঁপড়ি ঝ'রে পড়ল কিংখাবের উপর। আবার আজানের আওয়াজ ভেসে এল কানে—

'হাইয়া আলাল্ ফালাহ্'
'মঙ্গলের জন্য শীঘ্র এস'

তৃতীয় অঙ্ক

ঘরে শত্রু, বাইরে শত্রু, চারিদিকে শত্রু। বিপ্লব বুঝি আর জয়ী হয় না! জীবন-মরণ সংগ্রামে বিপ্লবীরা ক্ষতবিক্ষত। বল্‌শেভিক দৈত্যের রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত দেহের দিকে চেয়ে সাম্রাজ্যবাদী ও তার অনুচরদের উল্লাসের আর সীমা নেই। ১৯১৮ সালে, এবং ১৯১৯ সালের প্রথমার্দ্ধেও বিপ্লবের সাফল্যের কোন সম্ভাবনা সত্যিই ছিল না। বিপ্লবকে যাঁরা রোমান্স ব'লে মনে করেন, বিপ্লবকে যাঁরা স্বতঃস্ফূর্ত্ত জোয়ার ও উচ্ছ্বাস ব'লে মনে করেন, তাঁরা বিপ্লবের এই কাহিনী থেকে বুঝতে পারবেন যে বিপ্লব কখনও তা নয়। বিপ্লব নির্ম্মম, বিপ্লব কঠোর। তার জন্যে প্রয়োজন সুসংহত সংগঠন, দূরদর্শী পরিকল্পনা এবং শক্তি। বোখারা-তাস্কেন্দের বিপ্লবীরা কোনদিনই বিপ্লবকে বুদ্‌বুদের মতো মনে করেনি। সংগঠন ও শক্তি সঞ্চয় করতে তাদের সময় লেগেছে। শত্রুদের সংহত শক্তি ও সংগঠনকে চূর্ণ করতে হ'লে অনেক বেশি শক্তি ও সংগঠনের প্রয়োজন। প্রথম সংগ্রামে তাই তাদের পক্ষে ক্লান্ত ও ক্ষতবিক্ষত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বিপ্লব সহজে পরাজিত হয় না, যদি সেই বিপ্লবের উৎস হয় দেশের জনশক্তি। সেই জনশক্তি যদি অসাড় ও অচল হয়, যদি অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের জগদ্দলের তলায় সেই জনশক্তি চাপা প'ড়ে থাকে, যদি তার আবেগ, তার গতিশীলতা, তার প্রচণ্ডতা সে হারিয়ে ফেলে, তাহ'লে তাকে সংস্কারমুক্ত ও সচেতন করতে, তার বেগ, তার গতি ও দুর্দ্ধর্ষতা ফিরিয়ে আনতে বাস্তব ইতিহাসের নির্ম্মম কশাঘাতের প্রয়োজন হয়। ১৯১৭ থেকে ১৯১৯-এর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত একটার পর একটা ঘটনার ভিতর দিয়ে ইতিহাস মধ্য এশিয়ার অচল অটল জনশক্তিকে সচল ও সক্রিয় করেছে, বাস্তব ঘটনাবলী কশাঘাতের কাজ করেছে। বিপ্লব

যেখানে জয়ী হয়েছে, সোভিয়েট যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানকার চাষী মজুর ও জনসাধারণের অগ্রগতি অন্যস্থানের জনসাধারণকে উৎসাহিত করেছে। প্রতি-বিপ্লবীদের সংগ্রামের মধ্যে তারা কোন আদর্শের সন্ধান পায়নি। তাদের কথা ও কাজের মধ্যে কোন সামঞ্জস্যও ছিল না কোনদিন। ধীরে ধীরে বোখারা-কিবার চাষীমজুর, জনসাধারণ বুঝেছে বিপ্লবীদের আদর্শ, বিপ্লবীদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা। ধীরে ধীরে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, কু-অভ্যাস ও ভ্রান্ত ধারণার লৌহগরাদ ভেঙে তারা সাড়া দিয়েছে। আমীর ও তাঁর অমাত্যদের, সাম্রাজ্যবাদী ও তার অনুচরদের ডাকে আর তারা সাড়া দেয়নি। জাগ্রত জনশক্তির সহযোগিতায় বিপ্লব প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চয় করেছে। এদিকে দৈনন্দিন সংগ্রামের ভিতর দিয়ে বিপ্লবীরাও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছে এবং সংগঠিত হয়েছে। অনেক জীবন বলিদান দিয়ে, অনেক ভুল, অনেক ত্রুটির ভিতর দিয়ে, অনেক রক্ত ক্ষয় ক'রে তবে তারা শত্রুকে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে।

আমীর নিশ্চিন্ত হয়ে প্রতিহিংসার পরিকল্পনা করছেন। শতাব্দীর মধ্যে বিপ্লবীরা যাতে আর মাথা তুলতে না পারে, বোখারার ত্রিসীমায় আর যাতে কোনদিন কোন কমিউনিস্ট কাফেরের আবির্ভাব না হয়, আমীর মন্ত্রণাকক্ষে ব'সে ব'সে তাঁর একান্ত অনুগত মন্ত্রী মন্‌সবদার-মোল্লা-মৌলবীদের সঙ্গে সেই বিষয়ে পরামর্শ করছেন। আর ওদিকে বৃটিশ সেনাপতি ও রাজদূতরা স্বপ্ন দেখছেন, প্রকৃতির অফুরন্ত রত্নভাণ্ডার মধ্য এশিয়া বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু তা হ'ল না শেষ পর্য্যন্ত। জল্পনা-কল্পনা ও মন্ত্রণা, স্বপ্ন ও ষড়যন্ত্র, সব ব্যর্থ হয়ে গেল।

দুঃসংবাদ এল। নিদারুণ দুঃসংবাদ। ১৯১৯ সালের জুন মাস। আমীর সংবাদ পেলেন তাঁর একমাত্র হিতৈষী বন্ধু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা

ট্রান্স-ক্যাস্পিয়ান থেকে সৈন্য সরিয়ে নিচ্ছে। আমীর প্রথমে বিশ্বাস করেন নি। বিশ্বাস করার কথাও নয়। তিনি জানেন, মধ্য এশিয়ায় কমিউনিস্ট বিপ্লব যদি সফল হয়, যদি কমিউনিজম্ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহ'লে সমগ্র এশিয়ায় একদিন এই শক্তি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিৎ পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে তুলবে। সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হয়ে যাবে। অতএব সঙ্কট আমীরের একার নয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বোখারার আমীরের স্বার্থের খাতিরে অর্থব্যয় ও লোকক্ষয় করছে না। আমীর নিজেও তা জানেন। তাই তো তিনি নিশ্চিন্ত। তাই তিনি সেই অপসারণের দুঃসংবাদ শুনে প্রথমে বিশ্বাস করেন নি।

বিশ্বাস না ক'রে উপায় নেই। ইতিহাস তার নিজের গতিতে এগিয়ে চলে এবং তার নিজের চলার ছন্দ আছে। আমীরের হারেমে কিম্বা আমীরের অন্ধকূপের মধ্যে ইতিহাস বন্দী নয়। সাম্রাজ্যবাদীদের পরিকল্পনা, কূটনীতি ও দিবাস্বপ্নের তালে-তালেও ইতিহাস এগিয়ে চলে না, থেমে থাকে না, অথবা পিছু হটে না। মধ্য এশিয়ার বিপ্লব দমন করার পরিকল্পনা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের তাই পরিত্যাগ করতে হ'ল। কারণ বিপ্লব তখন বোখারায় আর সীমাবদ্ধ নেই। বিপ্লব তখন নানা-রূপে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, কোথাও দাবানলের মতো, কোথাও ধূমায়িত বহ্নির মতো। আফগানিস্তানের আমীর আমানুল্লাহ্ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। বৃটিশের সামরিক অভিযান কাবুলের পথে চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে। বিজয়দর্পে আফগানরা সাম্রাজ্যবাদের দুরভিসন্ধির বেড়াজাল ছিন্ন করতে চলেছে। সংবাদ রটল, গুজব রটল, কতরকমের বাছা-বাছা মিথ্যা স্কন্ধকাটা ভূতের মতো কাবুলের পথে-পথে নেচে বেড়াল তার ঠিক নেই। মিথ্যা সংবাদ রচনা ও গুজব রটনার কারদানিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা অদ্বিতীয়। আমীর

আমানুল্লাহ্ কাফের, বল্‌শেভিকদের গুপ্তচর ইত্যাদি নানাকথা রটল। আফগানিস্তানের সীমান্ত ছাড়িয়ে ভারতবর্ষেও মুক্তি-আন্দোলনের বিষাণ বেজে উঠল। "অর্দ্ধনগ্ন ফকির" মহাত্মা গান্ধী সেই মুক্তি-সংগ্রামের সেনাপতি। আরবরা বিদ্রোহ করল, তাদের প্রতারণা করেছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। পারস্যে ও মিশরে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হৃৎপিণ্ড ধ'রে টান মেরেছে চলন্ত ইতিহাস, জাগ্রত মহা এশিয়া। সমগ্র এশিয়ার, সমগ্র পরাধীন জাতির লক্ষ্য তখন মস্কো। লণ্ডন-প্যারিস-নিউইয়র্কের বেতারের বাণী সেখানে প্রতিধ্বনিত হয় না। মস্কো বেতারে এক নূতন বাণী প্রতিধ্বনিত হয়ে ভেসে যায় পূবে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে। সে-বাণী পরাধীন জাতি কোনদিন শুনতে পায় নি। সমস্ত জাতির প্রতি মস্কো থেকে আহ্বান আসে মুক্তি-সংগ্রামের। পরাধীন মুসলমান, পরাধীন হিন্দু, পরাধীন তুর্কী-তাজিক-তাতার, খৃষ্টান-ইহুদী-চীন-মোঙ্গল, সকলের সামনে জাতিসাম্য, বর্ণসাম্য ও মুক্তির উজ্জ্বল এক চিত্র ভেসে ওঠে। মস্কো তখন পরাধীন জাতির তীর্থস্থান; বিভিন্ন দেশের মিশন ও প্রতিনিধিদের মস্কোয় আনাগোনা। মুক্তিকামী মানবের মহাতীর্থ মস্কো। দুনিয়ার গোলামদের 'মক্কা' মস্কো।

বিরাট সাম্রাজ্যের বনিয়াদ পর্য্যন্ত যখন এইভাবে কেঁপে উঠল তখন মধ্য এশিয়ায় বিপ্লব দমনের পরিকল্পনাও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বদলাতে হ'ল। ওদিকে নবগঠিত শ্রমিক কৃষকের লাল ফৌজও সংগ্রামের ভিতর দিয়ে শক্তিশালী হয়ে সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে সৈন্যদের মুখোমুখী এসে যখন দাঁড়াল, তখন সাম্রাজ্যবাদীদের সামরিক বিপর্য্যয়ও সুরু হ'ল। ১৯১৯ সালের শেষের দিকে, ১৭ই সেপ্টেম্বর, রুশিয়ার লাল ফৌজও যোগদান করল তুর্কীস্তানের লালফৌজের সঙ্গে। এই সময় সংবাদ এল যে সাইবেরিয়ায় কল্‌চাকের বাহিনী এবং দক্ষিণ রুশিয়ায় ডেনিকিনের

সেনাবাহিনীকে লালফৌজ নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছে। তারা টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ধ্বংস হয়েছে। ১৯২০ সালের ৬ই জানুয়ারী ট্রান্স-ক্যাস্‌পিয়ান্‌ ফ্রন্টের শেষ ঘাঁটি ক্র্যাস্‌নোভোডস্কও লালফৌজ দখল করল। কিছুদিন পরে সংবাদ এল ডুটভ্‌ ও আনেঙ্কভের যে অবশিষ্ট সেনাবাহিনী ছিল তাও ধ্বংস হয়েছে এবং দুই বীর সেনাপতিই চীনা তুর্কীস্তানে পলায়ন করেছেন।

আমীরের চোখের সামনে দুঃস্বপ্ন দুলে দুলে উঠছে, বিপ্লবের দুঃস্বপ্ন, কমিউনিজমের দুঃস্বপ্ন। সোনার স্বপ্ন ধূলায় লুটিয়ে পড়ছে। পেয়ালার শরাবের মতো খুশী আর উপ্‌চে পড়ছে না। কয়েকদিনের মধ্যেই মর্ম্মান্তিক দুঃসংবাদ এল, কিবার হঠাৎ-নবাব অত্যাচারী জুনায়েদ খাঁও সিংহাসনচ্যুত হয়েছেন। কিবার তরুণেরা সর্ব্বত্র বিপ্লবের ঘাঁটি তৈরী করেছে। কিবার অধিবাসীরা তাদের সাহায্য করেছে প্রত্যক্ষভাবে। জুনায়েদ খাঁ প্রাণপণে সংগ্রাম করেও জয়ী হতে পারেনি। জুনায়েদ খাঁর অকথ্য নির্য্যাতন ও পাশবিক অত্যাচার সহ্য করেও কিবার জনসাধারণ ইস্পাতের মতো সংহত শক্তি নিয়ে বিদ্রোহ করেছে। সে-বিদ্রোহ দমন করার শক্তি উদ্ধত ও অত্যাচারী জুনায়েদ খাঁর নেই। জুনায়েদ খাঁ তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে পারস্যে পালিয়ে গেলেন, বাদশাহী জীবন তাঁর শেষ হয়ে গেল। কিবার তরুণরা নূতন এক বিপ্লবী গবর্ণমেন্ট গঠন করল।

এইবার বোখারার আমীর চোখে অন্ধকার দেখছেন। আশার ক্ষীণ রশ্মিটুকুও মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। তুর্কিস্তান আগেই জাহান্নমে গিয়েছে, কিবাও গেল। বোখারার বেহেশ্‌তও কি শেষে বিপ্লবীদের জাহান্নমে পরিণত হবে? পরিত্রাণের আর পথ কোথায়? বিপ্লবের ষ্টীমরোলার চারিদিক থেকে অপ্রতিহত গতিতে বোখারার দিকে এগিয়ে

আসছে। বোথারা অবরুদ্ধ। আমীরের প্রতি বোখারাবাসীদের আর দরদ নেই। অত্যাচার, অন্যায়, অবিচার, জুলুম, ব্যভিচার, বেত্রাঘাত, অন্ধকূপ-হত্যা সব তারা এতদিন ধর্ম্মের নামে, ইসলামের নামে, শরিয়তের নামে সহ্য করেছে, আর তারা সহ্য করতে রাজী নয়। নূতন জীবনের স্ফূর্ত্তি তারা দেখছে তুর্কীস্তানে, কিবায়, আর সেই শুভদিনের প্রত্যাশায় দিন গুণছে। আমীরের জন্যে প্রাণ দিতে তারা প্রস্তুত নয়। আমীর বুঝতে পেরেছেন। তিনি বুঝেছেন যে অজ্ঞ ও অচেতন জনসাধারণের অন্ধভক্তি তাঁর প্রতি আর নেই। তিনি বুঝেছেন, তাঁর ফর্‌মান্‌, তাঁর হুকুম ভুলেও আর কোনদিন শরিয়তের বিধান ব'লে জনসাধারণ মেনে নেবে না। তিনি বুঝেছেন, ইসলামের পবিত্রতার দোহাই দিলেও তাঁর অন্যায় ও অধর্ম্মাচরণকে তারা আর মাথা হেঁট ক'রে মেনে নেবে না। তিনি এবার মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছেন যে তাঁর অন্ধকূপ, তাঁর মৃত্যুর দুর্গ, তাঁর গড়বন্দী প্রাসাদ, তাঁর মোল্লা-মৌলবী-মুফ্‌তি-মন্‌সবদার, তাঁর মসজিদ-মাদ্রাসা, এই নিয়ে যে তাঁর সোনার বোথারা, সেই বোথারাকে আর কেউ বেহেশ্‌ত মনে করবে না। তবু একবার শেষ চেষ্টা করতেই হবে, মরণ-কামড় দিতে হবে। আমীর হাতিয়ারখানায় হাতিয়ার মজুত করতে লাগলেন। বাস্‌মাচিদের সংঘবদ্ধ করতে অরম্ভ করলেন। শেষ সংগ্রাম—

বোথারার বিপ্লবীরা দেশবাসীর কাছে আবেদন করল: "ভয় নেই ভাই! বিচারের দিন আজ এসেছে, কেয়ামতের দিন। জার নিকোলাস্‌ আজ কোথায়? কোথায় আজ জারের বন্ধুবান্ধব, জারের ভাড়াটে সেনাবাহিনী, জারের অনুচর ভক্তবৃন্দ, আমীর-ওম্‌রাহ্‌রা? আজ কোথায় তারা? ইতিহাসের আবর্জ্জনা-স্তূপে। আজ আমাদের মজুর-কৃষাণের লাল ফৌজ আমাদের জন্যে জীবন পণ ক'রে সংগ্রাম করার জন্যে প্রস্তুত।

রুশিয়ার লাল ফৌজ আর বোখারার বিপ্লবী সেনাবাহিনী আজ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মুক্তির জন্যে লড়বে। আমাদের সংগ্রাম সফল হবেই। বিপ্লব জয়ী হবেই। অত্যাচারীর উদ্যত কৃপাণ ধূলায় খান্‌খান্‌ হয়ে যাবে।"

বল্‌শেভিক দৈত্য বোখারাকে গ্রাস করতে আসছে। বোখারাভিমুখী বিপ্লবের ঢেউগুলি প্রতিদিন ফুলে-ফেঁপে-গর্জ্জে উঠছে। কে তাকে প্রতিরোধ করবে? আমীর ঠক্‌-ঠক্‌ ক'রে কাঁপছেন তাঁর রত্নভাণ্ডার ও টাঁকশালের দিকে চেয়ে। পর্ব্বত-প্রমাণ স্বর্ণপিণ্ডের যে-স্তূপ জমেছে রত্নভাণ্ডারে, যে মণিমুক্তা সঞ্চিত রয়েছে, তার গতি কি হবে এখন? বল্‌শেভিক দস্যুরা সমস্ত লুঠ্‌ ক'রে নিয়ে কামার-চামার-ভিস্তী-ছুতার কৃষাণদের মধ্যে যদি বিলিয়ে দেয়! আমীর আলীম খাঁর বুকের পাঁজরগুলিকে কে যেন মুচ্‌ড়ে ভেঙে দিচ্ছে। সঞ্চিত সোনা ও মণিমুক্তার বিরহ-ব্যথায় আমীরের সমস্ত দেহমন অবসন্ন হয়ে আসছে। আমীর করজোড়ে নিবেদন করলেন বৃটিশ প্রতিনিধি লেঃ কর্নেল্‌ এথার্টনের কাছেঃ "বাঁচাও সাহেব! আমার সোনার মোহর বাঁচাও, টাঁকশাল বাঁচাও, রত্নভাণ্ডার বাঁচাও, বেগমখানা বাঁচাও, খাজনাখানা বাঁচাও! বোখারা? বোখারা জাহান্নমে যাক। প্রজারা? প্রজারা জাহান্নমে যাক! হে ধর্ম্মাবতার! হে আল্লার রসুল বৃটিশ রাজপ্রতিনিধি এথার্টন সাহেব! আমাকে বাঁচাও, আমার বেগমদের বাঁচাও, আমার সোনার মোহর, মণিমুক্তা বাঁচাও!"

বৃটিশ রাজপ্রতিনিধি আমীরের কাকুতি-মিনতিতে অভিভূত হলেন বটে, কিন্তু বাঁচাতে পারলেন না আমীরের কোটি কোটি সোনার মোহর ও মূল্যবান মণিমুক্তা। এই স্বর্ণপিণ্ডের বোঝা কাঁধে ক'রে তিনি কাশগর পর্য্যন্ত নিরাপদে পৌছতে পারবেন, এ-ভরসা ও সাহস তাঁর হ'ল না। চারিদিকে বিপ্লবের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ক্রমেই সেই পদধ্বনি

স্পষ্টতর হ'চ্ছে, নিকটতর হ'চ্ছে। কয়েকটি জেলা ও পরগণা ইতিমধ্যেই বিপ্লবীরা দখল করেছে। ক্রমেই তারা এগিয়ে আসছে বোখারার দিকে। নগর-দুর্গের প্রহরী কম্পমান, সেপাইসান্ত্রীরা সন্ত্রস্ত। আমীর নতজানু হয়ে শেষ আবেদন করলেন। বৃটিশ প্রতিনিধি "গুড্ বাই" ব'লে কাশগর পালিয়ে গেলেন। 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'! আমীর শয্যাশায়ী হলেন। তলোয়ার ঝিলিক্ দিচ্ছে না। দিল্ওয়ার আমীর! সেই জোরওয়ার শের কই আজ? দুর্ব্বল গিদ্ধড়ের মতো কেন আজ তড়্পানি? জোর হানো তলোয়ার? তৈমুরের তলোয়ার? কোথায় সেই খুন্-জোশ্? আফ্সোস্ আমীর! বড় আফ্সোস্!

১৯২০ সালের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিপ্লবীরা প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিরোধ চূর্ণ ক'রে বোখারা দখল করল। আমীরের গড়বন্দী প্রাসাদের অভ্যন্তরে পাথরের অন্ধকূপ থেকে বন্দীরা মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে এল। বিপ্লবীরা ঘোষণা করল:

> "বোখারার জমি, বোখারার জল, বোখারার ধনসম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্য সব বোখারার মজুর কৃষাণ ও জনসাধারণের। আমীর, তাঁর আমলা-অমাত্য ও মোল্লা-মৌলবীদের ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি সব এখনই আমাদের নূতন বিপ্লবী গবর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করার হুকুম দিচ্ছে।"

সেই পুরাতন ঐতিহাসিক পথ! বোখারা-সমরকন্দ থেকে যে-পথ বেরিয়ে, পাহাড়-পর্ব্বত নদী ডিঙিয়ে এঁকেবেঁকে আফগানিস্তানের সীমান্ত পেরিয়ে কাবুল-কাফেরস্তান, পেশওয়ার দিল্লী পর্য্যন্ত গিয়েছে, সেই পথ! বহু শতাব্দীর পুরাতন পথ! চেংগিস্ ও তৈমুরের দুর্দ্ধর্ষ তাতার বাহিনীর পায়ের চিহ্ন যে-পথের বুকে আজও আঁকা রয়েছে। যে-পথ

দিয়ে বৌদ্ধ শ্রমণ ও চীনা পর্য্যটকরা একদিন আনাগোনা করেছে। যে-পথের উপর দিয়ে কত বীর, কত যোদ্ধা বিজয়দর্পে অভিযান করেছে, আবার পরাজয়ের গ্লানিতে মাথা হেঁট ক'রে ফিরে গিয়েছে—সেই পথ! বৃদ্ধ হিমালয় তার সাক্ষী আছে আজও। পামির আজও ভোলেনি সে-পথের কথা, ভোলেনি হিন্দুকুশ, থিয়েন্-শান্। তুষারশুভ্র বৃদ্ধ পামির দেখছে—

আমীর চলেছেন—বোথারার আমীর—

আমু-দরিয়া পার হয়ে, পূর্ব্ব-বোথারার (এখন তাজিকিস্তান) সীমান্ত অতিক্রম ক'রে আফগানিস্তানের দিকে —

কালো কালো সিলুয়েট মূর্ত্তির মতো পলাতক আমীরের দীর্ঘ শোভাযাত্রা দেখছে বৃদ্ধ পামির—

প্রথমে আমীর—

তারপর বেগমমহলের বেগমরা—

পিল্‌খানার নানারকমের হাতি—

অশ্বশালার ইরাকী, রুমী, তুর্কী, বাদকশানী, তিব্বতী ঘোড়া—

অশ্বতরীবাহিনীর পিঠে বস্তাভরা সোনার মোহর ও মণিমুক্তা—

আমলা-অমাত্য-মোল্লা-মৌলবীরা—

মন্‌সবদার-ফৌজদার-সেপাই-সান্ত্রীরা—

আমীর চলেছেন আফগানিস্তানে—কাবুলে—

দেখছে পামির—

পামির দেখছে তার উত্তরে বিপ্লবজাত নূতন সোভিয়েট দেশ, আর তার দক্ষিণে প্রাচীন পরাধীন ভারতবর্ষ। উত্তরে স্বাধীনতা, দক্ষিণে পরাধীনতা। উত্তরে সমাজতন্ত্র, দক্ষিণে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র। উত্তরে প্রাচুর্য্য ও মুক্তির হাতছানি, দক্ষিণে দাসত্ব ও দৈন্যের গ্লানি।

এই পামিরের পাদদেশ, এই পামিরের উপত্যকা, একদিন দুই সাম্রাজ্যের মিলন-কেন্দ্র ছিল, বৃটিশের ও রুশ জারের, সিংহ ও ভালুকের। আজ জার ও আমীরের প্রস্থানের পর এই পামিরের পাদদেশ, পামিরের উপত্যকা দুইটি স্বতন্ত্র জগতের, স্বতন্ত্র আদর্শের মিলন-কেন্দ্র—

আফগানিস্তানের আমীরের অতিথি এখন বোখারার আমীর। এরপর বিপ্লবের নাটকীয় কাহিনীর নটেগাছটি মুড়িয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু আরও সামান্য একটু কাহিনী বাকি রয়েছে। কারণ ইতিহাস কখনও আনোয়ার পাশা ও ইব্রাহিম বেক্‌কে ভুলবে না বা ক্ষমা করবে না। তাছাড়া, আফগানিস্তানের আমীরের অতিথি হয়েও বোখারার আমীর বিপ্লবীদের ভুলতে বা ক্ষমা করতে পারেননি।

আমীর বোখারা ছেড়ে যাবার পর দেশের এখানে-ওখানে বিচ্ছিন্নভাবে "বাস্‌মাচি" আন্দোলন ভীষণভাবে জাঁকিয়ে উঠল। মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দুর্দ্ধর্ষ যাযাবর জাতির দলপতিরাই এই বাস্‌মাচি আন্দোলনের নেতা। আমীরের পরিত্যক্ত সিংহাসনের দুর্দ্দমনীয় লোভ এই সব দলপতিরা সম্বরণ করতে পারলেন না। তাঁরা ভাবলেন, বিপ্লবীদের তাঁরা যদি দমন করতে পারেন তাহ'লে বোখারার আমীর হয়ে তাঁরা বসবেন। আফগানিস্তানের বাচ্চাই সাকার মতো ইব্রাহিম বেক্, দৌলত্ মন্‌বাঈ, জব্বর, সুলতান ইশান্ প্রমুখ বাস্‌মাচি আন্দোলনের নেতাদের বাদ্‌শাহ হবার বাসনা প্রবল হয়ে উঠল। আমীর কাবুল থেকে সব লক্ষ্য করলেন, মনে মনে খুশীও হলেন, কারণ বিপ্লবী কাফেররা ধ্বংস হলেই তিনি শান্তি পান। লোকাই উপত্যকায় অর্দ্ধ-যাযাবর উজবেক জাতির মধ্যে "বাস্‌মাচি" আন্দোলন দ্রুত প্রভাব বিস্তার করল এবং ক্রমেই অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

আমীর অর্থ সাহায্য করতে লাগলেন, বাণী দিতে আরম্ভ করলেন কাবুল থেকে। কিন্তু বাস্‌মাচি আন্দোলন দপ্‌ ক'রে জ্ব'লে উঠেও দানা বাঁধতে পারল না। বিভিন্ন জাতির দলপতিদের মধ্যে নেতৃত্বের বিরোধ, স্বার্থের বিরোধ দেখা দিল এবং সেই বিরোধের ফলেই বাস্‌মাচি আন্দোলন নিষ্প্রভ হয়ে এল। এমন সময়, বোখারার বিপ্লবীদের প্রায়-শূন্য রঙ্গমঞ্চে প্রদীপ্ত তলোয়ার নিয়ে এলেন আনোয়ার পাশা। তখন বাস্‌মাচিদের মধ্যে ইব্রাহিম্‌ বেকেরই প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশী।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে তরুণ তুর্কীদের নেতা ছিলেন আনোয়ার পাশা। যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন সমরসচিব। যুদ্ধের পর কামালপাশা তাঁকে পদচ্যুত করেন। আনোয়ার মস্কো যান এবং সেখানে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর নানা রকম পরিকল্পনার কথা বলেন। সোভিয়েট গবর্নমেণ্টের দৃষ্টির অন্তরালে আনোয়ার কামাল পাশার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। কামাল পাশার সঙ্গে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের তখন কোন বিরোধ বা শত্রুতা ছিল না। কামাল পাশা যখন আনোয়ারের ষড়যন্ত্রের কথা সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টকে জানান, তখন সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট সতর্ক হন। আনোয়ার পাশা বোখারায় আসেন তিনি বিপ্লবী বোখারা গবর্নমেণ্টের সামরিক সংগঠনের দায়িত্ব নিয়ে। কিন্তু বোখারায় এসে তিনি নূতন গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হন। বিশ্বাসঘাতক আনোয়ার মনে করেছিলেন তাঁর চক্রান্ত ব্যর্থ হবে না, একদিন তিনি সমগ্র মধ্য এশিয়ায় বাদ্‌শাহ হয়ে রাজত্ব করতে পারবেন। কিন্তু আনোয়ারের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হ'ল। তাঁর সাময়িক সামরিক জয় বিপর্য্যয়ে পরিণত হ'ল। ইব্রাহিম বেক্‌ ও আনোয়ার পাশার সঙ্গে বিরোধ বাধল। কাবুল থেকে আমীর একবার আনোয়ার পাশার আর

একবার ইব্রাহিমের পিঠ থাব্‌ড়ান। একবার আমীর বলেন "সাবাস্‌ ইব্রাহিম!" আর একবার আনোয়ারকে বলেন :

"আনোয়ার! আনোয়ার!
দিলওয়ার তুমি, জোর তলওয়ার হানো, আর
নেস্ত্‌-ও-নাবুদ কর, মারো যত জানোয়ার!"

এদিকে হঠাৎ একদিন ইব্রাহিক বেক্‌ দিল্‌ওয়ার আনোয়ারকে বন্দী করলেন এবং পাঁচদিন গারদে আটকে রাখলেন। আনোয়ার তাতেও দমলেন না। ইব্রাহিমের ঈর্ষা ও শত্রুতা আনোয়ার পরোয়া করেন না। আনোয়ার ধীরে ধীরে বাস্‌মাচিদের অপ্রতিদ্বন্দী নেতা হয়ে উঠলেন। গোটা মুসলমান দুনিয়াকে সংঘবদ্ধ ক'রে তিনি বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে অভিযানের স্বপ্ন দেখলেন। কিন্তু বিপ্লবী সেনাবাহিনীর আত্মত্যাগ ও বীরত্ব দেখে আনোয়ার বোবা হয়ে গেলেন। বিপ্লবীরাও তো বীর মুসলমান যোদ্ধা! তারা তো আনোয়ারের আহ্বানে সাড়া দেয় না! আনোয়ার বলেন : "দুনিয়ার মুসলমান এক হও!" বিপ্লবীরা বলে : "দুনিয়ার মজুর-কৃষাণ এক হও!" সংগ্রামে আনোয়ারের পরাজয় হয়। মুসলমান মজুর কৃষাণেরই জয় হয়।

"আনোয়ার আফ্‌সোস্‌!
বখ্‌তেরই সাফ্‌ দোষ ;
রক্তেরও নাই ভাই আর সে যে তাপ জোশ্‌
ভেঙে গেছে শম্‌শের—পড়ে আছে খাপ কোষ!
আনোয়ার! আফ্‌সোস্‌!"

আনোয়ার পাশার পর সেলিম পাশা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন, কিন্তু তাঁর নেতৃত্ব কেউ স্বীকার করল না। অপমানে ও অভিমানে ক্ষুব্ধ

হয়ে সেলিম পাশা সাদা তেজীর পিঠে চ'ড়ে এক বক্তৃতা দিয়ে তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে দরিয়ায় ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু বরণ করলেন। এইবার ইব্রাহিম বেকের সুবর্ণ সুযোগ। ইব্রাহিমের দৌরাত্ম্য বাড়ল। ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত দৌরাত্ম্য করলেন ইব্রাহিম বেক্, তারপর আমীরের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে আফগানিস্তানে পালিয়ে গেলেন। তখনও ইব্রাহিমের ষড়যন্ত্রের পালা শেষ হয়নি, ১৯৩১ সালেও তিনি একবার শেষ অভিযান করলেন বোখারার দিকে। পূর্ব্ব-বোখারা তখন নূতন তাজিকিস্তান। ইব্রাহিমের শেষ অভিযানও ব্যর্থ হ'ল। আমীরের শেষ আশার প্রদীপ নিভে গেল।

উপসংহার

কাবুলের রাজপ্রাসাদে আমীর আলিম খাঁ একটি আরাম-কেদারায় চোখ বুজে শুয়ে আছেন। চলচ্চিত্রের মতো তাঁর চোখের সামনে গত কয়েক বছরের ঘটনাবলী ভেসে চলেছে। কর্ণেল্ মিলার, জেনারেল ডুটভ্, জেনারেল ম্যানসন্, জর্জ ম্যাক্‌কার্ট্‌নি, রেজিন্যাল্ড টিগ ' ন্সান্‌স্, লেঃ কর্ণেল এথার্টন, রুশজারের সেনাপতিবৃন্দ, তাঁর পার্শ্বচর অনু. .বর্গ, আমলা-অমাত্যবর্গ, মোল্লা-মৌলবী-মনসবদর-ফৌজদার, বাস্‌মাচির দল, আনোয়ার পাশা, সেলিম পাশা, ইব্রাহিম বেক্—বিরাট এক বাহিনী, আমীরের দৃষ্টিপথে ভেসে উঠে মিলিয়ে গেল বুদ্‌বুদের মতো।

তাজিকিস্তান—উজ্‌বেকিস্তানের বৈপ্লবিক প্রগতির সংবাদ ভেসে আসছে কানে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমবায় কৃষির কথা, যন্ত্রশিল্পের প্রসারের কথা। লক্ষ লক্ষ মুসলমান কৃষাণের সমাজতন্ত্রের পথে জয়যাত্রার পদধ্বনি, লক্ষ লক্ষ মুসলমান মজুরের সমাজতন্ত্রের

সৌধ নির্ম্মাণের হাতুড়ির শব্দ, গাঁইতির শব্দ প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে বেতারে সকাল সন্ধ্যায়—

চামার-কামার-ভিস্তী-ছুতারের দল আজ ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, শিল্পী ও কবি—

দুনিয়ার মজুর-কৃষাণ, নিঃস্ব ও শোষিত জনসাধারণ, আজ তাজিক-উজ্‌বেক-কির্‌গিজ-কাজাক্‌-তুর্কোম্যান্‌দের অভিনন্দন জানাচ্ছে—

"গাহি তাহাদের গান—
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফর্‌মান্‌।
শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্দ্দয় মুঠি-তলে
ত্রস্তা ধরণী নজ্‌রানা দেয় ডালি ভ'রে ফুলে ফলে।"

(নজরুল)

'হা আল্লাহ্‌'! আমীরের বুকফাটা আর্ত্তনাদ কাবুলের রাজপ্রাসাদে গুম্‌রে উঠল। কোর্‌আনের আয়াতের সুগম্ভীর প্রতিধ্বনি শোনা গেল প্রায়ান্ধকার শূন্য কক্ষের মধ্যে: "যেদিন কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে সেদিন সকলে পৃথক হয়ে যাবে। যারা ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে সৎকাজ করেছ তারা বেহেশ্‌তের উদ্যানে সুখ উপভোগ করবে। যারা ধর্ম্মদ্রোহিতা করেছ, যারা আমার নির্দ্দেশ উপেক্ষা করেছ এবং পরকালে আমার কাছে উপস্থিত হওয়া মিথ্যাজ্ঞান করেছ, তারাই শাস্তি পাবে।"

আমীরের ক্ষীণ 'হা আল্লাহ্‌'! আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভে গেল।

আবার আলো জ্ব'লে উঠল প্রেক্ষাগৃহে—তাজিকিস্তানে, উজ্‌বেকিস্তানে, কাজাকস্তানে, কিরগিজস্তানে, তুর্কমেনিস্তানে—নূতন যুগের আলো—

লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের সমবেত সঙ্গীতে মুখরিত হয়ে উঠল চারিদিক—

"জাগো—

জাগো অনশন-বন্দী, ওঠরে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত!
যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি
হাঁকে নিপীড়িত জন-মন-মথিত বাণী,
নব জনম লভি অভিনব ধরণী
ওরে ঐ আগত॥...
ওরে সর্ব্বশেষের এই সংগ্রাম-মাঝ
নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ
এই 'অন্তর-ন্যাশন্যাল-সংহতি' রে
হবে নিখিল-মানব-জাতি সমুদ্ধত।" (নজরুল)



রূপান্তর

"জায়গা-জমি, খনিজ, বনজ, জল, কল-কারখানা, খনি, রেলপথ, জলপথ, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রাষ্ট্র-পরিচালিত কৃষি-প্রতিষ্ঠান, মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠান, ঘরবাড়ী, সব হ'ল সোভিয়েট রাষ্ট্রের সম্পত্তি, অর্থাৎ সোভিয়েট ইউনিয়নের সমস্ত জনসাধারণের সম্পত্তি।"—সোভিয়েট শাসনতন্ত্র—৬ ধারা।

"জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের সমস্ত নাগরিকের অধিকার-সাম্য অচ্ছেদ্যভাবে বিধিবদ্ধ।

জাতিগত, বর্ণগত বা সাম্প্রদায়িক কারণে যদি কারও অধিকার প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষে খর্ব্ব করা হয়, অথবা সেজন্য কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আদায় করার চেষ্টা করা হয় তাহ'লে তা আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ ব'লে গণ্য হবে।"—সোভিয়েট শাসনতন্ত্র—১২৩ ধারা।

“১৯৩১ সালে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের আমন্ত্রণে আমেরিকান, জার্ম্মান, অষ্ট্রীয়ান, ফরাসী, ইতালীয়ান ও অন্যান্য বিদেশী বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়াররা মস্কো যান। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট তাঁদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজে সাহায্য করার জন্যে সকলকে আমন্ত্রণ জানান। এইসব বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আমিও ১৯৩১ সালে মস্কো যাত্রা করি এবং সেই ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত আমি মস্কোতে থাকি। জার্ম্মান বাহিনী যখন মস্কোর বহিঃপ্রান্তে হানা দিচ্ছে, মস্কো যখন অবরুদ্ধ, তখন বোধ হয় একমাত্র আমি ছাড়া আর কোন বিদেশী লোক বে-সরকারী কাজে মস্কোতে ছিলেন না। আমি একজন ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার, মস্কো গিয়েছিলাম বিখ্যাত ‘ডাইনামো’ কারখানায় কাজ করতে।

“এক-আধ-বছর নয়, এগারো বছর ধ’রে আমি সোভিয়েট ইউনিয়নের নানা স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছি, জীবনের নানাক্ষেত্রে সোভিয়েটের নূতন সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ স্বচক্ষে দেখেছি। মস্কো, লেনিনগ্রাদ, কিয়েভ, ইয়াল্টা, সোচি, সুকুম, ককেশাস, যেখানেই আমি গিয়েছি সেখানেই আমি সকলের সঙ্গে মিলেমিশে যে নিবিড় আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বের পরিচয় পেয়েছি তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সীমানা ছেড়ে আমি অন্য দেশে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করতে যাত্রা করলাম এইজন্যে যে, শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তির ও মানুষের মর্য্যাদার তারতম্য যে রকম কদর্য্যভাবে বৃটিশ ও মার্কিন সমাজে আত্মপ্রকাশ করতে দেখেছি তাতে একজন ভারতীয় হিসেবে এসব দেশে আমার প্রতিভার স্বাভাবিক বিকাশের কোন সম্ভাবনা নেই বলেই আমার বিশ্বাস হ’ল। পৃথিবীর যেখানেই গিয়েছি আমি, সেখানেই দেখেছি এই বর্ণ-বিদ্বেষ, জাতি-বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষ সমস্ত সমাজ-জীবনকে জর্জ্জরিত ক’রে তুলেছে। হাঁফিয়ে উঠেছি সেই বিষাক্ত

পরিবেশের মধ্যে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম সোভিয়েট রুশিয়ায়। পৃথিবীতে একমাত্র এই একটি দেশই আছে যেখানে মানুষকে তার মনুষ্যত্বের দিক দিয়েই বিচার করা হয়, জাতি-বর্ণ বা সম্প্রদায়ের ভেদ-বৈষম্য সে-দেশের সমাজ থেকে চিরদিনের মতো নির্ব্বাসিত। সোভিয়েট শিশুরা বাইরের পৃথিবীতে এইসব বর্ণ-বৈষম্য, জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কাহিনী শুনে অবাক হয়ে থাকে। তাদের মনে হয় যেন তারা আদিম প্রাগৈতিহাসিক যুগের নরখাদক ও ডাকিনীদের গল্প শুনছে! কেবল জাতিগত কারণে একজন উজ্‌বেক একজন তাতারকে ঘৃণা করছে, বা একজন ককেশিয়ান একজন আর্মেনিয়ানকে ঘৃণা করছে, এ কোন সোভিয়েট তরুণ কল্পনাও করতে পারে না। সোভিয়েট ইউনিয়নের ছাত্র ও তরুণদের সঙ্গে আমি আলাপ ক'রে দেখেছি, বর্ণ-বৈষম্য ও জাতি-বিদ্বেষ যে কি বস্তু তা তারা কল্পনাই করতে পারে না। তারা এমন সব প্রশ্ন করতে থাকে, যার উত্তর দেওয়া রীতিমত কঠিন। ঠিক তেমনি আমি আমার বৃটিশ বন্ধুদেরও কিছুতেই বুঝাতে পারিনি যে পৃথিবীতে এমন একটি দেশ আছে যেখানে মানুষের বর্ণ নেই, জাত নেই, সম্প্রদায় নেই, মানুষের প্রথম ও প্রধান পরিচয় 'মানুষ'। কেবল একটি মাত্র "কারণ" নেই বলেই সোভিয়েট সমাজে এসব বর্ব্বরতার বালাই নেই। অর্থাৎ শোষক ও শোষিতের শ্রেণী-বৈষম্য নেই বলেই সেখানে হাজার বর্ণের, হাজার সম্প্রদায়ের, শত শত জাতির মানুষ থেকেও তারা বর্ণহীন, সম্প্রদায়হীন, জাতিহীন, কারণ তারা শ্রেণীহীন।

"প্রতি বৎসরই আমার সহকর্ম্মীরা আমাকে একমাসের জন্যে কাজ থেকে অবসর দিতেন। বিশ্রামের জন্যে এই সময় আমি কোন স্বাস্থ্য-নিবাসে যেতাম। সেখানে দেখতাম কৃষক, মজুর, ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পী,

সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক সব এসেছেন মস্কো, লেনিনগ্রাদ, কিয়েভ, ব্ল্যাডিভষ্টক, সাইবেরিয়া, মধ্যএশিয়া, ককেশাস থেকে। সকলের মধ্যে এক অদ্ভুত অন্তরঙ্গতা ও বন্ধুত্বের ভাব দেখে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতাম। সকলে একসঙ্গে খেলা করছে, গল্প করছে, তর্ক করছে—উজ্‌বেক, তাতার, তাজিক, ইহুদী, জিপ্‌সী, রুশিয়ান—সকলের মনপ্রাণ যেন একসুরে বাঁধা, একসূত্রে গাঁথা।

"আমার নিজের সম্বন্ধে একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। মস্কোর ত্রিশ মাইল দূরে তখন জার্ম্মান বাহিনীর সঙ্গে সোভিয়েট বাহিনী জীবন-মরণ যুদ্ধে লিপ্ত। মস্কোতে তখন ভয়ানক খাদ্যাভাব। একদিন কারখানা থেকে আমি দৌড়ে একটি রেস্তোরাঁতে গেলাম। নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমি পৌঁছতে পারিনি। যেতে আমার দেরী হয়ে গিয়েছিল। গিয়ে দেখি রেস্তোরাঁর সামনে প্রকাণ্ড এক লম্বা কিউ, ক্ষুধার্ত্ত শ্রমিকরা খাদ্যের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছে। রেস্তোরাঁর পরিচালিকা বিরাট কিউ-কে আহ্বান ক'রে বললেন: 'কম্‌রেডস্! এখানে আমাদের একজন ক্ষুধার্ত্ত কম্‌রেড কারখানায় উপ্‌রি খেটে খাবার জন্যে এসেছেন। আমাদের এই কম্‌রেডটি একজন বিদেশী, ভারতীয়। যদি আপনারা কেউ আপত্তি না করেন এবং আমাকে অনুমতি দেন, তাহ'লে আমি তাঁর জন্যে কিছু খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারি!' আপত্তি করা দূরে থাকুক, বিরাট কিউয়ের শত শত ক্ষুধার্ত্ত কণ্ঠ থেকে সমস্বরে সম্মতির ধ্বনি শুনতে পেলাম। সকলেই এককণ্ঠে জবাব দিল: 'বেশ ভাল, আগে ঐ কম্‌রেডকেই খেতে দেওয়া হ'ক!' তারপর আমার দিকে ফিরে সকলে সাগ্রহে আমার করমর্দ্দন ক'রে বললে: "বসো, কম্‌রেড! লজ্জা কি? আমরা তোমার খাবার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।" আমি জীবনে কোনদিন ঐই ঘটনার কথা ভুলতে পারব না। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত

মানুষের প্রতি মানুষের এই প্রগাঢ় মমত্ববোধের কথা আমার মনে থাকবে।” ১

এ-ঘটনা অবশ্য ভুলে যাবার কথা নয়। কারণ পৃথিবীতে এই মানবিক মমত্ববোধ অত্যন্ত দুর্লভ। এই পৃথিবীর মানবসমাজ আজ বনজঙ্গলে পরিণত হয়েছে। সেখানে আছে নীচতা, স্বার্থপরতা, জাতি-ভেদ, বর্ণবৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা, শ্রেণীবিদ্বেষ, নিষ্ঠুর শোষণ ও হিংস্রতা। খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষের যে সব শ্রুতিমধুর রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনতে আমরা অভ্যস্ত, তার সঙ্গে এই কাহিনীর কোন তুলনা করা চলে না। আমরা শুনেছি, ক্ষুধার তাড়নায় মায়ের স্নেহ, ভাইয়ের ভালবাসা পর্য্যন্ত বিকৃত কদর্য্য মূর্ত্তি ধারণ করে, মানুষ জঙ্গলের পশু হয়ে যায়। কিন্তু আমরা কখনও শুনিনি যে সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা ও নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও মানুষের প্রতি মানুষের সমবেদনা ও মমতাবোধ পর্ব্বতের মতো অটল থাকতে পারে। ব্যক্তিবিশেষের মহানুভবতা ও উদারতার অতিকথা আমরা অনেক শুনেছি, কিন্তু জীবন-মরণ সঙ্কটের সময় সংঘবদ্ধ মানুষের কণ্ঠ থেকে সমবেদনার ঐকতান আমরা শুনিনি কখনও। সোভিয়েট ইউনিয়নের পেশাদার নিন্দুক ও মিথ্যা প্রচারকদের পর্ব্বতপ্রমাণ মিথ্যার স্তূপ এই একটি মাত্র আশমান-প্রমাণ সত্য ঘটনার তলায় চাপা প’ড়ে থাকবে। কোনদিন আমাদের ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারের জীবনে এই সত্যকে ফুঁড়ে মিথ্যার কদর্য্য কুঁজ ঠেলে উঠবে না, এবং তিনিও জীবনে কোনদিন ভুলতে পারবেন না এই একটি মাত্র ঘটনা।

এর পাশে বৃটিশ উপনিবেশ আফ্রিকার সামাজিক অবস্থার একটি চিত্র আঁকলে বৃটিশ আদর্শ ও সোভিয়েট আদর্শের মধ্যে পার্থক্য কি তা স্পষ্ট

---

১ ‘অমৃত বাজার পত্রিকায়’ (৫ই মে রবিবার, ১৯৪৬) প্রকাশিত মি: টি. এস. লুইস্ লিখিত ‘Lessons of Soviet Russia’ প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

বুঝতে পারা যাবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক আদর্শের ঢাক পিটিয়ে বেড়ান। অনেকে সেই ঢাকের বাদ্য শুনে বিচলিতও হন। কিন্তু বৃটিশ গণতন্ত্রের স্বরূপ কি তা একজন প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা থেকেই বর্ণনা করছি।[২]

রোডেসিয়ার একটি অভিজাত হোটেল। এককোণে একজন বৃটিশ ও একজন রুশ মুখোমুখী ব'সে আছে। মিঃ আইভর জোন্‌স ও ভোভা। মোটরের হর্ণের মতো বিশেষ এক দুরন্ত কণ্ঠে মিঃ জোন্‌স হোটেলের ওয়েটারকে ডাক দিলেন। সসম্ভ্রমে ওয়েটার এসে হাজির হ'ল, সেলাম দিয়ে দাঁড়াল টেবলের পাশে, হুজুরের হুকুমের প্রত্যাশায়। ওয়েটারটি দেখতে ঠিক জুলুদের মতো, কুচ্‌কুচে কালো, গাট্টাগোট্টা কড়া পেশীবহুল চেহারা।

ভোভা: "তোমার নাম কি?" প্রশ্ন শুনে ওয়েটারটি হকচকিয়ে গেল। বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘে ঈথিওপিয়ার সম্রাটের মতো অবস্থা হ'ল তার। সঙ্কুচিত হয়ে সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপ ক'রে। তারপর ধীরে ধীরে আম্‌তা-আম্‌তা ক'রে জবাব দিল: "সকলে আমাকে ইউজর্জ্জ ব'লে ডাকে, হুজুর!" উত্তর শুনে সমবেত হুজুরেরা সকলে হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। বেদনায় ইউজর্জ্জের মুখের ভাব বদ্‌লে গেল, কিন্তু কেউ তা দেখতে পেল না। ইউজর্জ্জ চ'লে যাবার পর একসঙ্গে একরাশ প্রশ্ন ভোভার মনের মধ্যে ঠেলাঠেলি করতে লাগল।

---

২ Leonard Barnes : Soviet Light on the Colonies ; Pp. 67-70
লিওনার্ড বার্ণস্ বৃটিশ ঔপনিবেশিক সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। ১৯৩৮ সালে তিনি সোভিয়েট দেশে যান। আফ্রিকার বৃটিশ উপনিবেশগুলি সম্বন্ধেও তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পার্থক্য বুঝতে হ'লে তাঁর এই গ্রন্থখানি অবশ্যপাঠ্য।

ভোভা : "এই ইউজর্জ্জের কথাই ধরা যাক। আপনি কি বলতে চান মিঃ জোন্‌স, ইউজর্জ্জের কোন রাজনৈতিক চেতনা বা দায়িত্ববোধ আছে ?"

জোন্‌স : "ভোট দেবার অধিকার তারও যেমন আছে, আমারও তেমনি আছে, কোন পার্থক্য নেই আমাদের মধ্যে।"

ভোভা : "বহু পুরানো কথার চাতুরী মিঃ জোন্‌স! এ-কথা অর্থহীন।"

জোন্‌স : "কেন ? যা বললাম তার মধ্যে মিথ্যে নেই একটুও।"

ভোভা : "কে বলছে মিথ্যে! কথার দিক দিয়ে নিশ্চয়ই সত্যি, কাগজে কলমেও সত্যি, কিন্তু আসলে এই ভোটাধিকারের অর্থ কি ? ভোটদাতাদের ভোটের অধিকার কি কি শর্তে এখানে স্বীকার করা হয়, জানতে পারি কি ?"

জোন্‌স : "৫০ পাউণ্ডের সম্পত্তি আর ১০০ পাউণ্ডের রোজগার থাকলেই যে-কেউ ভোট দিতে পারবে।"

ভোভা : "এই শর্ত অনুযায়ী ক'জন ইউরোপীয় হুজুর ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হন ?"

জোন্‌স : "বোধ হয় একজনও না—"

ভোভা : "আর এখানকার দেশবাসী ?"

জোন্‌স : "গতবার ভোটদাতাদের তালিকায় ৫৮জন দেশী ভোটদাতাদের নাম দেখেছিলাম মনে পড়ে।"

ভোভা : "এখানকার লোকসংখ্যা কতো ?"

জোন্‌স : "প্রায় সাড়ে বারো লক্ষ—"

ভোভা : "এর তিনভাগের দুই ভাগও যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয় তাহ'লে তার সংখ্যা হয় প্রায় ৮৩৩,০০০। এর মধ্যে মাত্র ৫৮ জনের নাম

আছে তালিকায়। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে প্রভুবংশীয় বিদেশীদের প্রায় সকলেরই ভোটাধিকার আছে, কিন্তু দেশের লোকদের প্রায় ১৪০০০-এর মধ্যে একজনের মাত্র ভোট দেবার অধিকার আছে। একেই তোমরা বলো গণতন্ত্র এবং এরই নাম ভোটাধিকারের সাম্য—কেমন ?"

জোন্স: "ভোটের সমানাধিকারের কথা তো আমি বলিনি, আমি বলেছি একই শর্তে সকলের জন্যেই ভোটের দরজা খোলা রয়েছে।"

ভোভা (হেসে): "যেমন তোমাদের এই রিজ্ হোটেলের দরজা খোলা রয়েছে সকলের জন্যে কেমন ? চমৎকার !"………

ভোভা: "রাজনীতির কথা থাক। হোটেল সম্বন্ধেই প্রশ্ন করি। এই হোটেল পরিচালনার ব্যাপারে ইউজর্জ্জের কোন দায়িত্ব আছে কি ?"

জোন্স (হেসে): "তোমার এই কথা যদি হোটেলের পরিচালকদের কানে যায় তাহ'লে রাগে ও অপমানে বোধ হয় তারা দু'দিন ধ'রে দাপাদাপি করবে।"

ভোভা: "ইউজর্জ্জ কি কোন ট্রেড ইউনিয়নের সভ্য ?"

জোন্স: "না—ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার অধিকার সকলের নেই—"

ভোভা: "ইউজর্জ্জ যা রোজগার করে তা খরচ করে কি ক'রে ?"

জোন্স: "সামান্য যা সে রোজগার করে তা স্থানীয় ষ্টোরেই খরচ করে, আবার দেনাও করে। বেশী খরচ করার সুযোগ কোথায় ?"

ভোভা: "ষ্টোর পরিচালনায় ইউজর্জ্জের কোন দায়িত্ব আছে কি ?"

জোন্স: "না—নেই। কারণ ষ্টোর সমবায় ষ্টোর নয়, লাইসেন্স-প্রাপ্ত ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হ'ল ষ্টোর।"

ভোভা: "তাহ'লে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইউজর্জ্জের কি সুযোগ

সুবিধা আছে বলতে পার ? সে নিজে কোনদিন হোটেল বা ষ্টোর খুলতে পারবে কি ?"

জোন্‌স : "পারা শক্ত, কারণ সে-সুযোগ তার নেই বললেই হয়।"

ভোভা : "ইউজর্জ্জ লিখতে-পড়তে পারে কি ?"

জোন্‌স : "পারলেও পারতে পারে। তবে লেখা-পড়া করার সুযোগ তাদের অত্যন্ত কম, শিক্ষিতের সংখ্যা হাতে গোণা যায়।"

ভোভা : "দেশরক্ষী সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার অধিকার তার আছে কি ?"

জোন্‌স : "না—নেই। কালা আদ্‌মিদের রণবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার নীতি আমাদের নয়।"

ভোভা : "তাহ'লে সে কি করতে পারে তার দেশের জন্যে, সমাজের জন্যে ?"

জোন্‌স : "কেন, যা আমরা হুকুম করব তাদের মঙ্গলের জন্যে তাই সে করতে পারে।"

ভোভা : "বাঃ—চমৎকার ! তোমরা, বিদেশী প্রভুরা, হুজুরেরা, যা তাকে হুকুম করবে তাই সে করতে পারবে তার দেশের জন্যে, তার সমাজের জন্যে। তার বেশী কিছু করার অধিকার তার নেই, যদি দেশ তার, সমাজ তার। গণতন্ত্রের আদর্শ দৃষ্টান্তই বটে ! নাগরিক হিসেবে, উৎপাদক হিসেবে, সামাজিক মানুষ হিসেবে তার কোন দায়িত্বই নেই, এমনই এক সমাজ-ব্যবস্থার অচলায়তনে সে বন্দী !"......

ভোভা : "একটা গল্প বলি শোনো ! বোবোকালানের গল্প ! হতভাগ্য ইউজর্জ্জের কথা যতবার মনে পড়ছে, ততবার আমার বোবোকালানের কথাও মনে পড়ছে। তাজিকদের দেশে খোজেণ্টে বৃদ্ধ বোবোকালান ছিল একজন ভাগচাষী। স্থানীয় কোন বে'র জমিতে

বোবোকালান তুলার চাষ করত এবং তার জন্যে সে কোন মজুরী পেত না, কারণ এইভাবে খেটে তার বাবার দেনা তাকে শুধতে হ'ত। বাবার দেনা যখন শোধ হয়ে গেল বোবোকালানের বয়স তখন প্রায় চুয়াল্লিশ। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে বোবোকালান বিয়ে করল। বিয়ের সময় আবার সে দেনা করল সেই বে'র কাছে। এই দেনার জন্যে সে আরও বিশ বছর বিনা মজুরীতে সেই বে'র জমি চাষ করবে চুক্তি করল। দুঃখের বিষয় দশ বছর পরে মারা গেল বোবোকালান। পঞ্চান্ন বছর বয়সের মধ্যে বোবোকালান পঞ্চান্ন দিনও বোধ হয় দু'বেলা পেট ভ'রে খেতে পায়নি। দশ বছর বিবাহিত জীবনের মধ্যে বোবোকালান কিন্তু চারটি ছেলের বাবা হয়েছিল। ১৯২৬ সালে যখন প্রথম আমি তাজিকিস্তানে যাই, তখন বোবোকালানের ছেলেদের সঙ্গে আমার দেখা হয়। বড় ছেলেটির বয়স তখন পঁচিশ, ছোটটির বয়স বছর সতের। কয়েক বছর ধ'রে দেশের মধ্যে ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধ চলেছে। বোবোকালানের জ্যেষ্ঠ পুত্র তখনও সেই বে'র অধীনে কাজ করছে, কারণ বাবার বিয়ের দেনা শোধ হয়নি। আর তিনটি ছেলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মাঠে কাজ ক'রে সামান্য যা রোজগার করে তাতে তাদের দু'বেলা পেট ভ'রে খাওয়া হয় না।

"দ্বিতীয়বার আমি খোজেণ্টে যাই দশ বছর পরে। খোজেণ্টের নাম বদলে তখন লেনিনাবাদ রাখা হয়েছে। বোবোকালানের সেই চার ছেলের সঙ্গে আমার আবার দেখা হয়। তারা তখন কি করছে কল্পনা করতে পার? বড় ছেলেটি তখন কয়েকটি বড় বড় সমবায় কৃষি প্রতিষ্ঠানের জলের ইঞ্জিনিয়ার। যে দেশের কৃষি সম্পূর্ণ জল সেচন-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে, সে-দেশের 'ওয়াটার ইঞ্জিনিয়ারের' কদর কত তা বুঝতেই পার। দ্বিতীয় ছেলেটি একটি বৃহৎ সমবায়

কৃষি-প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান্। তৃতীয় ছেলেটি তাজিক সোভিয়েট সোশ্যালিষ্ট রিপাব্লিকের ভাইস্-চেয়ারম্যান্। তার বয়স তখন ত্রিশ। চতুর্থ ছেলেটি আর একটি সমবায় কৃষি-প্রতিষ্ঠানের দলপতি।”

“সেই বে' এখন কোথায় ?”

“তার অন্যান্য সঙ্গীদের নিয়ে এখন সে বোধ হয় আফগানিস্তানে বা পারস্যে প্রবাসী। সেখান থেকে সোভিয়েট-বিরোধী কুৎসা রটনা করাই এখন তার কাজ। আজও আমার সেই দিনগুলির কথা মনে পড়ে। ব'সে ব'সে দিনের পর দিন উৎসাহী কৃষাণদের সমবায় চাষের কথা শুনেছি, তাদের গরু বাছুর ভেড়ার কথা, তাদের নূতন নূতন শস্যাগার ও সেচের কথা, তাদের নূতন ঘরবাড়ী, হাসপাতাল স্কুল, নার্সারীর কথা, তাদের ট্র্যাক্টর ও ট্রাকের কথা, তাদের ইলেক্ট্রিসিটি, টেলিফোন ও বেতারের কথা, তাদের চাখানার কথা।”

“চাখানা কি ?”

“চা পান করার স্থান, অর্থাৎ 'ক্লাব' বলতে যা বোঝ কতকটা তাই। স্থানীয় সমবায় কৃষিপ্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের একটা উন্মুক্ত কেন্দ্র এই চাখানাকে বলা চলে।”

“রোডেসিয়া দেখে তোমার দেশের কথা আর কি মনে পড়ছে বলো ?”

“মনে পড়ছে অনেক কিছু। যত ভাবছি ততই মনে হ'চ্ছে, তোমাদের এই সাম্রাজ্য আর আমাদের দেশের মধ্যে যেন আকাশ আর মাটির ব্যবধান। প্রথমে মনে হ'চ্ছে মানসিক পরিবেশের পার্থক্যের কথা। তাজিকিস্তানের কথাই বলি। তাজিকিস্তানের চারিদিকে স্কুল, নানারকমের স্কুল। শিশুদের স্কুল, তরুণ ও যুবকদের স্কুল, টেক্‌নিক্যাল স্কুল, ট্র্যাক্টর স্কুল, কৃষিবিজ্ঞানের স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল ইত্যাদি;

প্রত্যেকেই নূতন নূতন বিষয় শিক্ষার জন্তে, নূতন নূতন দক্ষতা অর্জ্জনের জন্তে ব্যাকুল। সুযোগও তাদের অফুরন্ত। শত শত কলাকার, হাজার হাজার কারিগর তৈরী হ'চ্ছে এইসব স্কুলে, নূতন যুগের নূতন সমাজ যারা গ'ড়ে তুলবে, মানুষের নূতন জীবনকে জয়যুক্ত করবে।"

"সবই শুনলাম। শুনতে বেশ ভালই লাগলো। এবারে তোমাদের মন্দের দিকটা একটু বলো শুনি। এতক্ষণ যা বল্‌লে তা তো কেবল নিরবচ্ছিন্ন উন্নতি ও প্রগতির দিক, কিন্তু তার ঠিক উল্টো দিকও তো একটা আছে। তোমরা তো আর সকলে মার্কস্‌বাদী ঋষি মহাপুরুষ নও, ভুলচুক্ ত্রুটিবিচ্যুতি তোমাদেরও নিশ্চয়ই হয় ?"

"নিশ্চয়ই হয়, কেন হবে না ? আমরা মানুষ, ঋষিও নই, মহাপুরুষও নই। আমাদের যথেষ্ট ভুলচুক হয়েছে। সে-কাহিনী যদি শুনতে চাও, নিঃসঙ্কোচে তাও আমি বলতে পারি তোমাকে। ১৯৩০ সালের স্টালিনাবাদের কথা বলছি। আমেরিকায় উন্মাদ 'স্বর্ণ-সন্ধানীর' সেই উদ্‌ভ্রান্ত দিনগুলির কথা মনে করো। রাতারাতি যখন ব্যাঙের ছাতার মতো নগর গজিয়ে উঠত সোনার খনির আশেপাশে। গত শতাব্দীর শেষের দিকে তোমাদের আফ্রিকায় কিম্‌বার্লে ও জোয়ানেস্‌-বার্গের অবস্থা যা হয়েছিল প্রায় সেই রকম। সংগঠনের মারাত্মক ত্রুটি, সুদক্ষ শ্রমিকের নিদারুণ অভাব, আর তার সঙ্গে উন্মত্ত ব্যস্ততা। চারিদিকে বিদেশীদের পঙ্গপাল, তার মধ্যে অধিকাংশই সর্ব্বনাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এদিকে ১৯২৫ সাল থেকে প্রতি বছর জনসংখ্যাও হু হু ক'রে বেড়ে চলেছে। গ্রামের হাট-বাজার সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, নূতন ক'রে তখনও গড়া হয়নি। হাজার হাজার লোক মাঠে গাছ-তলায় তাঁবু খাটিয়ে বাস করে। প্যাকিং-বাক্স আর কেরোসিনের টিন জোড়াতালি দিয়ে তাদের জন্তে ঘর তৈরী করা হয়েছে। স্বাস্থ্যরক্ষার

সাধারণ নিয়ম পর্য্যন্ত পালন করার ব্যবস্থা হয়নি। জলের অভাব, পরিচ্ছন্নতার অভাব, ওষুধ-পত্তর চিকিৎসার অভাব, খাদ্যের অভাব। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। মানুষের সনাতন সংস্কার, মানুষের সুপ্ত পাশবিক প্রবৃত্তি, মানুষের নূতন উদ্যম, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ সব একসঙ্গে অর্গলমুক্ত হয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনকে পঙ্কিল ক'রে তুলেছে। টাইফাস্, ডিপ্থিরিয়া, বসন্ত, কলেরা, সিফিলিস্—এইসব ব্যাধির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজী-মোল্লা-মৌলবী, বে-বাস্মাচী ও বিদেশী দুশ্মনদের ষড়যন্ত্র, গৃহযুদ্ধের উস্কানি, চারিদিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্ছে। বোর্কামুক্ত মেয়েদের খুন করছে ধর্ম্মান্ধ মোল্লার অনুচরেরা, বিপ্লবী কর্ম্মীদের হত্যা করছে আর্মীরের গুপ্তচরেরা, বাসমাচিরা ও বিদেশী গোয়েন্দারা, যন্ত্রের বিরুদ্ধে, সমবায় কৃষি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন চাষীরা—এই অবস্থায় বিপ্লবীরা প্রাণপণ সংগ্রাম করছে, একহাতে বিপ্লবের দোদুল্যমান নৌকার হাল ধ'রে আছে শক্ত মুঠোয়, আর একহাতে নূতন সমাজের ভিৎ পত্তন করছে ঘা মেরে মেরে। তারা বারবার ভুল করছে আবার সংশোধন করছে, বিপর্য্যয় হ'চ্ছে আবার জয় হ'চ্ছে—তবু তাদের ভয়ডর নেই, বুকে তাদের অসীম দুঃসাহস, চোখের সামনে লাল তারার আলোকোজ্জ্বল দিগন্ত-বিসর্পিত পথ। লেনিনের বাণী 'জীবন শিক্ষা দেয়, জীবন এগিয়ে চলে' —তাদের কানে তখন দিনরাত ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে। জীবনের ভুল থেকে শিক্ষা পেয়ে, জীবনের ওঠানামার তালে তালে তারা এগিয়ে চলেছে। এইখানেই তাদের বৈশিষ্ট্য। আমি বলছি ১৯৩০ সালের কথা, বেশিদিনের কথা নয়।"

"এইবার তোমার কথা বুঝতে পেরেছি। ব্যাধি-ব্যভিচার, ধর্ম্মান্ধতা, কুসংস্কার, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা, গোঁড়ামি ও জড়তার দুর্ভেদ্য জঙ্গল সাফ্

ক'রে তোমরা সেখানে নূতন এক অভিনব মানবসভ্যতার সৌধ গঠন করছ। তোমাদের এই গঠনের বাহাদুরি আছে ভোভা! তোমরাই ভবিষ্যৎ মানবসমাজের ইঞ্জিনিয়ার!"[৩]

এই প্রচ্ছদপটের উপর আমরা সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার বৈপ্লবিক রূপান্তরের ছবি আঁকব। এই রূপান্তর যে কতখানি ব্যাপক ও গভীর তা বুঝতে হ'লে ভোভা এবং আমাদের ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারের সুদীর্ঘ এগার বৎসরের অভিজ্ঞতার কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। বিপ্লবোত্তর কালের সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার উজ্জ্বল ছবির পাশে ভোভা বৃটেনের আফ্রিকান্ সাম্রাজ্যের মলিন ছবি তুলে ধরেছে। রিজ্ হোটেলের 'ওয়েটার' ইউজর্জ্জ আর তাজিকদের দেশের বোবোকালানের চার ছেলের যে-কাহিনী আমরা ভোভা ও জোন্‌স সাহেবের মুখ থেকে শুনেছি, তার মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শের ব্যবধান অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। আর আমাদের ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারের যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা আগে বর্ণনা করেছি তার গুরুত্ব এখানে আরও বেশী। সাম্রাজ্যবাদী ও ধনতান্ত্রিক দুনিয়াতে আজও সোভিয়েট ইউনিয়নের দুশ্‌মনদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। আমাদের দেশেও এই পেশাদার সোভিয়েট-বিদ্বেষীর অভাব নেই। ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারের অভিজ্ঞতার কথা তাঁদের কাছে অপ্রীতিকর মনে হবে। কিন্তু ইতিহাস তার জন্তে থম্‌কে থাকবে না এবং সত্য বা তাও চিরদিন মিথ্যার তলায় চাপা প'ড়ে থাকবে না। তা যদি হ'ত তাহ'লে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগেই আমাদের সভ্যতার যাত্রাপথে পূর্ণচ্ছেদ পড়ত। কিন্তু মানবসভ্যতা অপ্রতিহত গতিতে যুগ-যুগান্তরের উত্থান-পতনের ভিতর

৩ Leonard Barnes : Op. Cit., Pp. 99-102

দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ইতিহাসের দুরন্ত দুঃসাহসিক পদধ্বনি আমরা শুনতে পাচ্ছি। মধ্য এশিয়ার বুকে ইতিহাসের সেই পদচিহ্ন আঁকা রয়েছে দেখতে পাই। প্রগতির পথে মধ্য এশিয়ার যাত্রা আজও শেষ হয়নি। যাত্রা তার সুরু হয়েছে বলা চলে।

ভৌগোলিক রূপান্তর

যে-ভূগোল আমরা পড়ি তার রচয়িতা আমরাই। প্রকৃতি তার কাঠামোটা তৈরী ক'রেছে মাত্র। কিন্তু পৃথিবীর রঙীন মানচিত্রের উপর আমরা নানাদেশের যেসব অসংখ্য আঁকাবাঁকা সীমান্তরেখা দেখতে পাই, সেসব জটিল রেখা প্রকৃতি পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে নিজের খেয়াল-খুশী মতো এঁকে দিয়ে মানুষের কানে কানে ব'লে দেয়নি কোনদিন: "এই সব সীমান্তরেখার মধ্যে তোমরা সব বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হ'য়ে বন্দী হয়ে থাকো।" মানুষ ও তার সভ্যতার সুদীর্ঘ ক্রমবিকাশের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, এক-একদল মানুষ এইভাবে পৃথিবীব্যাপী এক-একটি অঞ্চলে হাজার হাজার বছর ধ'রে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন ক'রে নিজেদের কতক ন আবয়বিক ও মানসিক স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করেছে। তারা এক-একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে গ'ড়ে উঠেছে, নিজেদের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে, নিজেদের ভাব-প্রকাশের একটা ভাষা নিয়ে, নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, দৈহিক সাদৃশ্য ও মানসিক স্বকীয়তা নিয়ে। 'জাতির' ক্রমবিকাশের ইতিহাস হ'ল তাই। এ-ইতিহাস আমরা নৃবিদ্ ও জাতিবিদ্‌দের কাছে শুনতে পাই। তারপর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও স্বার্থবুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যুগে যুগে আমরা মানুষের

সঙ্গে মানুষের ভয়ঙ্কর স্বার্থ-সংঘাত দেখেছি। ধনসম্পত্তির লোভে, পররাজ্য গ্রাসের লোভে, মানুষে মানুষে নির্লজ্জ হানাহানিতে ইতিহাসের কত পৃষ্ঠা যে কলঙ্কিত হয়ে আছে তার হিসেব নেই। বিজয়ী বীরেরা তখন সীমান্ত রেখা টেনে দিয়েছে পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে, ব'লে দিয়েছে: "এই পর্য্যন্ত আমার সীমানা, ঐ পর্য্যন্ত তোমার, এর মধ্যেই তোমার-আমার গতিবিধি ও জীবন পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রিত"। এইভাবেই সীমান্ত রেখার আবির্ভাব হয়েছে, আবাব পরিবর্ত্তনও হয়েছে। মানুষকে শাসন ও শোষণ করার ফরমান্ নিয়ে যাঁরা স্বর্গ থেকে মর্ত্ত্যে নেমে এসেছেন তাঁরা তাঁদের শাসন-শোষণের সুবিধার জন্যে দেশ-বিদেশের সীমান্ত-রেখা অদল-বদল অতি সহজেই কবতে পাবেন। এইভাবে বহুবার এই পৃথিবীর ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। এই পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক নয়, অস্বাভাবিক, প্রবলের স্বার্থসিদ্ধিই এব একমাত্র উদ্দেশ্য। এই পরিবর্ত্তন কোন জাতির ক্রমোন্নতিব অনুকূল নয়, অন্তরায়।

জারের আমলে পুলিশী শাসনের সুব্যবস্থাব জন্যে সমগ্র রুশিয়াকে যদৃচ্ছা খণ্ডিত করা হয়েছিল। যে-ভাবে ট্যাক্স আদায় করার সুবিধা হয়, সৈন্য সংগ্রহ করা যায় এবং দেশেব মধ্যে কোন অসন্তোষ বা বিক্ষোভের সৃষ্টি হ'লে যাতে তাকে নির্ম্মমভাবে দমন করা যায়, রুশ জারের সেই দিকেই ছিল দৃষ্টি নিবদ্ধ।[৪] দেশ-শাসন বলতে তিনি তাই বুঝতেন এবং সেই দিকেই নজর রেখে তিনি তাঁর দেশ ও সাম্রাজ্যের ভূগোল তৈরী ক'রে নিয়েছিলেন। কোন দেশের অর্থনৈতিক স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অথবা জাতীয় বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি রুশিয়াকে খণ্ডিত করেননি। হয়ত কোন সহরের বুকের উপর দিয়ে, কোন নদীর কোমর ডিঙিয়ে, কোন খনি-অঞ্চলের মাথা কেটে, অন্য কোন

৪ N. Mikhaylov : Soviet Geography

জাতির আদি বাসস্থানকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে জারের আমলের সীমান্ত রেখাগুলি রুশ-সাম্রাজ্যের ভূগোল রচনা করেছে। ফলে, পুলিশী শাসন ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সুবিধা হয়েছে, কিন্তু দেশের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং রুশ জাতির প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠতা অন্যান্য শত শত জাতি মাথা হেঁট ক'রে মেনে নিয়েছে। বিপ্লবের পর রুশ জারের ডাণ্ডা-গুলীর রাজত্ব যখন শেষ হয়ে গেল, স্বৈরশাসনের সূর্য্য গেল অস্তাচলে, তখন বিরাট রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত শত শত জাতি ও গোষ্ঠীর কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হ'ল স্বাতন্ত্র্যের দাবী, স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী, শিক্ষা ও সংস্কৃতির দাবী, এমনকি ভাব-প্রকাশের লিখিত ভাষার দাবী পর্য্যন্ত। এই সমস্ত দাবী বিপ্লবী বল্‌শেভিকরা সানন্দে স্বীকার ক'রে নিলেন। তাঁরা ঘোষণা করলেন; "এক জাতির উপর আর এক জাতির জুলুম, এক মানবগোষ্ঠীর উপর আর এক মানবগোষ্ঠীর অত্যাচার আর চলবে না। জাতিসাম্য ও গোষ্ঠীসাম্য প্রতিষ্ঠা করাই বিপ্লবী সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের অন্যতম আদর্শ। প্রত্যেক জাতির স্বাতন্ত্র্যের ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ন্যায্য অধিকার, প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখার অধিকার, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের অধিকার সকলকে স্বীকার ক'রে নিতে হবে। জাত্যভিমান অথবা গোষ্ঠীগৌরব অমার্জ্জনীয় অপরাধ ব'লে গণ্য হবে। সকল জাতির মহামিলনে বিরাট এক 'মানবজাতি' গঠন করার দুর্গম পথেই আমাদের অভিযান সুরু হবে!"

এই অভিযানের পথে প্রথম ও প্রধান অন্তরায় হ'ল জারের আমলের পুরাতন সীমান্ত রেখাগুলি। পুরাতন ভূগোল সম্পূর্ণ অদল-বদল ক'রে নূতন ভূগোল তৈরী করতে হ'ল। দেখা গেল, সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রায় ৬০টি স্বতন্ত্র জাতি-উপজাতি আছে এবং এ-ছাড়াও আরও প্রায়

১০০টি ছোট ছোট পৃথক গোষ্ঠী আছে যার প্রত্যেকটির লোকসংখ্যা কয়েক হাজার ক'রে মাত্র। এই সব জাতি-উপজাতি ও গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে, তাদের সংঘবদ্ধতা ও গোষ্ঠীবদ্ধতা আরও সংহত করার সুযোগ দিয়ে ভৌগোলিক সীমান্ত-রেখার অদল-বদল করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু বহু জাতি-উপজাতির মহামিলনে বিশাল এক 'মানবজাতি' গঠনের দুরূহ কর্ত্তব্য বল্‌শেভিকরা অতি সুন্দরভাবে পালন করেছেন। নানাযন্ত্রীর নানাসুর নানাতান মিলিয়ে এমন অদ্ভুত অশ্রুত-পূর্ব্ব এক ঐকতান রচনা করা কোন ক্ষুদ্র প্রতিভার কাজ নয়। লেনিন ও স্টালিনের মতো অসাধারণ প্রতিভার পক্ষেই এই ঐকতান রচনা করা সম্ভব।

মধ্য এশিয়ার কথাই বলি। মধ্যএশিয়ার মানচিত্রের দিকে চেয়ে দেখলেই দেখা যাবে জারের আমলের শাসনকর্ত্তারা সমগ্র দেশটাকে টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে ফেলেছিলেন নিজেদের শাসন ও শোষণের সুবিধার জন্যে। মধ্য এশিয়ার কোন জাতি-উপজাতির স্বাতন্ত্র্য ও সংহতি রক্ষা করার দিকে তাঁদের দৃষ্টি ছিল না। তাঁরা একটা জীবন্ত দেহকে খণ্ড-বিখণ্ড অসাড় জড়পদার্থে পরিণত করেছিলেন। সীমান্তরেখার কারাগারের মধ্যে মধ্য এশিয়ার উজ্‌বেক-তাজিক-তুর্কমেন্-তাতার-কির্‌গিজ-কাজাক-কারাকাল্‌পাক্ জাতি ও উপজাতিকে তাঁরা বন্দী ক'রে রেখেছিলেন তাঁদের নিজেদের হীন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। কির্‌গিজরা কেউ রইল তুর্কীস্তান প্রদেশে, কেউ রইল স্টেপী প্রদেশে, মাঝখান দিয়ে উদ্ধত এক সীমান্ত-রেখা তর্জ্জনী তুলে' চ'লে গেল। বোখারা ও কিবা কাটাকাটি ক'রে পাশাপাশি রইল রুশ তুর্কীস্তানে, জারের ভূগোলের কি বিচিত্র খামখেয়াল! আবার বোখারা ও তুর্কীস্তান প্রদেশের সীমান্ত-রেখা কিজিল্-কুম্ মরুভূমির বুকের উপর দিয়ে এমনভাবে চ'লে গেল যাতে সেই সীমান্ত-রেখার

আশেপাশে অজস্র ইঁদারা থাকে এবং রুশ সৈন্যের কিবা আক্রমণের কোন অসুবিধা না হয়। এই সীমান্ত-রেখা জেরাফ্শান্ উপত্যকার বুক চিরে চ'লে গেল এবং যাবার পথে উপরের অংশ দিয়ে গেল রুশ জারকে, আর নীচের অংশ নামে মাত্র বোখারার আমীরকে। উপরের অংশে জল রইল জারের জন্যে, অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার শ্রেষ্ঠ শক্তি-সম্পদ থেকে বঞ্চিত হ'ল বোখারা। জেরাফ্শানের তীরে যে উজ্‌বেকরা বাস করত তাদের জোর ক'রে পৃথক ক'রে দেওয়া হ'ল, আবার কিবায় তাদের দলাদলির জন্যে তুর্কমেনদের সঙ্গে একত্রে বাস করার সুযোগ দেওয়া হ'ল। এইভাবে প্রায় প্রত্যেক জাতি-উপজাতির ধড় কেটে, মুণ্ডু কেটে, ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল বোখারায়, কিবায়, তুর্কীস্তানে। উদ্দেশ্য হ'ল প্রত্যেক জাতি বা উপজাতির স্বাতন্ত্র্য ও সংহতি যাতে নষ্ট হয়ে যায়, যাতে তাদের পারস্পরিক মিলন ও অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতি বা শক্তিবৃদ্ধি না সম্ভব হয় এবং যাতে জারের পুলিশী শাসন ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের পথ প্রশস্ত হয়।

এই খামখেয়ালী ভূগোলকে ছিঁড়ে ফেলে নূতন ক'রে রচনা করার দায়িত্ব নিলেন বিপ্লবী বল্‌শেভিকরা। জাতীয় সীমান্তরেখা নূতনভাবে খস্‌ড়া করা হ'ল। তিন টুক্‌রো একত্র ক'রে উজ্‌বেক রিপাব্‌লিক গঠিত হ'ল। পূর্ব্বের তিনটি রাষ্ট্রকে সম্মিলিত ক'রে গ'ড়ে উঠল তুর্কমেন্ রিপাব্‌লিক। বোখারা ও রুশ তুর্কীস্তানের মধ্যে বিভক্ত তাজিকদের নিয়ে গঠন করা হ'ল তাজিক রিপাব্‌লিক। দু'জন গবর্ণর-জেনারলের অধীনস্থ কিরগিজদের সংঘবদ্ধ করা হ'ল কির্‌গিজ রিপাব্‌লিকে। কারা-কাল্‌পাক রিপাব্‌লিকে কিবা ও তুর্কীস্তান থেকে মুণ্ডু ও ধড় নিয়ে কারা-কাল্‌পাকদের একত্রিত করা হ'ল। কাজাকদের নিয়ে গঠিত হ'ল কাজাক রিপাব্‌লিক। এতদিন পরে উজ্‌বেকরা পেল

তাদের উজ্‌বেকিস্তান, তাজিকরা পেল তাজিকিস্তান, তুর্ক্‌মেনরা পেল তুর্কমেনিস্তান, কির্‌গিজরা পেল কির্‌গিজ্‌স্তান, কাজাকরা পেল কাজাকস্তান, কারা-কাল্‌পাকরাও পেল তাদের আকাঙ্ক্ষিত বাসস্থান। উচ্ছৃঙ্খল যাযাবর গোষ্ঠীজীবনে পূর্ণচ্ছেদ পড়ল। জাতীয় জীবনের সংহতির পথে তারা অগ্রসর হ'ল। পরাধীনতার বন্ধন ছিঁড়ে গেল। স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ন্যায্য অধিকার তারা পেল। অশিক্ষা ও নিরক্ষরতার পথের অন্তরায় দূর হয়ে গেল। শোষণ ও উৎপীড়নের দুঃস্বপ্ন কেটে গেল, প্রাচুর্য্য ও স্বচ্ছলতা দেখা দিল ধীরে ধীরে। প্রত্যেকের ভাষা ও বর্ণমালা তৈরী হ'ল এবং সেই ভাষায় প্রত্যেক জাতি-উপজাতির কামনা-বাসনা, ব্যথা-বেদনা, আবেগ-আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্ত হয়ে উঠল। জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় সাহিত্যের নূতন ইতিহাস রচনা সুরু হ'ল।

লেনিন ও স্টালিনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হ'ল। বড় বড় জাতিবিদ্‌ ও রাজনীতিক পৃথিবীতে যে জটিল জাতি-সমস্যার সমাধান করতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে গিয়েছেন এবং সমাধান করতে গিয়ে যে-সমস্যাকে আরও জটিলতর করেছেন, যে-সমস্যা বার বার এ-পৃথিবীর শান্তিভঙ্গ ক'রে যুদ্ধবিগ্রহের অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে মানবজাতিকে নিক্ষেপ করেছে, সেই সমস্যাকে লেনিন ও স্টালিন অনায়াসেই সমাধান করেছেন তাঁদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সাহায্যে। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে শত শত জাতি উপজাতির মহামিলনের ফলে বিশাল এক মানবজাতি গ'ড়ে উঠেছে আজ। সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা, বিপদ-আপদ তারা আজ সমানভাবে সকলে অনুভব করে। কেউ কারও চেয়ে বড় বা ছোট নয়, কাউকে শাসন বা শোষণ করার অধিকার কারও নেই। সবার উপরে সকলের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হ'ল 'মানুষ'—তারপর তারা রুশ,

উক্রেনিয়ান্, উজ্‌বেক, তাতার, কাজাক, ইহুদী, আজারবৈজানী, জর্জিয়ান্, আর্মেনিয়ান্, মর্দোভিয়ান্, জার্ম্মান, চুভাস্, তাজিক, কির্‌গিজ্, বশ্‌কির, পোল্, কোমি, চেচেন্, গ্রীক্, মোল্ডাভিয়ান্, ক্যারেলিয়ান্ এবং আরও অনেক কিছু। তারা বিপদের সময় আজ একসঙ্গে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায়, দেশের জীবন-মরণ সঙ্কটের সময় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করে, উৎসব ও আনন্দের সময় বিচিত্র ভঙ্গীতে একত্রে নাচে গায়।

লেনিন বলেছিলেন: "সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ হ'ল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ও জাতিতে সীমাবদ্ধ মানবজাতিকে মুক্ত করা, জাতির সঙ্গে জাতির সম্প্রীতি স্থাপন করা এবং অবশেষে সকল জাতিকে মিলিত ক'রে এক বিশাল মানবজাতি গঠন করা।...মানুষের পক্ষে যেমন যুগসন্ধিক্ষণে নিপীড়িত শ্রেণীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা না করলে শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়, তেমনি সমস্ত নিপীড়িত, পরাধীন জাতিকে মুক্তি না দিলে, তাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার দাবী স্বীকার ক'রে না নিলে, সকল জাতির মহামিলনে এক অখণ্ড মানবজাতি গঠন করা সম্ভব নয়।"[৫]

যুগে যুগে অনেক ধর্ম্মাবতার, অনেক যুগাবতারের আবির্ভাব হয়েছে এই পৃথিবীতে। তাঁরা সব অনেক গুরু-গম্ভীর বাণী শুনিয়ে গিয়েছেন দুঃখ-ব্যাধি-জর্জ্জরিত মানুষের কানে। খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত এই পৃথিবীকে এক ধর্ম্মরাজ্য পাশে বেঁধে দেবার অনেক কল্পনা তাঁরা করেছেন। তাঁরা সব ব'লে গেলেন, সকলকে ভালবাসতে, সকলকে ক্ষমা করতে, সকলের অন্তর থেকে বিদ্বেষ-বিষ দূর করতে। তাঁরা সকলে স্মরণীয়, সকলেই বরণীয়। তবু আমাদের এই নিষ্ঠুর পৃথিবী বারবার তাঁদের ব্যর্থ নমস্কারে উপহাস ক'রে ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু লেনিন ফিরে যাননি। ব্যর্থতার

৫ V. I Lenin : Selected Works, Vol. 5 (Lawrence & Wishart Ltd, 1944 Edition) Pp. 270-'71.

দুশ্চিন্তায় তিনি অভিভূত হননি কোনদিন। যুগাত্মা লেনিনের স্বপ্ন বিজ্ঞানীর স্বপ্ন। যারা এ-পৃথিবীর বাতাস বিষাক্ত করেছে, যারা এ-পৃথিবীর আলো বারবার নিভিয়ে দিয়েছে, যাদের উদ্ধত হিংসা, অদম্য লোভ ও স্বার্থ নিঃসহায়দের বারবার হেনেছে, তাদের লেনিন ক্ষমা করতে বলেন নি, ভালবাসতে বলেন নি। বিষাক্ত সাপকে ভালবাসলে তার বিষ চ'লে যায় না, আঘাতের পর আঘাত ক'রে তার বিষদাঁত ভেঙে দিতে হয়। সমাজের এই বিষাক্ত শ্রেণীর চিতাভস্মের উপরেই লেনিন স্বাধীন স্বতন্ত্র জাতির বুনিয়াদ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তার উপরে এক বিশাল মানবজাতির সৌধ গঠনের কল্পনা করেছিলেন। যুগাবতার লেনিনের এ-স্বপ্ন বিপ্লবীর স্বপ্ন, বিজ্ঞানীর স্বপ্ন, বিরাট প্রতিভাশালী স্থপতির স্বপ্ন, চিত্রকরের স্বপ্ন, ভাস্করের স্বপ্ন, সুরকারের স্বপ্ন। সে-স্বপ্নকে আজ সার্থক ক'রে তুলেছেন স্টালিন। তাজিক, উজ্‌বেক, কির্‌গিজ, কাজাক, তুর্কমেনদের দেশে সেই স্বপ্নেরই বাস্তব রূপ আমরা দেখতে পাই।

সামাজিক রূপান্তর

প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক রূপান্তরের পর সামাজিক রূপান্তরের প্রয়োজন। পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার শিথিল ভিত্তির উপর নূতন সমাজ বা সভ্যতার সৌধ গড়া যায় না। তার জন্যে পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বদলে ফেলতে হয়। এই বদলে ফেলা সহজ কাজ নয়। পুরাতন সমাজের শ্রেণী-বিন্যাস অচল ও প্রাণহীন হ'লেও, প্রত্যেকটি শ্রেণী যুগ যুগ ধ'রে সমাজের বুকের উপর লৌহস্তম্ভের মতো সারি সারি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই সারবন্দী শ্রেণীর স্তম্ভগুলিকে ওলট্‌পালট্‌ করা বা উপ্‌ড়ে ফেলা একদিনের কাজ নয়। তার জন্যে দূরদর্শী পরিকল্পনা, কঠোর পরিশ্রম ও

অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয়। প্রকৃত বিপ্লবী যাঁরা তাঁদের এই গুণগুলি না থাকলে চলে না। কারণ আগেই বলেছি, বিপ্লবীরাও স্বপ্ন দেখেন, কিন্তু তাঁদের স্বপ্ন বিজ্ঞানীর স্বপ্ন, স্রষ্টার স্বপ্ন, নৈরাজ্যবাদী বা কল্পনা-বিলাসীর দিবাস্বপ্ন নয়।

পুরাতন সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর দিকে চেয়ে বিপ্লবীরা দেখলেন, সবার উপরে সমাজের ক্ষুদ্রতম শ্রেণী, জমিদার ব্যবসাদার ও পুঁজিপতিদের স্থান। তাঁরা প্রাক্-বৈপ্লবিক রুশিয়ার মোট জনসংখ্যার শতকরা তিনজনের কিছু বেশী মাত্র। তাঁদের পরবর্ত্তী দ্বিতীয় শ্রেণী হ'ল বিত্তবান চাষীরা অর্থাৎ কুলাকশ্রেণী, শতকরা ১২ জনের কিছু বেশী মাত্র। তৃতীয় শ্রেণী হ'ল শ্রমিক ও কর্ম্মচারী শ্রেণী, শতকরা ১৬ জনের কিছু বেশী। চতুর্থ শ্রেণী হ'ল সমাজের বৃহত্তম শ্রেণী, শতকরা ৬৫ জনেরও বেশী, অধিকাংশই ক্ষেতমজুর, ভাগচাষী বা সামান্য কারিগর মাত্র। বাকি শতকরা ২ জনের কিছু বেশী হ'ল ছাত্র, সৈনিক ও অন্যান্য শ্রেণী। মধ্য এশিয়ার কথা স্বতন্ত্রভাবে বললে বলতে হয়, যে ক্ষুদ্রতম প্রথম শ্রেণীর সংখ্যা সেখানে আরও কম এবং বৃহত্তম চতুর্থ শ্রেণীর সংখ্যা আরও বেশী ছিল।[৬] সমাজের এই যে গঠন-বিন্যাস, এই যে শ্রেণী-বিন্যাস, একে সম্পূর্ণ ভাবে বদলে ফেলতে হ'লে বিভিন্ন শ্রেণীর বিলুপ্তি, বিস্তার ও রূপান্তরের প্রয়োজন। প্রথমতঃ, সমাজের ক্ষুদ্রতম শ্রেণীকে উচ্চতম আসন থেকে নিশ্চিহ্ন করতে হয়। এই ক্ষুদ্রতম শ্রেণীই শাসক ও শোষক, সমস্ত শক্তি, সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যের একচেটিয়া মালিক। এই শ্রেণীর, অর্থাৎ জমিদার, তালুকদার, পুঁজিপতি ও কুলাকশ্রেণীর বিলুপ্তি সর্ব্বাগ্রে

৬ N. Mikhaylov : Soviet Geography (2nd Ed. 1937) : Pp. 199-201
J. F. Horrabin & James S. Gregory : An Atlas of the U.S.S.R. (Vol. 1).

প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজন। কারণ নূতন সমাজ-ব্যবস্থায় তারাই হবে বৃহত্তম ও সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী শ্রেণী। তৃতীয়তঃ, সমাজের প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন বৃহত্তম কৃষকশ্রেণীকে মাটির মায়া, কুসংস্কার, গোঁড়ামি, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও ভীরুতার বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে সংঘবদ্ধ, সচেতন, জড়ত্বজয়ী এক নূতন শ্রেণীতে রূপান্তরিত করতে হবে। পুরাতন জমিদার, পুঁজিপতি ও কুলাকশ্রেণীর ধ্বংস (Destruction), শ্রমিকশ্রেণীর গঠন (Construction) এবং কৃষক-শ্রেণীর রূপান্তর (Transformation)—এই তিনটি কাজ বিপ্লবীদের একসঙ্গে সুসম্পন্ন করতে হয়েছে। এইভাবেই নূতন সমাজের বৈপ্লবিক শ্রেণী-রূপান্তর সম্ভব হয়েছে।

পুরাতন জমিদার, পুঁজিপতি ও কুলাকশ্রেণীকে ধ্বংস করার জন্যে দেশের সমস্ত জমি, কলকারখানা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ক'রে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে আনতে হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর গঠন ও শক্তি বৃদ্ধির জন্যে রাষ্ট্রের অভিভাবকত্বে সুদূরপ্রসারী শিল্পায়নের পরিকল্পনা করতে হয়েছে। এই পরিকল্পনার মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যান্ত্রিক সমবায় কৃষি-প্রথার প্রবর্ত্তন ক'রে ধীরে ধীরে কৃষকশ্রেণীকে রূপান্তরিত করতে হয়েছে। এইভাবে প্রচণ্ড বাধা-বিপত্তির ভিতর দিয়ে, ধীর স্থির বিজ্ঞানীর দৃষ্টি ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে বল্‌শেভিকদের নূতন সমাজ গঠনের পথে অগ্রসর হ'তে হয়েছে। বিপ্লবের পূর্ব্বে যেসব দেশ জারের শোষণ-কেন্দ্র ও কাঁচামাল সরবরাহের ঘাঁটি ছিল, সেই সব দেশের শিল্পায়ন ও সামাজিক প্রগতির দিকে বল্‌শেভিকরা বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। বল্‌শেভিকদের এই নীতি সাম্রাজ্যবাদী নীতির ঠিক বিপরীত। এই নীতির জন্যেই সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত যে-কোন রিপাব্‌লিকের সঙ্গে সমান তালে পা

ফেলে মধ্য এশিয়ার রিপাব্লিকগুলির অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। এই কারণেই সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে শ্রেণী-রূপান্তরের তুলনায় মধ্য এশিয়ার মধ্য-যুগীয় শ্রেণী-বিন্যাসের রূপান্তরও কম বৈপ্লবিক নয়।

প্রাক্-বৈপ্লবিক যুগের (১৯১৩ সালের হিসাবে) শতকরা তিনজনের উপর জমিদার ও ধনিকশ্রেণী এবং শতকরা ১২ জনের উপর কুলাকশ্রেণী বিপ্লবোত্তর যুগের ১৯৩৯ সালে দেখতে পাই, একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তাদের স্থান শূন্য। ১৯১৩ সালের শতকরা মাত্র ১৬ জনের কিছু বেশী শ্রমিকশ্রেণী ১৯৩৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হ'ল শতকরা ৪৯ জনেরও বেশী, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার অর্দ্ধেকই প্রায় হয়ে গেল শ্রমিকশ্রেণী। ১৯১৩ সালে শতকরা ৬৫ জন ছিল চাষী ও কারিগর, যারা নিজেরা চাষ-বাস ক'রে খেত। এই গোঁড়া, অশিক্ষিত, ধর্ম্মভীরু শ্রেণীকে সমবায় আন্দোলনের ভিতর দিয়ে সম্পূর্ণ নূতন এক শ্রেণীতে রূপান্তরিত করা হ'ল,[৭] এবং এদের সংখ্যা ক'মে গিয়ে ১৯৩৯ সালে হ'ল শতকরা ৪৬ জনের কিছু বেশী।

শ্রেণী-বিন্যাস	১৯১৩	১৯৩৯
জমিদার, পুঁজিপতি ও ব্যবসাদার শ্রেণী	৩·৬·/.	•
ধনিক কৃষক বা কুলাকশ্রেণী	১২·৩·/.	•

৭ কৃষক ও কারিগরেরা আগে নিজেদের ভিটে আঁকড়ে পড়ে থাকত। অধিকাংশ ছিল ক্ষেতমজুর বা ভাগচাষী, তাদের নিজেদের জমি বলতে কিছু ছিল না। কারও সামান্য একটু জমি থাকলে নিজেই তাতে চাষ ক'রে খেত। ব্যক্তিগত জীবন, ব্যক্তিগত স্বার্থ বা মঙ্গল-অমঙ্গলের তারা কিছুই চিন্তা করতে পারত না। সমবায় জীবন অথবা যে কোন পরিবর্ত্তনের তারা বিরোধী ছিল। ক্ষুদে কারিগররাও ঠিক তেমনি ছিল। বিপ্লবের পর সমবায় কৃষি প্রতিষ্ঠান ও কো-অপারেটিভে সংঘবদ্ধ হয়ে এই শ্রেণী এক নূতন শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়।

শ্রেণী-বিন্যাস	১৯১৩	১৯৩৯
শ্রমিক ও কর্ম্মচারী শ্রেণী	১৬·৭·/.	৪৯·৭./·
কৃষক ও ক্ষুদে কারিগর শ্রেণী	৬৫·/.	২·৬./·
ছাত্র, সৈনিক ও অন্যান্য শ্রেণী	২·৪·/.	প্রায় ৩·/.
সমবায়জীবী কৃষক ও কারিগর	০	৪৬·৯,/·

১৯১৩ ও ১৯৩৯ সালের সমাজের শ্রেণী-বিন্যাসের তালিকা দু'টি পাশাপাশি দেখলে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাবে, বিপ্লবোত্তর কালের সামাজিক রূপান্তর সত্যিই কতখানি ব্যাপক ও গভীর। অর্থনৈতিক শ্রেণী-কাঠামোর আমূল পরিবর্ত্তন ভিন্ন অন্য কোন ক্ষেত্রেই পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়। পুরাতন প্রাণহীন জীর্ণ শ্রেণী-কাঠামোকে বদ্‌লে সম্পূর্ণ নূতন আর একটি শ্রেণী-কাঠামো তৈরী করা হ'ল। এই অর্থনৈতিক শ্রেণী-রূপান্তরের পাকা বনিয়াদের উপরেই রাষ্ট্রিক ও নৈতিক রূপান্তর, অর্থাৎ নূতন সমাজ ও সভ্যতার ইমারৎ গঠন করা সম্ভব।

রাষ্ট্রিক রূপান্তর

রাষ্ট্র ও শ্রেণী-সমাজের আবির্ভাব হয় এক সময়েই। আদিম সাম্যবাদী সমাজে যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা মালিকানা ব'লে কিছু ছিল না, সকলে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে জীবন যাপন করত, জীবিকা উৎপাদনের উপর কারও একচেটিয়া অধিকার ছিল না, তখন এই রাষ্ট্র-যন্ত্রের উৎপত্তি হয়নি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মালিকানার আবির্ভাবের সঙ্গে মুষ্টিমেয় একশ্রেণীর প্রভুত্ব ও কর্ত্তৃত্বের সমস্যা দেখা দেয়, এবং 'রাষ্ট্র' গঠন ক'রে সেই সমস্যার সমাধান করা হয়। তাই আমরা মানবসভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে দাস-যুগ থেকে সামন্তযুগ ও ধনতান্ত্রিক যুগের (সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিজমের বিকাশ পর্য্যন্ত) মধ্যেই এই রাষ্ট্র-যন্ত্রটি ক্রমেই বিকটাকার ধারণ করছে

দেখতে পাই। বিপ্লবীদের সর্ব্বপ্রথম এই শ্রেণী-রাষ্ট্রের স্বরূপ পরিবর্ত্তন করতে হয় এবং এই পরিবর্ত্তন অর্থনৈতিক শ্রেণী-রূপান্তরের দ্বারাই সাধিত হয়। মুষ্টিমেয় জমিদার ও ধনিক শ্রেণীর মধ্যে সমস্ত অর্থনৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত না ক'রে, নূতন শক্তিশালী বর্দ্ধিষ্ণু শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষক-শ্রেণীকে সেই শক্তির উৎসে রূপান্তরিত করা হ'ল। প্রশ্ন হ'তে পারে, এই 'রাষ্ট্র-যন্ত্রটি' (State-machine) রইল কেন, শ্রেণীহীন সমাজ রাষ্ট্রহীন হ'ল না কেন? কারণ শ্রেণীহীন বা রাষ্ট্রহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা রাতারাতি জাদুবলে সম্ভব নয়। নূতন যে-শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা এল, অর্থাৎ শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণী, তাদের দায়িত্ব অনেক। প্রথমতঃ, দেশের ভিতরে ও বাইরের পৃথিবীর বৃহত্তর অংশে তাদের শত্রুর অভাব নেই, শত্রুর শক্তি সামর্থ্যও যথেষ্ট। তাই তাদের প্রথম ও প্রধান সমস্যা হ'ল নিজেদের ক্ষমতা রক্ষা করা এবং নিজেদের আত্মরক্ষার শক্তি ও অর্থনৈতিক সামর্থ্য বৃদ্ধি করা। তার জন্যে তাদের রাষ্ট্র-যন্ত্রের প্রয়োজন আছে। পূর্ব্বে যে 'রাষ্ট্র-যন্ত্র' মুষ্টিমেয় এক শ্রেণীর স্বার্থে, কেবল শোষণ, শাসন ও পীড়নের জন্যেই ব্যবহার করা হ'ত, সেই 'রাষ্ট্র-যন্ত্র' এইবার বৃহত্তম শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর স্বার্থে, সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও উন্নতির উদ্দেশ্যে, যাবতীয় শ্রেণী-শোষণ ও পীড়নের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে। লেনিন অতি সুন্দরভাবে এই কথাই 'রাষ্ট্র' সম্বন্ধে বলেছেন। লেনিন বলেছেন: "এই যন্ত্র ও হাতিয়ারের সাহায্যে আমরা যাবতীয় শোষণ-ব্যবস্থা ধ্বংস করব। যখন পৃথিবীতে কোথাও আর এই শোষণের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত থাকবে না, যখন আর জমির ও কলকারখানার ধনিক মালিক ব'লে কেউ থাকবে না, এবং যখন আর অসংখ্য বুভুক্ষুদের বুকের উপর ব'সে মুষ্টিমেয় ভোজন-বিলাসীর উল্লাসের কোন আশা থাকবে না—একমাত্র তখনই আমরা এই রাষ্ট্র-যন্ত্রকে আবর্জ্জনা স্তূপে নিক্ষেপ করব।

তখন আর কোন রাষ্ট্রও থাকবে না, শোষণও থাকবে না। এই হ'ল আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ।”[৮]

পুরাতন রুশ সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর নূতন “সোভিয়েট সমাজ-তান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র-সংঘ” (Union of Soviet Socialist Republics) গ'ড়ে উঠল। স্বাতন্ত্র্য ও সমানাধিকারের ভিত্তির উপর বর্ত্তমানে এই কেন্দ্রীয় সংঘ ষোলটি প্রজাতন্ত্র (Republics) নিয়ে গঠিত। এই ষোলটি প্রজাতন্ত্রের মধ্যে তাজিক প্রজাতন্ত্র (Tadjik S. S. R.), উজ্‌বেক প্রজাতন্ত্র (Uzbek S S R), তুর্কমেন্‌ প্রজাতন্ত্র (Turkmen S S R), কির্‌গিজ প্রজাতন্ত্র (Kirgiz S S R), কাজাক প্রজাতন্ত্র (Kazak S S R) হ'ল সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের (Union Republic) অন্তর্গত ‘স্বায়ত্ত প্রজাতন্ত্র’ (Autonomous Republics) এবং স্বতন্ত্র জাতীয় জিলা (Autonomous Regions) ও উপজাতীয় জিলা (National Regions) আছে। যেমন উজ্‌বেকিস্তানের মধ্যে কারাকাল্‌পাকদের একটি “স্বায়ত্ত প্রজাতন্ত্র” আছে, তাজিকিস্তানে একটি স্বতন্ত্র গোর্ণো-বাদাক্‌শান জাতীয় জিলা আছে, এবং রুশ সোভিয়েটের মধ্যে প্রায় ১৬টি জাতি-উপজাতির স্বায়ত্ত জিলা আছে। গোটা সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে প্রায় ১৪টি “উপজাতীয় জিলা” আছে যার প্রত্যেকটির লোকসংখ্যা একলক্ষ মাত্র, এবং এ-ছাড়া আরও ১০০টি জিলা আছে যার লোকসংখ্যা আরও কম। এইসব জাতি-উপজাতি ও মানবগোষ্ঠী নিয়ে (প্রায় দুই শতের কাছাকাছি) বিরাট এক সোভিয়েট মহাজাতি গঠিত হয়েছে। কারও উপর কারও কর্ত্তৃত্ব করার কোন অধিকার নেই, নূতন রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে কর্ত্তৃত্ব

৮ V. I. Lenin : Selected Works, Vol. IX (Lawrence & Wishart Ltd, 1948 Edition) Pp. 656-'57.

করার সুযোগও নেই। প্রথমতঃ কেন্দ্রে সাধারণ জনগণের একটি প্রতিনিধি সভা (Council of Union) আছে। এই সভায় সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে প্রতি তিন লক্ষ ভোটদাতা একজন ক'রে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করতে পারে। এতে অবশ্য বড় বড় প্রজাতন্ত্র ও বড় বড় জাতিগুলির কর্ত্তৃত্ব করার সুযোগ আছে, কারণ সোভিয়েট ইউনিয়নের মোট প্রায় ১৯ কোটি ৩০ লক্ষ লোকের মধ্যে শতকরা ৬৪ জন থাকে রুশ প্রজাতন্ত্রে, শতকরা ২১ জন থাকে উক্রেইনে, শতকরা ৫ জন থাকে ট্রান্স-ককেশিয়ায়, আর শতকরা ১০ জন থাকে মধ্য এশিয়ায়। প্রতিনিধি সভায় রুশদের সংখ্যাধিক্য হওয়াই স্বাভাবিক এবং তারা ইচ্ছা করলেই অন্যদের উপর কর্ত্তৃত্ব করতে পারে। এইজন্যে আর একটি জাতীয় প্রতিনিধি-সভা গঠন ক'রে অন্যান্য সংখ্যাল্প জাতি-উপজাতির মন থেকে এই সংশয় একেবারে নির্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে। এই জাতীয় প্রতিনিধি-সভায় প্রত্যেক সোভিয়েট "প্রজাতন্ত্র" (Union Republic) ২৫টি, প্রত্যেক "স্বায়ত্ত প্রজাতন্ত্র" (A S S R) ১১টি, প্রত্যেক "জাতীয় জিলা" (A R) ৫টি এবং প্রত্যেক "উপজাতীয় জিলা" (N R) ১টি ক'রে প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে। দুই প্রতিনিধি-সভার ক্ষমতা সমান। দুই সভার অনুমোদন ভিন্ন কোন প্রস্তাবই গৃহীত হয় না। ছোট ছোট জাতি-উপজাতির নিজস্ব প্রতিনিধিরাও এখানে রইল তাদের নিজেদের সমস্যা ও দাবীর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে। কেউ বলতে পারবে না যে তার কথা জানাবার মতো কেউ নেই সুপ্রীম সোভিয়েটে, তা সে যত ক্ষুদ্র উপজাতিই হ'ক না কেন।

জাতি-উপজাতির সমানাধিকারের দিক থেকে নূতন সোভিয়েট রাষ্ট্রের কাঠামো এইভাবে গঠন করা হ'ল। এ-কাঠামোর ভিত্তি হ'ল সোভিয়েট জনসাধারণ। যান্ত্রিক শিল্পায়ন ও সমবায় কৃষি-প্রথার দ্রুত প্রগতির ফলে

নূতন সোভিয়েট সমাজে যে বিরাট শ্রেণী-রূপান্তর ঘটল তাতে পুরাতন জমিদার, জায়গীরদার, মহাজন, পুঁজিদার শ্রেণী ধ্বংস হয়ে গেল, বর্দ্ধিষ্ণু শ্রমজীবী শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল। কলকারখানার মজুর ও নূতন সমবায় চাষীদের নিয়ে যে বিরাট শ্রমজীবী শ্রেণী গ'ড়ে উঠল সোভিয়েট দেশে, সেই শ্রমজীবীরা হ'ল সোভিয়েটের রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তির সর্ব্বপ্রধান উৎস। এই সব মজুর ও চাষীদের অসংখ্য ছোট ছোট 'সোভিয়েট' (আমাদের দেশের পঞ্চায়েতের মতো কতকটা) সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তির কোষকেন্দ্র বলা চলে। শক্তির প্রবাহ বিদ্যুৎ-প্রবাহের মতো এই সব 'সোবিয়ৎ' থেকে স্থানীয় ও জিলা সোভিয়েট, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় কৃষিপ্রতিষ্ঠান, কো-অপারেটিভ্, উপজাতীয় জিলা, জাতীয় জিলা, স্বায়ত্ত প্রজাতন্ত্র, সঙ্ঘ-প্রজাতন্ত্রের ভিতর দিয়ে সঞ্চালিত হয়ে সঙ্ঘকেন্দ্রে পৌঁছায় এবং ঠিক তেমনিভাবে সেখান থেকে রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ ও নির্দ্দেশাবলীর ধারায় আবার তরঙ্গায়িত হয়ে নেমে আসে শক্তি-উৎসে, অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে। রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে এই যে শক্তি-প্রবাহ, এই যে প্রাণ-প্রবাহ, এ আর পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এমনভাবে দেখা যায় না। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রনীতির মধ্যে এই শক্তি-সৃষ্টি ও নিরবচ্ছিন্ন প্রাণ-প্রবাহের কোন বিধিব্যবস্থাই নেই। দেশের জনসাধারণ সেখানে অচল, অসাড়, উদাসীন ও প্রাণহীন। তাদের মাথার উপরে স্বপ্রতিষ্ঠ অথবা বিদেশী প্রভু মনোনীত দেশী নেতৃবৃন্দ, তার উপরে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা-পরিষদ এবং সবার উপরে চরম সত্য হিসাবে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী গবর্ণমেন্ট, যেমন বৃটিশ গবর্ণমেন্ট, বিরাজ করছেন। এই ব্যবস্থার মধ্যে তলার দিকে শক্তিসঞ্চয় বা শক্তিসৃষ্টির কোন সুযোগ নেই, তলা থেকে উপরের দিকে শক্তিসঞ্চালনের কোন উপায় নেই। মুষলের মতো রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধের ধারা উপর

থেকে নীচের দিকে মুষলধারে নেমে আসে। সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতির মধ্যে পার্থক্য এইখানে।[৯]

বৃটিশ অফিসার মিঃ জোন্স যখন ভোভাকে বলেছিলেন: "তোমাদের অনেক কাজকর্ম্মের মধ্যে এখনও যথেষ্ট ত্রুটি আছে, রাষ্ট্র-পরিচালনা এবং সমাজ গঠনের কাজ এখনও তোমরা আমাদের মতো নিখুঁতভাবে করতে পার না—" তখন ভোভা তার উত্তরে বলেছিল: "ঠিক বলেছ জোন্স সাহেব! বৃটিশ ব্যবস্থা ও সোভিয়েট ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য আছে: আমরা ভাল কাজ হয়ত একটু খারাপভাবে করি, আর তোমরা অতি জঘন্য কাজ অত্যন্ত নিখুঁতভাবে করো। জীবনের উচ্চতর স্তরে আমাদের স্থান, হ'তে পারে আমাদের ব্যক্তিগত বিকাশ আজও পূর্ণ হয়নি; আর জীবনের নিম্নতম স্তরে তোমরা পূর্ণতা লাভ করেছ। আমরা শিশু হ'লেও মানবশিশু, আর তোমরা হ'লে বয়স্ক শিম্পাঞ্জী!"[১০]

"We are the human infant, you the adult Chimpangee"—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর প্রশ্নের সোভিয়েট নাগরিক ভোভার এই উত্তর অনেকদিন আগেকার। আজকে হ'লে ভোভা নিশ্চয়ই বলত: "আমরা হলাম যৌবনের শক্তিতে পরিপূর্ণ মানব-সন্তান আর তোমরা হ'লে বুড়ো, ঝুনো শিম্পাঞ্জী!"

---

৯ Leonard Barnes: Soviet Light on the Colonies: Ibid

১০ Leonard Barnes: Op. Cit.

ফসলের ফরমান্

'হায় আল্লা!'

মোল্লা-ইমাম্‌রা হাঁই তুলে পাশ ফিরে শু'ল বিছানায়। বিছানা ছেড়ে ধড়ফড় ক'রে উঠে বসল ঘুমন্ত বে'। তার নাড়ী ধ'রে টান মেরেছে বেআদব বিপ্লবীরা। এমন বেআইনী ব্যাপার আমীরের আমলে কখনও ঘটেনি। মধ্য এশিয়ার ভূমির মালিক সে আজ থেকে নয়। পুরুষানুক্রমে সে এই ভূমির স্বত্ব ভোগ ক'রে আসছে। আজ পর্য্যন্ত কেউ তাকে এই স্বত্ব থেকে বঞ্চিত করতে চায়নি। বে' দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল। তার ভূসম্পত্তির মায়া এইবার তাকে ত্যাগ করতেই হবে। কমিউনিস্টরা ভূস্বামীদের ভূসম্পত্তি, ধনসম্পত্তি, মায় গরু-ছাগল-ভেড়া-ঘোড়া পর্য্যন্ত যাকিছু আছে সমস্ত বাজেয়াপ্ত করবে ঠিক করেছে। ভূস্বামীদের সাইবেরিয়ার কোন নিভৃত অঞ্চলে দ্বীপান্তর দেওয়া হবে এবং সেখানে গতর খাটিয়ে তাঁদের জীবিকা অর্জ্জন করতে হবে। এইসব বাজেয়াপ্ত

সম্পত্তি নিয়ে নূতন সমবায় কৃষিপ্রতিষ্ঠানের কাজ আরম্ভ হবে। সেই সমবায় কৃষিপ্রতিষ্ঠানে গ্রামের সমস্ত গরীব কৃষাণ দলবদ্ধ হয়ে চাষবাস ক'রে সুখেস্বচ্ছন্দে থাকবে। সোভিয়েট রাষ্ট্র তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ, যন্ত্র, হাতিয়ার ও অন্যান্য চাষের বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করবে। এই নূতন আদর্শ ও নীতির স্তুতিগান করতে করতে চলেছে তরুণ কমিউনিস্ট কর্ম্মীরা ভোরবেলা। দুশ্চিন্তায় মুশ্ড়ে পড়ল বে'।

হায় মোল্লা!

জাগল কৃষাণ। জীর্ণ কুঁড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল বাইরে। গান গাইতে গাইতে চলেছে তরুণ কমিউনিস্টরা। সমবায় চাষের গান, যন্ত্রের গান, ট্র্যাক্টরের গান, মোল্লা বে'দের গোরস্তান-যাত্রার গান। ভয় পেল এশিয়ার কৃষাণ। নূতন জীবনের গান এর আগে তো কেউ গায়নি। এ-গান শুনতে তো সে অভ্যস্ত নয়! কিছু নেই তার, তবু তো ঐ হেলে-পড়া কুঁড়ে, ঐ পূর্ব্বপুরুষের ভিটে, ঐ পাঁজর-বার-করা ঘোড়া আর গরু, ঐ ভোঁতা লাঙ্গল-কাস্তে সবই তাকে ত্যাগ করতে হবে। সব চাইতে বড়ো কথা, পুরাতন জীবনযাত্রার লৌহবাঁধন তাকে ছিঁড়তে হবে। চিরদিনের স্বভাব-শৈথিল্য, চিরদিনের কুসংস্কারের দাসত্ব তাকে ছাড়তে হবে। নূতন কর্ম্মময় জীবনের আহ্বানে তাকে সাড়া দিতে হবে। মধ্য এশিয়ার কৃষাণের পক্ষে এই ত্যাগ স্বীকার করা এবং নূতনের ডাকে সাড়া দেওয়া খুব সহজ নয়। তবু তারা মন দিয়ে গান শোনে। ভয় পেলেও মনে মনে তারা অভিনন্দন জানায় তরুণ অভিযাত্রীদের। বৃদ্ধ কৃষাণ কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এসে তরুণ বিপ্লবীর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, "আল্লা তোমাদের মঙ্গল করুন! তোমরা হ'লে নূতন যুগের মুয়াজ্জীনের দল! আজান হাঁকো, আজান হাঁকো!"

নগর ও গ্রামের মধ্যে যে-ব্যবধান, সেই ব্যবধান দূর করাই হ'ল নূতন

সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার আদর্শ। সাম্যবাদ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে লেনিন বলেছিলেন, "Electrification plus the Soviets"—"বৈদ্যুতিক শক্তির প্রসার ও সোভিয়েট।" এ-কথার অর্থ হ'ল, গ্রাম ও নগরের মধ্যে যে বিরোধ বৈজ্ঞানিক যুগের ধনতান্ত্রিক সভ্যতার কলঙ্ক-স্বরূপ, সেই বিরোধ দূর ক'রে গ্রাম ও নগরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপন করা। আজও পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের "গ্রাম" হ'ল সেই প্রাগৈতিহাসিক নবোপলীয় (Neolithic) যুগের প্রতিমূর্ত্তি। আধুনিক বিজ্ঞানের কোন প্রভাব বা স্পর্শ সেখানে নেই, আধুনিক বৈজ্ঞানিক জীবনযাত্রার, সুযোগ-সুবিধার কোন প্রভাব বা চিহ্ন সেখানে নেই। প্রকৃতির আলো-বাতাস-জল-ফুল-ফলের মধ্যে সেই আদিম যুগের গ্রাম আজও উদাসীন বৈরাগীর মতো বেঁচে রয়েছে। বৃহত্তর জগৎ ও বৃহত্তর জীবনের প্রতি তার কোন আকর্ষণ নেই। পরিবর্ত্তন সে চায় না। কূপ-মণ্ডুকতাই তার স্বভাবধর্ম্ম। এই গ্রাম শোষণ ক'রেই নগরের প্রসার ও অগ্রগতি। নগর ও গ্রামের মধ্যে যে-বিরোধ তাকে নির্ব্বিবাদে ধনিক-শ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর বিরোধের সঙ্গে তুলনা করা যায়। গ্রামের অস্থিমজ্জা শুষে নগরের প্রতাপ-প্রতিপত্তি। গ্রামের দারিদ্র্যে নগরের বিলাসিতা। গ্রামের কূপমণ্ডুকতার জন্যেই নগরের পরিবর্ত্তনশীলতা, নগরের ব্যস্ততা ও চঞ্চলতা। গ্রামের জাদুবিদ্যা, তুকতাক্, ঝাড়ফুঁক্, কুসংস্কার ও অজ্ঞতার জন্যেই নগরের বৈজ্ঞানিক প্রগতি, সংস্কার-মুক্তি ও শিক্ষা। গ্রামের পর্ণকুটীরের জন্যেই নগরের-ইস্পাত কংক্রীটের ইমারৎ। গ্রামের ব্যক্তি-কেন্দ্রিক, বিচ্ছিন্ন ও সঙ্কীর্ণ জীবনযাত্রার জন্যেই নগরে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষের সম্মিলিত জীবনযাত্রা। জমিদার ও কৃষকের মধ্যে নানাস্তরের মধ্যস্বত্বভোগীরা গ্রামকে খণ্ডিত-বিখণ্ডিত করে ব'লেই নগরে পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে আর কোন মালিকশ্রেণী নেই এবং

একচেটিয়া মালিকানা ও সর্ব্বব্যাপী শিল্পায়নের দিকেই পুঁজিপতিদের লক্ষ্য।

নগর ও গ্রামের মধ্যে এই বহুশতাব্দীয় পুরাতন বিরোধ ও দ্বন্দ্ব একদিনে সমাধান করা যায় না, করা সহজও নয়। কিন্তু নূতন সভ্যতার গোড়াপত্তন করতে হ'লে এই বিরোধের মূল উপ্ড়ে ফেলা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। লেনিন তাই বলেছিলেন: "যতদিন ছোট ছোট জমিতে চাষ করার পুরাতন রীতি চালু থাকবে ততদিন দারিদ্র্যের কবল থেকে মুক্তি নেই। স্বাধীনভাবে মুক্ত জমিতে চাষবাস করলেও, যদি-না আমরা পুরাতন কৃষি-ব্যবস্থা বর্জ্জন করি, তাহ'লে আমাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। যদি কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতি করতে হয় তাহলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র ভূমিখণ্ড ও বিচ্ছিন্ন কৃষকদের আমাদের ধীরে ধীরে বৃহৎ সঙ্ঘবদ্ধ কৃষি-প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে হবে। যদি আমরা বাস্তবক্ষেত্রে কৃষকদের কাছে প্রমাণ করতে পারি যে একমাত্র সংঘবদ্ধভাবে, পরস্পর-সহযোগিতা ক'রে চাষবাস করলেই তাদের উন্নতি সম্ভব, যদি আমরা কৃষকদের এই সহযোগিতার পথে সহায়তা করতে পারি তাহ'লেই বৈপ্লবিক শ্রমিকশ্রেণী তাদের নীতির তাৎপর্য্য কৃষকদের বুঝাতে পারবে এবং কোটি কোটি কৃষক হবে শ্রমিকশ্রেণীর সহযাত্রী।"[১] তাই ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে বল্‌শেভিক পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেসে স্টালিন শ্রমশিল্পের উন্নতি এবং কৃষির অবনতির কথা উল্লেখ ক'রে বললেন: "এই সমস্যার সমাধান কি ভাবে সম্ভব? এর একমাত্র সমাধান হ'ল ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন কৃষি-কেন্দ্রগুলিকে বড় বড় সঙ্ঘবদ্ধ কৃষি-প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে হবে, নূতন উন্নত

১ V. I. Lenin : Selected Works (Eng. Ed.) Vol. VIII, Pp. 195-198
V. I. Lenin ; Selected Works (Eng. Ed.) Vol VI. P. 370
V. I. Lenin ; Selected Works (Eng. Ed.) Vol. IX. P. 151

প্রণালীতে সমবায় কৃষি-প্রথার প্রবর্ত্তন করতে হবে। এ-কাজ আমাদের ধীরে সুস্থে নিশ্চয়ই করতে হবে। জোর ক'রে ভয় দেখিয়ে হুমকি দিয়ে নয়, ধৈর্য ধ'রে কৃষকদের বুঝিয়ে, অনুরোধ ক'রে, তাদের সামনে দৃষ্টান্ত তুলে ধ'রে আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে এই সব বিচ্ছিন্ন কৃষকদের, সমবায় কৃষি-প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্যে উৎসাহিত করতে হবে এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষের উপকারিতা কি তাও বুঝিয়ে দিতে হবে। এ-ছাড়া এ-সমস্যা সমাধানের আর দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই।"[২] ১৯২৭ সালে সিদ্ধান্ত করা হ'ল যে সমবায় কৃষি-প্রথা প্রবর্ত্তনের কাজ সুরু করা হবে ধীরে সুস্থে। কুলাক ও বে'দের প্রভাব-প্রতিপত্তি যাতে না বাড়ে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হবে।

এই সিদ্ধান্তকে কার্য্যে পরিণত করার আহ্বান এল। মধ্য এশিয়ার জমি ও জল-সংক্রান্ত ব্যবস্থার (Land and Water Reform) সংস্কার করা হ'ল। চাষের উপযুক্ত জমির অভাবই হ'ল মধ্য এশিয়ার প্রধান সমস্যা। জলের নিদারুণ অভাব। চারিদিকে মরুভূমি, প্রান্তর ও পাহাড়। জল এখানে সোনার চাইতেও মূল্যবান। জলের মালিকানা পুরুষানুক্রমে এক এক জাতি ভোগ ক'রে আসছে। নদীর বা খালের এক-এক অংশের মালিক এক-এক জাতি, এক-এক গোষ্ঠী। বিয়ের কনে' জলের পণ দিয়ে কিনতে হয়। জলই জীবন, জলই এখানে একমাত্র সম্পদ। এই জল সরবরাহের কোন সুব্যবস্থা মধ্য এশিয়ায় ছিল না। জলের অভাব দূর করার জন্যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে জলসেচনের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। জলসেচনের অব্যবস্থার জন্যে বড় বড় ভূখণ্ড বন্ধ্যা হয়ে প'ড়ে

---

২ Short History of the Communist Party of the Soviet Union (Bolsheviks) ; Edited by a Commission of the C. C. of the C.P.S.U. (B) : Moscow 1943—Pp. 288.

রয়েছে। চাষের উন্নতি হয় না, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফসলও ফলে না। বিরাট বিরাট ভূখণ্ডের মালিক বে'রা এ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। প্রথমে তাই বে'দের কবল থেকে জমি ছিনিয়ে নিয়ে নিঃস্ব কৃষকদের মধ্যে বণ্টন ক'রে দেওয়া দরকার। সঙ্গে সঙ্গে জলের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সকলে যাতে জল পায় এবং প্রচুর জল পায় তার ব্যবস্থা না করলে চাষের কোন উন্নতি করাই সম্ভব নয়। প্রথমে মধ্য এশিয়ায় তাই জল ও জমি সংস্কারের আন্দোলন আরম্ভ হ'ল।

পোস্টার ও পুস্তিকায় ছেয়ে গেল চারিদিক। পোস্টারে ছবি এঁকে সমবায় আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল। একদিকে কৃষকেরা বিচ্ছিন্নভাবে পুরানো লাঙ্গল-কাস্তে আর শীর্ণ ঘোড়া নিয়ে চাষ করছে। তাতে ভাল ফসল ফলছে না, তাদের পেট ভরছে না। দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে তারা অসহায়ের মতো মরছে। দেনার দায়ে তাদের সামান্য ভিটেমাটি বিকিয়ে যাচ্ছে। দুশ্চিন্তায় মাথা হেঁট ক'রে ব'সে আছে কৃষক। জমির সীমানা নিয়ে, জলের অধিকার নিয়ে এক কৃষক পরিবারের সঙ্গে আর এক কৃষক পরিবারের ঝগড়া মারামারি, এমন কি খুনোখুনি পর্য্যন্ত লেগেই আছে। এই হ'ল পোস্টারের একদিকের ছবির অর্থ। আর একদিকে কৃষকেরা দলবদ্ধ হয়ে সমবায় কৃষি-প্রতিষ্ঠান গঠন ক'রে, নূতন ট্র্যাক্টর ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে চাষ করছে। তাতে প্রচুর ফসল ফলছে, তাদের অভাব মিটছে। সমবায় প্রতিষ্ঠানের হাসপাতাল, ক্লিনিক, নার্সারিতে তাদের রোগব্যাধির চিকিৎসা করা হ'চ্ছে, শিশুদের লালন-পালন করা হ'চ্ছে। সীমানা নিয়ে, স্বত্ব নিয়ে ঝগড়া-দ্বন্দ্বের কোন সুযোগ নেই। আমোদ-প্রমোদের প্রচুর অবকাশ তাদের রয়েছে। গ্রামে শান্তি এসেছে, প্রাচুর্য্য এসেছে, রোগ-ব্যাধি-গুরা দূর হয়ে গিয়েছে। মহাজনের পর দুশ্চিন্তা নেই। বে'র বালাই নেই। তারা মুক্ত, তারা

স্বাধীন। দারিদ্র্য আর তাদের ত্রিসীমানায় আসছে না কোনদিন, এই হ'ল পোস্টারের আর একদিকের ছবির অর্থ। পোস্টারে পাশাপাশি এই দুই ছবি এঁকে চারিদিকে লটকে দেওয়া হয়েছে। গ্রামের পথে ঘাটে, সরাইখানার দেয়ালে, হাট-বাজারের দোকানে দোকানে, পর্ণকুটীরের দেয়ালে দেয়ালে, গাছের ডালে, ইঁদারার কোণে সর্ব্বত্রই এই পোস্টার ঝুলছে। চারিদিকের ইস্তাহার ঘোষণা করছে সমবায় কৃষির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা। তরুণ বক্তারা গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে, পায়ে হেটে, পোস্টার-সজ্জিত ট্রাকে চ'ড়ে। কখনও গ্রামের পুরানো মসজিদের পাশে, কখনও হাট-বাজারের ধারে, কখনও বা সরাই-খানা, চাখানার সামনে তারা দাঁড়াচ্ছে, পোস্টারের ছবি, ইস্তাহারের অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছে। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে এসে জমা হ'চ্ছে, অবাক হয়ে শুনছে তাদের কথা, অনর্গল প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করছে তাদের, টিপ্পনি কাটছে, বিদ্রূপ করছে আবার বাহবাও দিচ্ছে। দুঃখ-দারিদ্র্য ও নির্য্যাতনের ক্ষতচিহ্ন তাদের মুখে চোখে যেন খোদাই করা রয়েছে। আশার কথা, ভবিষ্যতের কথা শুনতে তাদের আর ভাল লাগে না। জীবনে কোনদিন সুদিন আসবে এ তারা বিশ্বাস করে না, দারিদ্র্য তাদের ঘুচে যাবে এ তারা কল্পনাও করে না। তাদের অভিশপ্ত জীবনের লিখন কেউ খণ্ডাতে পারে না, মোল্লা ব'লে দিয়েছে, তাই তারা বিশ্বাস করে। সে-বিশ্বাস তাদের টলাবে কে? কে এই ঘোর অদৃষ্টবাদীদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনবে? কে তাদের বুঝিয়ে দেবে যে এসব মিথ্যা, জঘন্য মিথ্যা, তাদের ভবিষ্যৎ তারা নিজেদের বাহুবলেই গ'ড়ে তুলতে পারে, তাদের দুঃখদারিদ্র্য তারা নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি দিয়ে দূর করতে পারে? অক্লান্ত, নির্ভীক কমিউনিস্টরাই একমাত্র এই অসাধ্য সাধন করতে পারে। হাজার হাজার পোস্টার, ইস্তাহার, পুস্তিকা নিয়ে, পোস্টারে

সাজানো ট্রাক্ নিয়ে, গানের দল, বাজ্‌নার দল, থিয়েটারের দল নিয়ে দলে দলে চলেছে তরুণ কর্ম্মীরা, গ্রাম থেকে গ্রামে, মেলা থেকে মেলায়, হাট থেকে হাটে, চাথানা থেকে চাথানায়। অক্লান্ত তাদের অভিযান।

হতভাগ্য বে'রা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। যখন তারা দেখল সমবায় আন্দোলনের অভিযান ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করছে, গ্রামে গ্রামে এই আন্দোলন কৃষাণদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করছে, গ্রামের পর গ্রামের কৃষাণরা এই আন্দোলনে যোগদান করছে, চারিদিকে নূতন নূতন সমবায় কৃষি-প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠছে, মধ্যএশিয়ার মাঠে মাঠে ট্র্যাক্‌টরের শব্দ শোনা যাচ্ছে, তখন তাদের ক্রোধের আর সীমা রইল না। কারণ তাদের দিন দ্রুতগতিতে শেষ হয়ে আসছে। সমবায় আন্দোলনকে ব্যর্থ করার জন্যে তারা নানাভাবে হীন ষড়যন্ত্র কবতে আরম্ভ করল। কৃষকদের অজ্ঞতা ও সঙ্কীর্ণতার সুযোগ নিয়ে তারা নানাভাবে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাদের উস্কানি দিতে লাগল। চারিদিকে তারা রটিয়ে দিল যে এইসব জমি ছিনিয়ে নিয়ে কমিউনিস্টরা নিজেরা জমিদার হয়ে বসবে, গবর্ণমেণ্টের লোকেরা নিজেরা ভোগ করবে, কৃষকদের ভাগ্যে কিছুই জুটবে না। তারা সব বলতে লাগল, এতদিন ধ'রে তারা এ-দেশের জমি ভোগ দখল ক'রে আছে, এতদিন ধ'রে বিপদে-আপদে দুঃখে-দারিদ্র্যে তারা গ্রামের সকলের সঙ্গে বাস ক'রে এসেছে, আর আজ তাদের জায়গা-জমি কেড়ে নিয়ে তাদের পথের ফকির ক'রে দেওয়া হ'চ্ছে—এমন অন্যায় অবিচার আল্লা কখনই সহ্য করবেন না। কৃষাণদের কানে কানে তারা মন্ত্রণা দিল : "বুঝলে মিঞা! এসব হ'ল কমিউনিস্টদের কারসাজি। তোমাদের মঙ্গল করার জন্যে ওদের তো আর ঘুম হ'চ্ছে না! আসলে ওরা জায়গা-জমি ছিনিয়ে নিয়ে নিজেরা ভোগ করবে, বুঝলে মিঞা! এতদিন ওরা

অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছে, এবার তাই ওরা বাদ্‌শাহ হবে ঠিক করেছে। ওদের ধাপ্পায় কান দিও না মিঞা!"

বে'র কথায় একেবারেই যে কেউ কর্ণপাত করল না তা নয়। অনেকেই বিশ্বাস করল তাদের কথা। কমিউনিস্ট প্রচারকদের কোথাও তারা তাড়া ক'রে গ্রামের বাইরে নিয়ে গেল, কোথাও দল বেঁধে তাদের আক্রমণ ক'রে খুন জখমও করল। বে'র মন্ত্রণায় কিছু কাজ হ'ল। কিন্তু অনেকেই বে'র কথায় কর্ণপাত করল না। দলে দলে তারা সমবায় কৃষি-প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে আরম্ভ করল। কৃষকদের একগুয়েমি, গোঁড়ামি এবং কোথাও কোথাও তাদের প্রকাশ্য বিরোধিতার সামনে কমিউনিস্টরা অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, মাথা হেঁট করল না, ধৈর্য্য হারাল না। দিনের পর দিন তারা অক্লান্ত ভাবে প্রচার করতে লাগল সমবায়ের কথা, সমবায় কৃষির সাফল্য ও প্রগতির কথা। বে'রা তখন প্রকাশ্য বিরোধিতা ছেড়ে দিয়ে, অন্য উপায়ে, কখন কখন সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের গুণগান করেও পর্য্যন্ত নিজেরা আত্মগোপন ক'রে থাকার চেষ্টা করল। ভবিষ্যতে যদি কখন সুযোগ আসে তাহ'লে তারা প্রকাশ্যে সংগ্রাম করবে এই সমবায়ের বিরুদ্ধে। এই আশায় তারা দিন গুণতে লাগল।

এদিকে মোল্লা-মৌলবীরা ক্ষেপে গেল। আল্লার বরপুত্ররা বিপ্লবীদের ম্লেচ্ছনীতি বরদাস্ত করবে না। তারা সকলে 'কোরআন' খুলে বসল। দিন রাত কোরআনের আয়াত খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে গেল। কোরআনের কোন্ ছুরা, কোরআনের কোন্ আয়াত এই ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি গ্রাসের বিরুদ্ধে, এই সমবায় আন্দোলনের বিরুদ্ধে আল্লার বাণী ব'লে প্রয়োগ করা যায়! কোন্ আয়াত আবৃত্তি ক'রে মসজিদের মিনার থেকে অজ্ঞ, ধর্ম্মান্ধ জনতাকে আহ্বান ক'রে বলা যায়: "যারা আজ এই সমবায় আন্দোলনের কথা বলছে, যারা আজ ম্লেচ্ছদের যন্ত্রপাতি এনে আমাদের পবিত্র বসুন্ধরার বুকে

চালাতে চাচ্ছে, যারা ধনিকদের, জমিদারদের, মহাজনদের ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তি ছিনিয়ে নিচ্ছে, তারা কাফের, তারা ইসলামের শত্রু। কাফেরের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা আল্লা ফর্‌জ্ করেছেন।" মোল্লা-মৌলবীদের এই হ'ল সমস্যা। বিচ্ছিন্নভাবে ও বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করলে কোরআনে এই ভাবার্থের আয়াতের অভাব নেই। মোল্লারা ক্ষিপ্ত হয়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন; "লা হু মা ফিচ্ছামাওয়াতে ওয়া মা ফিল্ আরদে"—"আকাশ পৃথিবীর যা কিছু সবই আল্লার!" সমস্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রের—কাফেরের উক্তি। মোল্লা আকাশ ফাটিয়ে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলেন—কোন্ রাষ্ট্র, কোথাকার রাষ্ট্র, কার রাষ্ট্র? আল্লার চাইতে রাষ্ট্র বড় হ'ল? এত বড় স্পর্দ্ধা কার যে রাষ্ট্রকে আল্লার চাইতেও বড় বলে? অপরের ধনসম্পত্তি গ্রাস করার অধিকার কারও নেই পৃথিবীতে। সব ধনসম্পত্তির মালিক আল্লা। যাকে যা দেবার তিনি দিয়েছেন। তিনি প্রভু-দাস, ধনিক-শ্রমিক, জমিদার-কৃষক সৃষ্টি করেছেন। যখন সময় হবে তখন আবার তিনিই তা কেড়ে নেবেন। আল্লার দান-করা সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কারও নেই। আল্লার চাইতে বড় কল্যাণকামী মানুষের আর কে আছে পৃথিবীতে? দুঃখ দারিদ্র্য আল্লাই দিয়েছেন, আবার আল্লা সুখ-শান্তিও দিয়েছেন। সকলের জন্যে আল্লা সব দেন নি। কার এতবড় স্পর্দ্ধা আছে যে আল্লার বিধান অমান্য ক'রে বলতে পারে, পৃথিবীতে সুখ-শান্তি সকলের জন্যে, দুঃখ-দারিদ্র্য কারও জন্যে নয়?[৩] হাদিস্-শরীফে বলা হয়েছে: "আদম সন্তানের মাত্র এইটুকুই অধিকার আছে যে, সে শুধু একখানি বাসোপযোগী ঘর পাবে, লজ্জা নিবারণের উপযোগী একখানা বস্ত্র পাবে আর কিছু পানি পাবে।"[৪] কমিউনিস্টরা

---

৩ গোলাম মোস্তফা: ইসলাম ও কমিউনিজম্: পৃ: ৮৪-৮৮
৪ মির্জ্জা সুলতান আহম্মদ: কোরআন শরীফ (সারানুবাদ)

বলছে তারা এই পৃথিবীতে বেহেশ্‌ত রচনা করবে, তারা সনাতন শরীয়তের বিধান পাল্টে দেবে। কমিউনিস্টরা কাফের।

শরীয়তের বিধান পাল্টে দেবে, আল্লার বাণী মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, এমন কথা কমিউনিস্টরা কোনদিন বলেনি। মন্দির-মসজিদ বা গির্জ্জার বিরুদ্ধে কালাপাহাড়ী অভিযান করা কমিউনিস্টদের নীতি নয়। মোল্ল'-মৌলবী-পাদ্‌রী-পুরোহিতরা যেমন তাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্লজ্জ অপব্যাখ্যা ও বিকৃত ব্যাখ্যা করতে কুণ্ঠিত হয় না, তেমনি কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারেও তাদের ক্লান্তি নেই। জনসাধারণের ধর্ম্মান্ধতার মূল কোথায় তা কমিউনিস্টরা জানে বলেই ধর্ম্মদ্রোহিতা কমিউনিস্টদের কর্ম্মনীতি নয়।[৫] কমিউনিস্টরা জানে সমাজের একশ্রেণীর প্রভুত্ব ও

[৫] গোলাম মোস্তফা পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের 'ইসলামের সহিত কমিউনিজমের পার্থক্য' শীর্ষক অধ্যায়ে কমিউনিস্টদের ধর্ম্ম ও নীতি-বিরোধিতা সম্বন্ধে লেনিনের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন উক্তির উদ্ধৃত ক'রে যে মতামত প্রচার করেছেন তা মারাত্মক ভুল। এ-সম্বন্ধে লেখক এবং তাঁর মতাবলম্বী ও ভুল ধারণার বশবর্ত্তী যাঁরা তাঁরা এই কয়েকটি গ্রন্থ পাঠ করতে পারেন।

(ক) V. I. Lenin: Selected Works. Vol XI (Lawrence and Wishart Ltd, 1943 Edition). Pp. 658-680.

(খ) Frederick Engels: Anti-Duhring (Lawrence & Wishart Ltd. 1943 Edition): Pp, 23, 32, 84, 102, 117, 120, 126, 145-6, 159, 201, 289, 346-8, 350.

(গ) Hewlett Johnson: The Socialist Sixth of the World (21st Imp. 1945): Pp. 357-368.

(ঘ) Sidney & Beatrice Webb: Soviet Communism: A New Civilisation (Third Edition in One Volume), Chap. XI, Pp 807-817.

(ঙ) Julius F. Hecker: Moscow Dialogues (1936 Ed): Dialogue XVI, Pp. 190-209; Dialogue XVII. Pp. 210-225.

শোষণের পালা শেষ হ'লে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য্যের দিন এলে, দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তা ও বিপদ-আপদের আশঙ্কা দূর হ'লে, ধীরে ধীরে জনসাধারণের কুসংস্কার, ধর্ম্মান্ধতা ও গোঁড়ামি কেটে যাবে। তাই কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে মোল্লা-মৌলবীদের এই অভিযোগ মিথ্যা অভিযোগ। তবু মিথ্যার বেসাতি করাই যেহেতু মোল্লার ধর্ম্ম, কোরআন-শরীফের বিকৃত ব্যাখ্যা করার জন্যেই যেহেতু মোল্লার মাহাত্ম্য, তাই মোল্লারা কমিউনিস্ট-বিরোধী কুৎসা-প্রচারে ক্লান্ত হ'ল না। দিনের পর দিন মোল্লারা হাটে-মাঠে-পথে-ঘাটে-মসজিদে-চাখানায় কমিউনিস্ট কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ্ ঘোষণা ক'রে চলল। কমিউনিস্টরাও তাদের পাশাপাশি তাদের নীতি, তাদের আদর্শের কথা প্রচার ক'রে চলল। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কোথাও কোন গ্রামের ধর্ম্মান্ধ জনসাধারণ মোল্লার উস্কানিতে জেহাদ ঘোষণা যে একেবারেই করে নি তাও নয়। কোথাও কোথাও মোল্লার মতো ক্ষিপ্ত হয়ে গ্রামের জনসাধারণ কমিউনিস্ট প্রচারকদের আক্রমণ করল। কোথাও কমিউনিস্ট কাফেরদের তারা গ্রামের গোয়াল ও গোলাঘরে বন্দী ক'রে পুড়িয়ে মারল, কোথাও তাদের হত্যা ক'রে মাঠের মধ্যে কবর দিয়ে দিল। এইভাবে শত শত কমিউনিস্টকে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হ'ল। তবু তারা ভয় পেল না, পিছিয়ে এল না, ধৈর্য্য হারাল না। আবার গান গেয়ে গেয়ে তারা গ্রামের পথে পথে ঘুরে বেড়াল, নূতন আদর্শের কথা আবার তারা ছবি দেখিয়ে, ইস্তাহার প'ড়ে, বক্তৃতা দিয়ে বুঝিয়ে দিলে। তাদের যদি প্রশ্ন করত কেউ, মোল্লার বিরুদ্ধে তোমরা লড়লে কি ক'রে? তাহ'লে তারা নিশ্চয়ই মহাকবি ইক্‌বালের ভাষায় সেদিন জবাব দিত—

"মৈঁ জান্‌তা হুঁ অঞ্জাম্ ওস্‌কা
জিস্ মার্ক্-এ মেঁ মুল্লা হো গাজী।" —ইক্‌বাল

"মোল্লা যে-পক্ষের যোদ্ধা তাদের পরিণাম কি তা আমি জানি।" অর্থাৎ তাদের পরিণাম সুনিশ্চিত পরাজয়। হায় মোল্লা! তোমার মতে কমিউনিস্টরা কাফের। কিন্তু তুমি কি জান না মোল্লা এ-কথা?

"কার্-এ কাফির ফি সবিল্-ইল্লাহ্ জিহাদ্
কার্-এ মুল্লা ফি সবিল্-ইল্লাহ্ ফসাদ্।"

—ইক্‌বাল

"কাফের যে সে নিঃস্বার্থভাবে তার ন্যায়যুদ্ধে আত্মবলি দেয়, কিন্তু মোল্লা, তুমি কেবল আল্লার নামে ফ্যাসাদই সৃষ্টি করো!"

কমিউনিস্টরা যে একেবারে ভুলচুক্ করেনি তা নয়। সমবায় আন্দোলনের সাফল্যের আনন্দে অনেকে কর্ত্তব্যজ্ঞান পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলল। পার্টির নীতির গভীর তাৎপর্য্যের কথা তারা ভুলে গেল। কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাবে ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে কৃষকদের যেন হুমকি দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে সমবায় প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে না বাধ্য করা হয়, অথবা তাদের সামান্য যা ব্যক্তিগত সম্পত্তি আছে, যেমন একখানা কুঁড়েঘর, একটা ঘোড়া, দু'একটা ছাগল-ভেড়া, লাঙ্গল-কাস্তে ইত্যাদি তা যেন প্রথমেই সমবায় প্রতিষ্ঠানের জন্যে কেড়ে নেওয়া না হয়। আন্দোলনের সাফল্যে উন্মত্ত হয়ে কমিউনিস্ট কর্ম্মীদের মধ্যে অনেকে এসব নির্দ্দেশের গুরুত্ব একেবারে ভুলে গেল। সাফল্যে অন্ধ হয়ে তারা শেষকালে অনিচ্ছুক কৃষকদের হুম্‌কি দিতে আরম্ভ করল। কোন-কোন সংগঠক ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে সামরিক সাহায্য নিয়ে কৃষকদের উপর বলপ্রয়োগ করতে পর্য্যন্ত দ্বিধা করল না। কেউ কেউ মাত্রা ছাড়িয়ে কৃষকদের ভয় দেখিয়ে বললে যে শুধু জমি-জায়গা-লাঙ্গল-কাস্তে নয়, স্ত্রী-পুত্র পর্য্যন্ত কেড়ে নেওয়া হবে—আন্দোলন সমর্থন

না করলে। এই সব অতি-উৎসাহী কাণ্ডজ্ঞানহীন "কমিউনিস্টদের" জন্তে বে-মোল্লাদের অপপ্রচারের সুবিধা হ'ল। তারা এইসব দৃষ্টান্ত দেখিয়ে কৃষকদের অতি সহজেই বুঝিয়ে দিল যে আসলে কমিউনিস্টরা কৃষাণ-শ্রমিকদের কল্যাণ চায় না, তারা নিজেরা সবকিছু আত্মসাৎ ক'রে নিয়ে ভোগ করতে চায়। বে-দের তর্ক করার সুবিধা হ'ল। তারা বলল: "প্রথমে আমাদের সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছে, আমরা নাকি প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক ব'লে। তখন ওরা বলেছিল যে এই সব জমি কৃষাণদের বিলিয়ে দেওয়া হবে। এখন তোমাদেরও যা-কিছু আছে, মায় ছাগল-ভেড়া পর্য্যন্ত, তাই ধ'রে টান মারছে। আবার বলছে যে স্ত্রী-পুত্র পর্য্যন্ত বাদ দেবে না। এইবার বুঝে দেখ ব্যাপারটা! তখনই বলেছিলাম—এইবার ঠ্যালা সামলাও!"

কাণ্ডজ্ঞানহীন একদল কমিউনিস্টদের এই মারাত্মক ভুলের জন্তে বে-দের প্রভাব-প্রতিপত্তি আবার বাড়তে লাগল। কৃষাণদের মধ্যে নৈরাশ্য দেখা দিল। সমবায় আন্দোলনের প্রগতি ভীষণভাবে ব্যাহত হ'ল। দেখা গেল ১৯২৯ সালে মধ্য এশিয়ায় শতকরা মাত্র সাড়ে তিনটি কৃষাণ পরিবার সমবায় কৃষি-প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছে। গোটা সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রগতির তুলনায় এই প্রগতি অত্যন্ত নগণ্য বলা চলে। এই ব্যর্থতার কারণ বুঝতে কমিউনিস্ট নেতাদের দেরী হ'ল না। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই সময় স্টালিন "Dizzy with Success" ('সাফল্যে মতিভ্রম') নাম দিয়ে একটি (২রা মার্চ্চ, ১৯৩০) প্রবন্ধ লেখেন*। এই প্রবন্ধে স্টালিন পার্টির প্রত্যেক কর্ম্মীকে আগ্রহের

* **Short History of the Communist Party of the Soviet Union (Bolsheviks) Moscow : 1943 : P.P. 307-310.**

আতিশয্য, কাণ্ডজ্ঞানহীনতা, অদূরদর্শিতা ও চরমপন্থী কার্যাকলাপ সম্বন্ধে সাবধান ক'রে দেন। কোন কোন সংগঠক ও কর্মীকে এই সময় এই মারাত্মক ভুল ও অপরাধের জন্যে পার্টি থেকে বিতাড়িত করা হয়। ঐ বৎসর ৩রা এপ্রিল আর একটি প্রবন্ধ লিখে—"Reply to Collective Farm Comrades"—স্টালিন সমবায় কৃষি-আন্দোলনের সংগঠক ও কর্মীদের ভুলত্রুটি বিশ্লেষণ ক'রে বুঝিয়ে দেন এবং ভবিষ্যতে যাতে এই ভুলের পুনরাবৃত্তি না হয় সে-সম্বন্ধেও সকলকে সাবধান ক'রে দেন।[৭]

স্টালিনের সাবধান-বাণী-সম্বলিত রচনা ও কেন্দ্রীয় কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত চারিদিকে প্রচারিত হবার পর কৃষাণদের মনে আবার আশার সঞ্চার হ'ল। মুষ্টিমেয় কয়েকজন কাণ্ডজ্ঞানহীন সংগঠক ও কর্মীর দুর্নীতি যে কমিউনিস্টদের নীতি নয় তা কৃষাণদের বুঝতে কষ্ট হ'ল না। এই সব কাণ্ডজ্ঞানহীন, চরম-পন্থী, উদ্‌ভ্রান্ত কর্মীদের প্রতি স্টালিনের সময়োপযোগী কঠোর সাবধান-বাণীতে কৃষাণদের মন থেকে সাবতীয় দ্বন্দ্ব ও সংশয় দূর হয়ে গেল। তারা বুঝতে পারল, সমবায় কৃষি-আন্দোলনের লক্ষ্য কি? সমবায় কৃষি-আন্দোলনের সুযোগ-সুবিধা কি? বে ও মোল্লাদের মনে আবার নৈরাশ্যের ঘনমেঘ জমল। তারা ভেবেছিল এই সুযোগে তারা বোধ হয় আবার তাদের লুপ্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। তারা ভেবেছিল, সমবায় আন্দোলনকে অঙ্কুরেই তারা ধ্বংস করতে পারবে। কিন্তু স্টালিন সকলকে নিরাশ ক'রে দিলেন।

এই সময় আর একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যার গুরুত্ব অত্যন্ত

---

৭ Short History of the C.P S.U (B) : Ibid.

বেশী। ১৯৩০ সালের ২৬শে জুন ষোড়শ পার্টি কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত করা হয় যে কুলাকশ্রেণীকে গ্রাম থেকে একেবারে নির্ম্মূল করতে হবে৮। ১৯২৯ সালের আগে পার্টি কুলাকশ্রেণীকে সংযত ও খর্ব্ব করার নীতি গ্রহণ করেছিল। কুলাকদের কাছ থেকে বেশী ট্যাক্স আদায় ক'রে, গবর্ণমেণ্টের কাছে তাদের উৎপন্ন খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রী করতে বাধ্য ক'রে, জমির আয়তন ও সীমানা নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিয়ে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি সঙ্কুচিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। যতদিন পর্য্যন্ত সমবায় ও রাষ্ট্রীয় কৃষি-আন্দোলন শক্তিশালী হয়নি, ততদিন পর্য্যন্ত এই ভাবেই কুলাকদের আধিপত্য যাতে না বাড়ে সেইদিকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছিল। তাদের একেবারে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। ১৯৩০ সালে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ'ল। স্টালিন বললেন: "এইবার থেকেই দেশব্যাপী সমস্ত ফ্রণ্টে সমাজতন্ত্রবাদের অপ্রতিহত অভিযান আরম্ভ হবে। কুলাকশ্রেণীকে নির্ম্মূল করা হবে এবং সমবায় কৃষি সুপ্রতিষ্ঠিত করা হবে।" এই সময় স্টালিন "বিরাট পরিবর্ত্তনের বৎসর" (A Year of Great Change) নাম দিয়ে এক প্রবন্ধ লেখেন এবং তাতে বলেন: "সোভিয়েট ইউনিয়নে ধনতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার যে-স্বপ্ন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি এতদিন ধ'রে দেখছিল, আজ তাদের সে-স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল। 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির' পবিত্র আদর্শ আজ আমাদের সোভিয়েট ভূমিতে অন্তর্দ্ধান করছে৯।"

বাস্তবিকই তাই। ১৯৩০ সালের এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত, বৈপ্লবিক গুরুত্বের দিক দিয়ে যাকে অক্টোবরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—

৮ Short History of the C.P.S.U (B) : Ibid.
৯ Short History of the C.P.S.U (B) : Ibid.

('equivalent in its consequences to the revolution of October 1917')[১০] —ধনিকশ্রেণীর, জমিদার ও মহাজনশ্রেণীর এবং তাদের পার্শ্বচরদের স্বপ্ন একেবারে ধূলিসাৎ ক'রে দিল। শুধু সোভিয়েট ইউনিয়নে নয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্র। এই সিদ্ধান্তের পর মধ্যএশিয়ার সংগঠক ও কর্ম্মীরা নূতন ক'রে অভিযানের জন্তে প্রস্তুত হতে আরম্ভ করল। তাদের সামনে বিরাট দায়িত্ব, অত্যন্ত কঠোর কর্ত্তব্য পালনের আহ্বান। পূর্ব্বের মারাত্মক ভুলত্রুটির কথা তারা ভুলে যায়নি। প্রথম থেকেই তারা সে-সম্বন্ধে সাবধান হ'ল। কৃষাণদের সামনে সমবায়-কৃষির ছবি তুলে ধরতে হবে। শুধু পোস্টারের ছবি নয়, বাস্তব ছবি। সমবায় কৃষি-প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকলাপ ও ক্রমোন্নতি তাদের ডেকে ডেকে দেখাতে হবে। তারা স্বচক্ষে দেখে, অনুপ্রাণিত হয়ে, স্বেচ্ছায় তাতে যোগদান করবে। তাদের উপর কোনরকম জোর-জুলুম করা চলবে না, হুমকি দেওয়া চলবে না, অকারণ কর্ত্তৃত্ব করা চলবে না। একথা ভুললে চলবে না যে কৃষাণরা মাটির আদি-অকৃত্রিম মানবসন্তান। তাদের স্বভাব যদি পরিবর্ত্তন-বিমুখ হয়, সন্দিগ্ধ বা কুসংস্কারগ্রস্ত হয়, তার জন্তে যুগ-যুগান্তের অন্যায় ও অসঙ্গত সমাজ-ব্যবস্থা দায়ী। তারা যদি ভয় পায়, তারা যদি সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থপর হয়, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সোনালি স্বপ্ন দেখতে যদি তারা অক্ষম হয়, তাহ'লে ভুললে চলবে না যে যুগ-যুগান্তের নিষ্ঠুর পীড়ন ও শোষণ, অশিক্ষা ও অজ্ঞতার অভিশাপ তার জন্তে দায়ী। মাটির কাছাকাছি তারা থাকে ব'লেই একমাত্র বাস্তব সত্যে তারা বিশ্বাস করে। তারা অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে শেখেনি কোনদিন। তাদের সামনে, তাদের চারিদিকে ছোট ছোট "ভবিষ্যতের আলোকস্তম্ভ" গঠন ক'রে বলতে হবে, এই হ'ল

১০ **Short History of the C.P.S.U(B) : Ibid.**

তোমাদের ভবিষ্যৎ, আর ঐ হ'ল তোমাদের বর্ত্তমান ও অতীত। তাহ'লেই তারা সুন্দর সুখ-শান্তি-স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের উপর অগাধ বিশ্বাস নিয়ে বর্ত্তমানের সংগ্রামে সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। একথা যেন পার্টির প্রত্যেক কর্ম্মী, প্রত্যেক সংগঠক, প্রত্যেক কমিউনিস্ট ও প্রকৃত বিপ্লবী মনে রাখেন। এই হ'ল পার্টির নির্দ্দেশ ও নীতি।

মধ্য এশিয়ায় এই নির্দ্দেশের মূল্য যে কতখানি তা বুঝতে কারও দেরী হ'ল না। কারণ মধ্য এশিয়ার কৃষাণরা ছ' হাজার বছর আগেকার নব্য-প্রস্তর যুগে বাস করে। যানবাহন বলতে তারা উট ও গাধাকেই চেনে-জানে। তারই পিঠে চ'ড়ে তারা গিরিপথ অতিক্রম করে, মরুভূমির বুকের উপর দিয়ে চ'লে ফিরে' বেড়ায়, হাটবাজার, পণ্য বেচাকেনা করে। চাষের জন্যে তাদের লাঙ্গল, ঘোড়া কিম্বা বলদই একমাত্র সম্বল, আর পুরানো কাস্তে-নিড়ানি। বিজ্‌লিবাতির আলো তারা জীবনে দেখেনি, কেরোসিনের ঘোলাটে ঝাপ্‌সা আলোয় তারা রাতের কাজকর্ম্ম করেছে। অনেকে তাও দেখেনি। শুক্‌নো পাতায় কিম্বা গাছের ডালে আদিম উপায়ে আগুন জ্বালিয়ে তারা আলোক ও উত্তাপের ক্ষুধা নিবৃত্তি করেছে। রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা কি জানে না তারা। তারা জানে ভূতে পায়, মৃত পূর্ব্বপুরুষদের প্রেতাত্মা অভিশাপ দেয়, প্রকৃতিদেবী প্রতিশোধ নেয়, এবং তার জন্যে ঝাড়ফুঁক করতে হয়, জাদুমন্ত্র বিড়্‌বিড়্ ক'রে বলতে হয়, অভিনয় করতে হয়, ভূতপ্রেতের দাবী মেটাতে হয়। এই হ'ল খাঁটি মধ্য এশিয়ার চাষী—তাজিক-উজ্‌বেক-কির্‌গিজ-তুর্কমেন্-কাজাক কৃষাণের স্বরূপ।

এই কৃষাণদের গ্রামের আশেপাশে 'কিবিৎকার' সামনে একদিন ঘর্ঘর শব্দে যন্ত্রদানব গর্জ্জন ক'রে উঠল। ভয়ে-বিস্ময়ে-কৌতূহলে ছুটে এসে বাইরে দাঁড়াল কির্‌গিজ কৃষাণ, কাজাক কৃষাণী 'কিবিৎকা' (তাঁবু) ছেড়ে।

উট নয়, গাধা নয়, বলদ নয়, ঘোড়াও নয়, এ আবার কি জন্তু কোথা থেকে এল ? চকিত দৃষ্টিতে ত্রস্তা হরিণীর মতো চেয়ে দেখল চারিদিকে কাজাক কৃষাণী। মনে হ'ল এখনই যেন 'কিবিৎকার' মধ্যে ছুটে পালিয়ে গিয়ে তুলোর বস্তার মধ্যে মুখ গুঁজে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে। তার সাধের 'কিবিৎকা' হয়ত ঐ কুৎসিত দানবটা এখনই ভেঙে গুড়িয়ে দেবে। হয়ত এখনই ওরা বলবে, 'কিবিৎকা তুলে নিয়ে চ'লে যাও'। তার পোষা ভেড়া ক'টাও চর্‌তে বেরিয়ে গিয়েছে কোথায় কোন্ প্রান্তরে তার ঠিক নেই। সে এখন যাবে কি ক'রে ? আবার ঘর্ঘর, ঘ্যাচ্ ঘ্যাচ্, ঘটাং ঘটাং শব্দ হ'ল। এইজন্যেই এরা নূতন খাল কাটছিল এইখানে! ভাবল কৃষাণী। এ-পাশে পাহাড়, ওপাশে প্রান্তর, মধ্যিখানে নূতন খাল দিয়ে তর্ তর্ ক'রে জলের স্রোত ব'য়ে চলেছে। এই সেই তুলাচাষের বৃহৎ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। পনের মাইল লম্বা, তিন মাইল চওড়া জায়গা জুড়ে' এই প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছে। কয়েক হাজার কৃষাণ এখানে কাজ করে। তাদের থাকার জন্যে নূতন নূতন বাসস্থান তৈরী করা হয়েছে। এই অসাড় প্রান্তর তারা কয়েকদিনের মধ্যেই সরগরম ক'রে তুলেছে। নিঃশব্দ প্রান্তর আজ কলরব-মুখরিত। পতিত প্রান্তরের বুকে আজ রাশি রাশি তুলো ফলছে। স্বপ্নেও কেউ ভাবেনি কোনদিন যে এই পতিত প্রান্তর আবাদ করলে সত্যিই সোনা ফলবে। আর তুলো তো মধ্য এশিয়ার সোনা, সব ফসলের মুকুটমণি।

হাজার হাজার ট্রাক্, হাজার হাজার ট্র্যাক্‌টর মধ্য এশিয়ার প্রান্তর-মরুর বুকে অভিযান করল। বুভুক্ষু প্রান্তর, বুভুক্ষু মরুভূমি আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল। গ্রামে গ্রামে আলো জ্ব'লে উঠল, কেরোসিনের আলো নয়, বিজ্‌লী বাতি। ট্র্যাক্‌টর দিয়ে ভুঁই-চষা দেখতে হাজার হাজার কৃষাণ-কৃষাণী পায়ে হেটে এল বহু দূর গ্রাম থেকে। মোল্লারা চীৎকার

ক'রে বলছে পিছন থেকে : "ট্র্যাক্টর দিয়ে জমি চাষ করলে সে-জমিতে ফসল ফলে না। আল্লা বলেছেন, ট্র্যাক্টর হারাম, যন্ত্র হারাম, স্পর্শ করতে নেই। যে স্পর্শ করবে তার বংশে বাতি দিতে আর কেউ বেঁচে থাকবে না, তার জমিতে এক দানাও ফসল ফলবে না।" মোল্লার চীৎকার ব্যর্থ হ'ল। কৃষাণেরা চলল দলে দলে নূতন কৃষি প্রতিষ্ঠানের দিকে। ট্র্যাক্টর মাটি চষছে, কয়েক শ' লাঙ্গল আর ঘোড়া-বলদের কাজ করছে একসঙ্গে একটা ট্র্যাক্টর। হরেক রকমের সব ঝক্‌ঝকে যন্ত্রপাতি এসেছে, নূতন নূতন লাঙ্গল, শস্যচ্ছেদক যন্ত্র, বিদা বা মৈ। ইব্রাহিম ট্র্যাক্টর চালাচ্ছে—সাবাস্ ইব্রাহিম্! কয়েকদিন আগেও ইব্রাহিম মুখে বিকট আওয়াজ করতে করতে লাঙ্গল চষত। সুলতান নূতন কায়দায় মৈ দিচ্ছে মাঠে। অদ্ভুত দৃশ্য! তাজ্জব কাণ্ড! দেখ্‌তে দেখ্‌তে কির্‌গিজ কৃষাণী হঠাৎ ভূত দেখার মতো আঁৎকে উঠল। বিকট ঐ যন্ত্রটা মাঠের বুকের উপর দিয়ে দুর্দ্দাড় ক'রে চালিয়ে আসছে কে? মাথায় বাঁধা ওড়্‌না উড়ছে বাতাসে, ট্র্যাক্টর চালাচ্ছে তাজিক কৃষাণের সেই তরুণী মেয়েটি। দুর্দ্দান্ত সাহস মেয়েটির। কির্‌গিজ কৃষাণী অবাক হয়ে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে দেখছে। সন্ধ্যার সময় চারিদিকে তারার মতো ঝিক্‌ঝিক্ ক'রে বৈদ্যুতিক আলো জ্ব'লে উঠল—মাঠের একটা দিক একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে। এক-একটা দলে ভাগ হয়ে কৃষাণ-কৃষাণীরা জমা হ'ল মাঠের একদিকে। প্রত্যেক দলের দলপতিরা তাদের কি বুঝিয়ে দিল বক্তৃতা দিয়ে। তারপর ছুটির সঙ্কেত-ধ্বনি হ'ল। কৃষাণের দল চলল তাদের নূতন চাখানায়, ক্লাবে। দূরে নয়, মাঠের পাশেই। কৃষাণীরা কেউ কেউ গেল শিশুপালনকেন্দ্রে, সারাদিনের পর তাদের সন্তানদের দেখতে। মহানন্দে আছে তারা, মায়ের মতো ধাত্রীরা তাদের সযত্নে খাইয়ে-দাইয়ে ভুলিয়ে রেখেছে, কেউ খেলছে, কেউ ঘুমুচ্ছে,

আবার কেউ কেউ ধাত্রীমা'র কাছে ব'সে ব'সে চোখ বড় বড় ক'রে শুনছে নূতন রূপকথা।

এইভাবে আরম্ভ হ'ল সমবায় কৃষি-আন্দোলনের দুর্দ্দান্ত অভিযান। কে রুখ্‌বে এই অভিযান? মৌলবী? মোল্লা? বে? ঝড়ের মুখে শুক্‌নো জীর্ণ পাতার মতো তারা উড়ে গেল। চারিদিকে কৃষাণদের সমবায় কৃষি-প্রতিষ্ঠান, সরকারী কৃষি-প্রতিষ্ঠান এবং যন্ত্র ও ট্র্যাক্‌টর স্টেশন (Machine & Tractor Station, সংক্ষেপে M. T. S) প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ১৯৩০ সালের মধ্যেই গোটা মধ্য এশিয়ায় প্রায় ১২টা সরকারী কৃষি-প্রতিষ্ঠানের কাজ আরম্ভ হ'ল। এই সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য হ'ল সাধারণ কৃষাণদের সামনে আদর্শ সমবায় কৃষি-প্রতিষ্ঠানের বাস্তব রূপ দেখিয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করা, উৎসাহিত করা। ১৯৩০ সালের মধ্যেই প্রায় ৫ হাজার ট্র্যাক্‌টর এসে হানা দিল মধ্য এশিয়ার মরু-প্রান্তরের বুকে। তাজিকিস্তানে, উজ্‌বেকিস্তানে, তুর্ক্‌মেনিস্তানে, কির্‌গিজস্তানে প্রায় ১৯টি 'যন্ত্র ও ট্যাক্‌টর স্টেশন' প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ১৯৩০ সালের মধ্যেই দেখা গেল মধ্য এশিয়ার প্রায় শতকরা ২৯টি কৃষক পরিবার সমবায় কৃষি-প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেছে। এক বছরে শতকরা ২৫'৫ সংখ্যাবৃদ্ধি কখনই নগণ্য নয়। বাস্তব দৃষ্টান্ত বাস্তবিকই কার্য্যকরী। ট্র্যাক্‌টরের টান, যন্ত্রের টান, কে বলে দুর্দ্দমনীয় নয়? নূতন জীবনের আহ্বান মাঠে মাঠে সত্যিই যদি ধ্বনিত হয়ে ওঠে, ট্র্যাক্‌টর যদি সত্যিই হাতছানি দিয়ে ডাকে, যন্ত্র যদি দানব না হয়ে একশ' ঘোড়ার কাজ করে, ধ্বংস না ক'রে সৃষ্টি করে, মাঠে মাঠে যদি যন্ত্রের আগমনে প্রকৃতি দেবী খুসী হয়ে প্রচুর ফুল-ফল-ফসল নজ্‌রানা দেয়, তাহ'লে কৃষাণেরাও সাড়া দেয় সেই আহ্বানে। বেদ-বাইবেল-কোরআনে কোথাও এমন কথা লেখা নেই যে কৃষাণেরা চিরকাল প্রগতি-বিমুখ, ভীরু ও কাপুরুষ, আজন্ম ধর্ম্মান্ধ ও স্বার্থপর।

কৃষাণরাও মানুষ, এবং তারাই খাঁটি মাটির মানুষ। মাটিকে তারা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত কোনদিনই অস্বীকার করে না ব'লে সত্যকে তারা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করে। কেতাবী সত্যকে তারা বিশ্বাস করে না। তারা বিশ্বাস করে—মাটির সত্যকে। মাটি থেকে যে-সত্য ফুলের মতো, ফসলের মতো ফুটে ওঠে, সেই সত্যকে তারা জীবন দিয়ে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে। এই হ'ল কৃষাণের স্বভাবধর্ম্ম। তাই যখন যান্ত্রিক সমবায় কৃষির উজ্জ্বল সোনালি ভবিষ্যৎ মধ্য এশিয়ার বুভুক্ষু প্রান্তরের বুক চিরে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করল হাজার হাজার ট্র্যাক্‌টর, বৈদ্যুতিক হার্ভেষ্টর, তখন হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ কৃষাণ এসে ভিড় ক'রে দাঁড়াল সমবায় কৃষি-প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে। "যন্ত্র ও ট্র্যাক্‌টর স্টেশনে" হাজার হাজার কৃষাণ শিক্ষানবিশী করতে লাগল। যারা একদিন মাঠে মাঠে ভোঁতা লাঙ্গল আর ভাঙা কাস্তে দিয়ে চাষ করত, ফসল কাটত, তারাই হ'ল হাজারে হাজারে ট্র্যাক্‌টর-চালক, ট্রাক্‌-চালক, হার্ভেষ্টর চালক, মৈ-চালক, মিস্ত্রী, যন্ত্রী ও ইঞ্জিনিয়ার। মরুভূমির বুক চিরে তারাই খাল কেটে জলসেচনের ব্যবস্থা করল, তারাই নদী ও ঝর্ণার জলকে প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করল, তারাই পুরাতন ক্যারাভানের পরিত্যক্ত পথের উপর দিয়ে নূতন রেলপথ গঠন করল, প্রান্তরের শূন্য বুকে কলরব-মুখরিত নগর গ'ড়ে তুলল। নব্য-প্রস্তর যুগ থেকে এশিয়ার গ্রামীণ সভ্যতা দ্রুতপদে এগিয়ে চলল বিংশ-শতাব্দীর যন্ত্রযুগের দিকে, নাগরিক সভ্যতার দিকে।

মোল্লার বীভৎস ব্যর্থ আর্ত্তনাদ নির্জ্জন মরুভূমির বুকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল শূন্যে। জয় হ'ল ট্র্যাক্‌টরের। জয় হ'ল নূতন মানবতার সঞ্জীবনী মন্ত্রের।

এইবার কৃষি-প্রধান মধ্য এশিয়ার বাস্তব প্রগতির কথা বলি। শুধু

কৃষির প্রগতির কথা। শুধু মধ্য এশিয়ার প্রাগৈতিহাসিক যুগের কৃষাণদের বৈপ্লবিক অগ্রগতির কাহিনী। প্রগতির পথ-নির্দ্দেশ করবে তথ্য ও সংখ্যা (Statistics)। একেবারে নীরেট সংখ্যা, অথচ সমাজতান্ত্রিক জীবনে এই সংখ্যাই কি ভয়ঙ্কর সচল! আজকের '১' কাল হ'ল '১১', পরদিন '১১১', তার পরদিন '১১১১'! এমনিভাবে বেড়েই চলল। সংখ্যার ভিড়ে দিশাহারা হয়ে যেতে হয়। মনে হয় যেন 'সংখ্যার' ভৌতিক নৃত্য দেখছি, গাণিতিক ভেল্‌কি দেখছি। কিন্তু ভেল্‌কি নয়, ভৌতিক নৃত্যও নয়, প্রগতির পথরেখার এক-একটি স্তম্ভ এই সংখ্যা।

উ জ্ বে কি স্তা ন

'Millionaire' বা 'কোটিপতি' ব'লে একটি কথা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। যাদের সম্বন্ধে শুনে থাকি তারা মানব সমাজের দানব বিশেষ। মানুষের মজ্জা শুষে মুনাফালব্ধ কোটি কোটি টাকার পিরামিডের উপর এই কোটিপতিরা আরাম ক'রে ব'সে থাকে। এই শ্রেণীর কোটিপতিদের কথা আমরা এখানে বলব না। সোভিয়েট ইউনিয়নে এদের অনেক আগেই কবর দেওয়া হয়েছে। তাহ'লে কি সোভিয়েট ইউনিয়নে কোটিপতি নেই? আছে। এক-একটি কোটিপতি সমবায় কৃষি-প্রতিষ্ঠান আছে। যে-সব কৃষি-প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক আয় এক কোটি রুব্‌ল তাদের বলা হয় 'Millionaire Farms' বা কোটিপতি প্রতিষ্ঠান। ১৯৩৯-৪০ সালের গোড়ার দিকে দেখা গেল এই রকম কোটিপতি সমবায় কৃষি-প্রতিষ্ঠান গোটা সোভিয়েট ইউনিয়নে ৮০০টি আছে। যদি বলি তার মধ্যে ৫০০টি কেবলমাত্র উজ্‌বেকিস্তানের মধ্যেই, তাহ'লে সংখ্যার ভেল্‌কি মনে ক'রে অনেকেই হয়ত চম্‌কে

উঠবেন। অবশ্য চম্‌কে ওঠার কথাই বটে! তাহ'লেও উজ্‌বেকিস্তানের কথা মিথ্যা নয় এবং এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত থেকেই বুঝতে পারা যাবে যান্ত্রিক সমবায় কৃষির প্রগতি উজ্‌বেকিস্তানে কতদূর পর্য্যন্ত হয়েছে।[১১] মোট আবাদী জমির কতটা অংশ 'যন্ত্র ও ট্র্যাক্‌টর স্টেশন' দ্বারা আবাদ করা হয়েছে তার হিসেব নিলেই কৃষির যান্ত্রিক প্রগতির পরিচয় পাওয়া যাবে। ১৯৩৭ সালের হিসেবেই দেখা গেল, রুশ প্রজাতন্ত্রে মোট আবাদী জমির শতকরা ৯১ ভাগ, উক্রেইনে শতকরা ৯৮'৮ ভাগ, বেলোরুশিয়ায় শতকরা ৮৬'৯ ভাগ, আর্মেনিয়ায় ৭৩'১ ভাগ, আজারবৈজানে ৬৯'১ ভাগ, জর্জিয়ায় ৭০'৩ ভাগ, তুর্ক্‌মেন প্রজাতন্ত্রে ৯৬'৩ ভাগ, উজ্‌বেকিস্তানে ৯৬'১ ভাগ, কাজাকস্তানে ৮৬'২ ভাগ, তাজিকিস্তানে ৪৮'৪ ভাগ, কির্‌গিজস্তানে ৭৯'২ ভাগ সরাসরি 'যন্ত্র ও ট্র্যাক্‌টর স্টেশনের' তত্ত্বাবধানে চাষ করা হয়েছে। কৃষির যান্ত্রিক প্রগতির নির্দ্দেশ এই সংখ্যা থেকেই পাওয়া যায় এবং বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যান্য কোন দেশের তুলনায় মধ্য এশিয়ার প্রগতি মন্থর নয়।[১২]

উজ্‌বেকিস্তানকে অনাদিকাল থেকে বলা হয় 'শ্বেতস্বর্ণের দেশ', কারণ মধ্য এশিয়ার তুলোর জন্যে উজ্‌বেকিস্তান প্রসিদ্ধ। ১৯৩৯ সালে দেখা গেল, উজ্‌বেকিস্তানে ৮৪৫২টি সমবায় কৃষি-প্রতিষ্ঠান, ৭৯টি সরকারী কৃষি-প্রতিষ্ঠান, ১৭৭টি 'যন্ত্র ও ট্র্যাক্‌টর স্টেশন' (M. T. S,) গ'ড়ে উঠেছে এবং ২২০৮২টি ট্র্যাক্‌টর চলছে কৃষিক্ষেত্রে। প্রায় ৩০ লক্ষ হেক্টর* জমিতে আবাদ করা হয়েছে এবং তার মধ্যে প্রায় ১,২০০,০০০ হেক্টর জমিতে জল-সেচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৪১ সালে আরও প্রায়

---

১১ R. A. Davies & A. T. Steiger : Soviet Asia (1943 Edition) : Chap. VI, Pp. 79-84.

১২ J. F. Horrabin & J. S. Gregory : Op. Cit

* ১ হেক্টর ২'৪৭১ একর, অর্থাৎ প্রায় আড়াই একর।

১৪১৪০০ হেক্টর জমিতে জল-সেচনের ব্যবস্থা ক'রে তুলো, আঙুর ও সিল্ক চাষের ক্ষেত্র বাড়ানো হ'ল। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে উজবেকিস্তানের যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠানগুলির আয় বেড়ে ৪৬ কোটি ১০ রুব্‌ল থেকে প্রায় ২৭১ কোটি ১০ রুব্‌ল † হ'ল। সোভিয়েট ইউনিয়নের মোট তুলোর প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ উৎপন্ন হয় উজবেকিস্তানে। তুলোর আবাদ ও উৎপাদনের ক্রমোন্নতি লক্ষ্যণীয় :

	আবাদ	উৎপাদন(প্রতি হেক্টর)	মোট উৎপাদন
১৯১৩	৪২৩,০০০ হেক্টর	১২'২ হন্দর	৫১০০,০০০ হন্দর
১৯২৪	২৫৫,০০০ "	৭'২ "	১,৮৪০,০০০ "
১৯২৯	৬০৭,০০০ "	৯'১ "	৫,৫০০,০০০ "
১৯৩৮	৯১৬,০০০ "	১৬'৮ "	১৫,৪০০,০০০ "
১৯৩৯	৮১৮,০০০ "	১৭'২ "	১৬,০০০,০০০ "

জল-সেচনের দুরবস্থা, মহামারী ও গৃহবিপ্লবের জন্যে ১৯২৪ সালে আবাদী জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ ক'মে গিয়েছিল, তুলোর চাষের অবনতি হয়েছিল। কিন্তু তারপর তুলোর আবাদ যেমন বেড়েছে, প্রতি একর জমিতে তুলোর উৎপাদনের হারও বেড়েছে এবং মোট তুলোর উৎপাদনও বেড়েছে। তুলোর উৎপাদনের কতখানি উন্নতি হয়েছে তা তুলা-সমবায়ের কৃষাণদের আয় থেকেই সুন্দরভাবে বুঝা যায়। ১৯৪০ সালে প্রত্যেক কৃষাণের আয় ছিল গড়ে প্রতিদিন প্রায় ২৫ রুবল, অর্থাৎ প্রায় ৩২৸/০ এবং এ-ছাড়াও ফসলের একটা অংশ। অনেকের আয় এর চাইতেও বেশী ছিল। যেমন, আক্-আল্‌তিন প্রতিষ্ঠানের একজন ব্রিগেড্-নেতা ১৯৪১ সালে প্রায় ৪২,০০০ রুব্‌ল (৮৪০০ ডলার) আয় করে,

† সাধারণ হিসেবে এক রুব্‌ল আমাদের একটাকা সাড়ে পাঁচ আনার সমান।

এবং ইসমাইল রসুল নামে একজন কৃষাণ আয় করে ৩৫০০০ রুবল (৭০০০ ডলার)। ১৯৩৯ সালে উজবেকিস্তানে প্রায় ৩০ লক্ষ হেক্টর জমিতে আবাদ করা হয় এবং তার মধ্যে তিন ভাগের এক ভাগের বেশী জমিতে নূতন জল-সেচনের ব্যবস্থা করা হয়। তুলো ছাড়াও অন্যান্য ফসল ও শস্য আবাদ করা হয় উজবেকিস্তানে। যেমন :

খাদ্যশস্য : ১৯৩৯ সালে ১৪৮৬০০০ হেক্টর জমিতে আবাদ করা হয়, প্রতি হেক্টরে ৮'৭ হন্দর এবং মোট ১২,৪০০,০০০ হন্দর শস্য উৎপন্ন হয়। ১৯৪২ সালে যুদ্ধের মধ্যে খাদ্য-শস্যের ঘাটতি পূরণের জন্যে আরও প্রায় ১,০০০,০০০ একর জমিতে খাদ্য-শস্যের আবাদ বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

পশুর খাদ্য : ১৯৩৯ সালে ৩৪৮৯০০ হেক্টর জমিতে আবাদ করা হয় এবং ১৯৪১ সালে আবাদের জমি বাড়িয়ে করা হয় ৫০০,০০০ হেক্টর।

চাল : সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে উজবেকিস্তানই হ'ল চালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। ১৯৩৯ সালে উজ্‌বেকিস্তানে ৮০,০০০ হেক্টর জমিতে ধান চাষ করা হয়, গোটা সোভিয়েট ইউনিয়নে হয় মোট ১৬৬,৮০০ হেক্টর জমিতে।

সিল্ক : সোভিয়েট ইউনিয়নের অর্দ্ধেক সিল্ক উৎপন্ন হয় উজ্‌বেকিস্তানে। ১৯৪০ সালে সিল্ক উৎপন্ন হয় ১২৪,০৭০ হন্দর।

পাট : পাটের চাষ নূতন করা হ'চ্ছে উজ্‌বেকিস্তানে। এখন প্রায় ২০০০ হেক্টর জমিতে পাট চাষ করা হয়। এ-ছাড়া নানারকম ফসল ও আঙ্গুরের চাষও হয় উজ্‌বেকিস্তানে। পশুপালনও উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৮ সালে প্রায় ৪০ লক্ষ ছাগল-ভেড়া পালন করা হয় উজ্‌বেকিস্তানে।

তাজিকিস্তান

আমাদের হিন্দুস্থানের প্রাচীন প্রতিবেশী তাজিকিস্তান। তাজিকরা আজ আফগানিস্তানের অন্যতম সংখ্যালঘু জাতি। আফগানিস্তানের সীমান্তে তাজিকিস্তান। শুধু মধ্য-এশিয়ায় নয়, পৃথিবীর মধ্যে তাজিকিস্তান সকলের কনিষ্ঠ। তরুণ তাজিক প্রজাতন্ত্রের জন্ম হয় ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে। তার আগে তাজিকরা উজবেক প্রজাতন্ত্রের অন্তর্গত ছিল। ১৯২১ থেকে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত, প্রায় দশ বছর ধ'রে তাজিকিস্তানের উপর দিয়ে বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের ঝড় ব'য়ে গিয়েছে। আফগানিস্তানে প্রবাসী পলাতক আমীর বে-মোল্লা-বাস্‌মাচিরা প্রায় ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত তাজিকদের উপর উপদ্রব করেছে। শান্তিতে পুনর্গঠন ও উন্নতির পরিকল্পনা করার সময় পায়নি তাজিকরা। তবু তাজিক পল্লীর প্রগতি এবং তাজিক কৃষাণদের উন্নতি দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। মনে হয়, এ-কি সত্যিই উন্নতি, না কেবল গাণিতিক সংখ্যার ভেল্‌কি মাত্র।

দেখতে দেখতে তাজিকিস্তানে প্রায় ৩৮৬২ টা সমবায় কৃষি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠল, ৪৮টা ট্র্যাক্‌টর স্টেশনে (M.T.S.) প্রায় ৪০০০ ট্র্যাক্টর এবং ১০০০ ট্রাক্ এসে জমা হ'ল। হার্ভেষ্টর এল, মৈ এল, নূতন নূতন কাস্তে লাঙ্গল কোদালি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি এল। হাজার হাজার ক্ষেতমজুর, বর্গাচাষী, ভাগচাষীরা এসে যোগদান করল কৃষি-প্রতিষ্ঠানে। প্রায় ১৮৭,০০০ কৃষাণ পরিবার এবং মোট আবাদী জমির ৯৯·২ ভাগ সমবায় কৃষি-প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হ'ল। তারপরই আরম্ভ হ'ল সংখ্যার দুরন্ত অভিযান। ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৩৮-'৩৯ সালের মধ্যে তাজিকিস্তানের সমবায় কৃষি-প্রতিষ্ঠানের আয় ন'গুণ বেড়ে ৫ কোটি ২৫ লক্ষ রুব্‌ল থেকে হ'ল ৪৫ কোটি ৭০ লক্ষ রুব্‌ল। তুলোর উৎপাদনও অসাধারণ বৃদ্ধি পেল:

	আবাদী জমি	উৎপাদন (প্রতি হেক্টর)		মোট উৎপাদন
		মিশরীয় তুলা	মার্কিনী তুলা	
১৯২৯	৫০,৭০০ হেক্টর	×	×	৩৮৬,০০০ হন্দর
১৯৩৩	×	২'৫ হন্দর	৬'৫ হন্দর	
১৯৩৮	×	১৫ হন্দর	১৭'৯ হন্দর	১৮৯৭,০০০ হন্দর (৫০,০০০ হন্দর মিশরীয়)
১৯৩৯	১১০,০০০ হেক্টর (৩০,০০০ হেক্টর মিশরীয়)	১২'৭ হন্দর	১৮'২ হন্দর	১৭১০,০০০ হন্দর
১৯৪৬	১৪০,০০০ হেক্টর	১৭ হন্দর	২৬'৫ হন্দর	৩১২০,০০০ হন্দর

খাদ্যশস্য : প্রায় ৫৭৬,২০০ হেক্টর জমিতে (১৯৩৮-৩৯) খাদ্যশস্যের আবাদ করা হয়, তার মধ্যে চার ভাগের তিন ভাগ জমিতে গমের এবং ১ ভাগ জমিতে যব, বার্লি, ভুট্টার চাষ হয়। মোট উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ হয় প্রায় ৪০ লক্ষ হন্দর, ১৯১৩ সালের দ্বিগুণ।

তুর্কমেনিস্তান

সংখ্যার শোভাযাত্রা তুর্কমেনিস্তানেও কম উল্লেখযোগ্য নয়। ১৯৩৯ সালে তুর্কমেনিস্তানে ১৬৮৪টি সমবায় প্রতিষ্ঠান এবং ২৯টি সরকারী কৃষি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠল। ৫২টি ট্র্যাকটর স্টেশনে প্রায় ৪৬১৫টি ট্র্যাক্টর ও অন্যান্য নানরকমের যন্ত্রপাতি জমা হ'ল। মোট আবাদী জমির প্রায় শতকরা ৯৯'৮ ভাগ সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত হ'ল। ৪৫,৮০০ হেক্টর অতিরিক্ত আবাদী জমিতে নূতন জলসেচনের ব্যবস্থা হ'ল। ১৯৪০ সালে আরও ১০৪,০০০ হেক্টর নূতন জমিতে জলসেচন ব্যবস্থা প্রসারিত করা হ'ল।

১৯৩৮-'৩৯ সালে প্রায় ১৫৪,০০০ হেক্টর জমি থেকে ২৩৯,০০০ টন

তূলা উৎপন্ন হ'ল (প্রতি হেক্টরে প্রায় ১৫'৫ হন্দর ক'রে)। এই উৎপাদন ১৯২৮ সালের তুলনায় প্রায় তিনগুণ। প্রতি হেক্টর জমিতে তূলোর উৎপাদন ১৯২৮ সালের ৭'৭ হন্দর থেকে বেড়ে ১৯৩৯ সালে হ'ল ১৬'৪ হন্দর। ১৯৪৬ সালের পরিকল্পনায় তূলোর উৎপাদন মোট ৩৫৪,০০০ টন পর্য্যন্ত বাড়ানো হবে ঠিক হয়েছে। তূলা সমবায়গুলির আয় ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে প্রায় ৯ গুণ বেড়ে ৫ কোটি ১০ লক্ষ রুব্‌ল থেকে হয় ৪৭ কোটি ৪০ লক্ষ রুব্‌ল। এ-ছাড়া অন্যান্য খাদ্যশস্য, ফল ও ফসলের উৎপাদনও যথেষ্ট বেড়েছে। তুর্কমেনিস্তানের প্রাকৃতিক রূপ পর্য্যন্ত বদ্‌লে গিয়েছে।

কি র্‌ গি জ স্তা ন

কির্‌গিজস্তানের প্রগতিও অসামান্য। ১৯৩৯ সালে প্রায় ১৮৭৯টি সমবায় প্রতিষ্ঠান এবং ৬৩ টি ট্র্যাকটর স্টেশন কির্‌গিজস্তানে গ'ড়ে ওঠে। ৬০০০ ট্র্যাক্‌টর ও ২০০০ হার্ভেষ্টর কির্‌গিজস্তানের প্রান্তরে উপত্যকায় অভিযান করে। ১৭০,০০০ কৃষাণ পরিবার সমবায়ে যোগ দেয় এবং মোট আবাদী জমির শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৩৮-'৩৯ সালে প্রায় ৭৯৯,২০০ হেক্টর জমিতে গম, বার্লি, ধান প্রভৃতি খাদ্যশস্য চাষ করা হয়। ৬৫,০০০ হেক্টর জমিতে তূলোর চাষ করা হয় এবং মোট তূলো উৎপন্ন হয় ৯৭,৫০০ টন, অর্থাৎ প্রতি হেক্টরে প্রায় ১৫ হন্দর। ১৯৩০ সালে কির্‌গিজস্তানে বীটের (চিনি) চাষ আরম্ভ হয় এবং দশ বছরের মধ্যে গোটা সোভিয়েট ইউনিয়নের মোট উৎপাদনের শতকরা তিনভাগ এখানে উৎপন্ন হতে থাকে। ১৯২৯ সালে তামাকের চাষ আরম্ভ হয় এবং ১৯৩৯ সালে প্রায় ৪০০০ হেক্টর জমিতে খুব ভাল তামাকের চাষ করা হয়। ১৯২৫ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে ১১ কোটি ২০

লক্ষ রুব্‌ল জলসেচনের ব্যবস্থার জন্যে খরচ করা হয়। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে আরো ১৭ কোটি রুব্‌ল বেশী জলসেচনের জন্যে বরাদ্দ করা হয়।

কাজাকস্তান

ভল্‌গার ধার থেকে মোঙ্গলিয়ার সীমান্ত পর্য্যন্ত কাজাকস্তান বিস্তৃত। এ-দেশের অধিকাংশ জুড়ে রয়েছে প্রান্তর ও মরুভূমি। এই প্রান্তর ও মরুভূমিকে জয় করেছে যন্ত্র ও বিজ্ঞান। ১৯৩৯ সালের মধ্যে প্রায় ৭৪৩৭ টি সমবায় ও ১৯১ টি সরকারী কৃষি প্রতিষ্ঠান কাজাকস্তানে গড়ে ওঠে। ৩০৮টি ট্র্যাক্টর স্টেশনে প্রায় ৩৫,০০০ ট্র্যাক্টর এবং ১০,৫০০ হার্ভেষ্টর কাজাকস্তানের মরু-প্রান্তরে অভিযান করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকে। কৃষক পরিবারের শতকরা ৯৯ জন এবং আবাদী জমির শতকরা ৯৯'৯ ভাগ সমবায় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হয়। কাজাকস্তানের উত্তরে ও পূর্বে খাদ্যশস্যের চাষ হয়, মধ্যভূমিতে পশুপালন এবং দক্ষিণ প্রদেশে তুলো, ধান, বীট (চিনি) ও অন্যান্য শস্যের চাষ হয়।

	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৪০
মোট আবাদী জমি (হেক্টর)	৫,৮৩২,০০০	৬,১০৬,০০০	৬,৩৩৩,০০০
খাদ্যশস্য	৫,১৫৫,০০০	৫,৩২৯,০০০	×
তুলো	১১১,০০০	১১০,০০০	×
ধান	×	২৬,০০০	×
বীট (চিনি)	১৩,০০০	×	১৫,০০০
পশুর খাদ্যশস্য	১৯৪,০০০	×	×

জলসেচন ব্যবস্থা

১৯১৫	৬৯৬,০০০ হেক্টর
১৯৩৯	১০৯১,০০০ হেক্টর
১৯৪০	১১৭৮,০০০ হেক্টর

১৯৪২ সালে আরও ১,০০০,০০০ একর জমিতে খাদ্যশস্যের আবাদ বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। উক্রেইন্ নাৎসী জার্ম্মানী অধিকার করার পর সোভিয়েট গবর্ণমেন্ট প্রায় মধ্য এশিয়ার প্রত্যেক রিপাব্লিকে খাদ্যশস্যের আবাদ বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করেন। পশুপালনের জন্যেও কাজাকস্তান বিখ্যাত। ১৯৩৮ সালে প্রায় ৯০ লক্ষ পশুপালন করা হয়, তার মধ্যে ৫০ লক্ষের কিছু বেশী হ'ল ভেড়া, ছাগল, ৩০ লক্ষ হ'ল গবাদি পশু আর ৯ লক্ষের কিছু বেশী ঘোড়া। ১৯৩৯ সালে পশুর সংখ্যা ১ কোটি ১০ লক্ষেরও বেশী হয়, এখন আরও বেড়েছে। চাম্ড়া ও হাড় সরবরাহের একটা বড় কেন্দ্র হ'ল কাজাকস্তান। ১৯৩৯ সালে কাজাকস্তান থেকে উদ্বৃত্ত প্রায় ৯০,০০০ টন গোমাংস, ২০০,০০০ টন দুধ ও মাখন এবং প্রায় ৮০০০ টন পশম বাইরে রপ্তানি করা হয়।

সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ

উপরে যে সংখ্যার শোভাযাত্রা আমরা পার হয়ে এলাম তার প্রত্যেকটি হ'ল সোভিয়েট সমাজতন্ত্রবাদের এক একটি কীর্ত্তিস্তম্ভ। কিন্তু যদি ঐ একই সংখ্যার ভিড় ঠেলে চলি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কোন উপনিবেশের মধ্যে তাহ'লে মনে হবে সংখ্যার শোভাযাত্রা নয়, যেন রাশি রাশি সংখ্যার শবযাত্রা পার হয়ে চলেছি। সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার (কাজাকস্তান নিয়ে) আয়তন হবে প্রায় ১,৫৩৪,০০০ বর্গমাইল এবং মোট জনসংখ্যা হবে ১,৬৬, ৬৭০০০। গোটা ভারতবর্ষের (দেশীয় রাজ্য নিয়ে) আয়তন হবে প্রায় ১,৫৭৬,০০০ বর্গ মাইল, কিন্তু লোকসংখ্যা হবে প্রা[illegible],৯০,০০০০০। অর্থাৎ আয়তনের দিক দিয়ে ভারতবর্ষ ও সোভিয়েট মধ্য এশিয়া প্রায় সমান, যদিও লোকসংখ্যার দিক দিয়ে ভারতের লোকসংখ্যা মধ্য এশিয়ার প্রায় পঁচিশ গুণ বেশী।* শুধু আমাদের বাংলাদেশের লোকসংখ্যা হ'ল প্রায় ৬ কোটি ৩ লক্ষ ১৪ হাজার। গোটা মধ্য এশিয়ার প্রায় চতুর্গুণ লোকসংখ্যা।

বাংলাদেশেই আছে, যদিও আয়তনে গোটা ভারতবর্ষ ও সোভিয়েট মধ্য এশিয়া প্রায় সমান হবে। ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের 'সংখ্যাগুলিকে' এইদিক থেকে সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার সঙ্গে তুলনা ক'রে বিচার করতে হবে।

ভারতের মোট লোকসংখ্যার শতকরা কতজন কৃষির উপর এবং কতজন শ্রমশিল্পের উপর নির্ভর করে তার একটা তালিকা দিয়ে আরম্ভ করলেই ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থার চিত্র বিদ্যুতের মতো চম্‌কে উঠ্‌বে চোখের সামনে, আর তার সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণের বীভৎস রূপও প্রকট হয়ে উঠবে।[১৩]

	কৃষির উপর নির্ভরশীল	শ্রমশিল্পের উপর নির্ভরশীল
	(শতকরা)	
১৮৯১	৬১'১	×
১৯১১	৬৬'৫	৫'৫
১৯২১	৭২'২	৪'৯
১৯৩১	৭৩'০	৪'৩
১৯৪১		৪'২

একদিকে দেখা যাচ্ছে ভারতের শ্রমশিল্পের প্রসারের পথে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ পর্ব্বতপ্রমাণ বাধার মতো দাঁড়িয়ে আছে, ফলে ভারতবর্ষ ক্রমেই নুইয়ে পড়ছে কৃষির উপর। সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও মুনাফার

১৩ P. A. Wadia & K. T. Merchant: Our Economic Problem (2nd Ed. Revised and Enlarged) 1945—Chaps IV, V

R. Palme Dutt: India Today (Indian Edition: 1947)

জন্তে চায় কৃষিজাত কাঁচামাল, শিল্পজাত পণ্য নয়। তাই ভারতের অর্থনৈতিক জীবনকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ জোর ক'রে গ্রামের মধ্যেই বন্দী ক'রে রেখেছে। সেই বন্দীজীবনও ভয়ঙ্কর। ভারতবর্ষ দিন দিন নুয়ে পড়ছে কৃষির উপর পিঠে বিশাল এক পাহাড়ের মতো বোঝা নিয়ে। জমিদারের খাজনার বোঝা, মহাজনের সুদের বোঝা, ঋণের বোঝা, আদিম যুগের অচল কৃষির যন্ত্রপাতির বোঝা, হাজা ও মজা নদ-নদীর বোঝা, সেচের শোচনীয় দুরবস্থার বোঝা, রোগব্যাধি ও পঙ্গুতার বোঝা। এই বোঝার ভারে আজ সোনার ভারত, প্রাচুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যে ভরা ভারতের সর্ব্বাঙ্গ দারিদ্র্যের কালিমালিপ্ত। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ক্ষতচিহ্নে আজ ভারতবর্ষ কুৎসিত। যে-মাটিতে একদিন সোনা ফলত এই দেশে, যে সোনার ফসল ও পণ্যের পসরা নিয়ে ভারতের সদাগরেরা একদিন এশিয়া ও আফ্রিকায় বাণিজ্যযাত্রা করতেন, আজ সেই ভারতের মাটি বন্ধ্যাতার কলঙ্ক বহন করছে, আজ তার ফলনশক্তি ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। বৃটিশ ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির এবং খাদ্যশস্যের ফলনশক্তির ক্ষয়ের হিসেব দেখলেই এই সত্য উপলব্ধি করা সহজ হবে ঃ[১৪]

	জনসংখ্যা	আবাদী জমি (দশলক্ষ একরের হিসাব)	খাদ্যশস্য (দশলক্ষ টনের হিসাব)
১৯১১-১২	২৩১'৬	১৫০'৬	×
১৯২১-২২	২৩৩'৬	১৫৮'৬	৫৪'১
১৯৩১-৩২	২৫৬'৮	১৫৬'৯	৫০'১
১৯৪১-৪২	২৯৫'৮	১৫৬'৫	৪৫'৭

১৪ **W. Burns: Technological Possibilities of Agricultural Development in India; 1944**

গোটা ভারতবর্ষের প্রায় ৩৮ কোটি ৯০ লক্ষ লোকের জন্যে বর্ত্তমানে ৫ কোটি ৩০ লক্ষ টন পর্য্যন্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হতে পারে। তাও যদি আবার অনাবৃষ্টি না হয় এবং ফলন ভাল হয়। ভারতের প্রত্যেকটি লোকের জন্যে যদি এক পাউণ্ড ক'রেও খাদ্য বরাদ্দ ক'রে দেওয়া যায় তাহ'লেও প্রায় ৬ কোটি ৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে যে বর্ত্তমান অবস্থায় বাড়্‌তি বা প্রাচুর্য্য তো দূরের কথা, স্বয়ং-সম্পূর্ণতাই ভারতের নেই, তার বদলে খাদ্যশস্যের ঘাট্‌তি আছে প্রায় এক কোটি টন। উপরের হিসেব থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে ভারতে খাদ্যশস্যের ফলনশক্তিও ধীরে ধীরে ক'মে যাচ্ছে। ভারতবর্ষে (বর্ম্মা নিয়ে) চালের ফলনশক্তি ১৯০০-'১৩ সালের হিসেবে প্রতি একর জমিতে ৯৮২ পাউণ্ড থেকে ১৯৩৮-'৩৯ সালে ৭২৮ পাউণ্ড পর্য্যন্ত ক'মে যায়।

সমাজতন্ত্রের দেশে, এই এশিয়ারই একাংশে, উজ্‌বেকিস্তান-তাজিকিস্তান-তুর্কমেনিস্তান-কিরগিজ্‌স্তানে আমরা দেখেছি "সংখ্যার" শোভাযাত্রা, ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যার অভিযান। আমরা শুনেছি সেখানে জীবন্ত 'সংখ্যা'র পদধ্বনি। সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশে, আমাদের এই ভারতবর্ষে আমরা দেখব 'সংখ্যার' শবযাত্রা, নতমুখ মুমূর্ষুদের সংখ্যার ঠেলাঠেলি। সেখানে প্রতিটি সংখ্যা সমাজতান্ত্রিক কীর্ত্তির জয়স্তম্ভ, এখানে প্রতিটি সংখ্যা সাম্রাজ্যবাদী অপকীর্ত্তির বেদনাদায়ক স্মৃতিস্তম্ভ। সেখানে সংখ্যাগুলি দিগন্তবিসর্পিত প্রগতির পথনির্দ্দেশ করছে, এখানে সংখ্যাগুলি অতল গহ্বরাভিমুখী ক্রমাবনতির ইঙ্গিত করছে। এখানকার, অর্থাৎ এই ভারতবর্ষের এই ম্রিয়মান সংখ্যার শবযাত্রার আরও দু'একটি পরিচয় দিই। প্রথমে এই সংখ্যার সাহায্যে গত ৪০ বছরে "বৃটিশ

ভারতে" মোট ভূসম্পদের অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হয়েছে দেখা যাক (১০ লক্ষ একরের হিসেব) : —[১৫]

জমির শ্রেণীবিভাগ	১৯০০-১	১৯১০-১১	১৯২০-২১	১৯৩০-৩১	১৯৪০-৪১
অরণ্য	৫৫	৬২	৬৬	৬৭	৬৮(১৩'৩·/.)
আবাদের অযোগ্য জমি	৮২	১০৪	৯৮	৯৪	৮৭(১৬'৯·/.)
পতিত জমি (যা আবাদ করা যায়)	৮১	৮৯	৯০	৯৪	৯৮(১৯'১·/.)
চষা জমি, যা আবাদ করা হয় না	৪০	৪২	৫৬	৪৬	৪৫(৮'৯·/.)
আবাদী জমি	১৮৬	২১০	১৯৭	২১১	২১৪(৪১'৮·/.)

এই সংখ্যা-সূচী থেকে দেখা যাচ্ছে, ভারতের মোট ভূসম্পদের শতকরা ১৩'৩ ভাগ অরণ্য-সম্পদ। এই অরণ্য-সম্পদ ক্রমেই নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। আবাদের অযোগ্য জমি গত চল্লিশ বছরে ৫০ লক্ষ একর বেড়েছে, আর পতিত জমি (যা আবাদ করা যায়) বেড়েছে ১ কোটি ৭০ লক্ষ একর। এ-ছাড়াও এমন জমিও এ-দেশে আছে যা চষা হয় অথচ কোন ফসল তাতে আবাদ করা হয় না। এই শ্রেণীর জমিও গত ৪০ বছরে ৫০ লক্ষ একর বেড়েছে। তাহ'লে প্রগতি আমাদের কোন্ দিকে হ'চ্ছে? প্রগতি হ'চ্ছে ধ্বংসের দিকে, মৃত্যুর দিকে, অভাব, দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের দিকে।

ভারতের জনসাধারণের সর্ব্বপ্রধান খাদ্য হ'ল চাল। শুধু খাদ্য নয়, খাদ্যশস্য যা ভারতে উৎপন্ন হয় তার মধ্যে চাল হ'ল প্রধান। এই খাদ্য শস্যের আবাদ মাত্র গত ১৫ বছরের মধ্যে কি ভাবে কমেছে এবং ফলন-শক্তিরও যে কতটা অবনতি হয়েছে তার একটা হিসেব দিচ্ছি :

---

১৫ P. A. Wadia & K. T. Merchant: Op. Cit: Chaps VII, VIII, IX.

	আবাদী জমি (চাল)—শতকরা হিসাব (১০০০ হেক্টরের হিসাব)		জমির উৎপাদন—শতকরা হিসাব (১লক্ষ হন্দরের হিসাব)	
১৯২৬-৩০	৩২,৭০০	১০০	৪৬৩	১০০
১৯৩১-৩৫	৩৩,৭০০	১০৩	৪৮০	১০৩'৬
১৯৩৮-৩৯	২৯,৫০০	৯০	৩৬৩	৭৮
১৯৩৯-৪০	২৯,২৭৫	৮৯'৫	৩৮৫	৮৩
১৯৪০-৪১	২৯,২২৪	৮৮'১	৩৩৩	৭১'৯

মাত্র ১৫ বছরের মধ্যে, ১৯২৬ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে চালের আবাদী জমি কমেছে শতকরা ১২ ভাগ, আর উৎপাদন-শক্তি কমেছে শতকরা ২৮ ভাগ। প্রগতি, না ক্রমাবনতি ?

সংখ্যার শবযাত্রা এখানেই শেষ নয়। এই সংখ্যার আরও দু'একটি বীভৎস নৃত্য দেখাচ্ছি। একজন চাষীর পরিবারের (যদি ৫ জন লোক প্রতি পরিবারে হয়) নির্ভরযোগ্য (Economic) জমির পরিমাণ কেউ বলেছেন ১০ একর, কেউ ৭ একর, আবার কেউ বলেছেন ৫ একর হওয়া উচিত। ৫ একর হিসেবে ধরলেও দেখা যাবে ভারতবর্ষের অধিকাংশ কৃষাণ পরিবারের এই সামান্য জমিও নেই যাতে সে আবাদ ক'রে কোনরকমে দু'মুঠো খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। ডাঃ ক্যাল্‌ভার্ট পাঞ্জাব প্রদেশে প্রত্যেক কৃষাণ পরিবারের জমি কতটা আছে তার একটা গড় পড়তা হিসেব দিয়েছেন :

জমির মাপ	কৃষাণ পরিবার	শতকরা হিসাব
১ একর এবং তারও কম	৬৮,৬৬৪	২২'৫
১ একর থেকে ২½ একর	৪৬,৯১৭	১৫'৪
২½ একর থেকে ৫ একর	৫৪,৪৬১	১৭'৯
৫ একর থেকে ৭½ একর	৩৪,২৮৫	১১'২

জমির মাপ	কৃষাণ পরিবার	শতকরা হিসাব
৭½ একর থেকে ১০ একর	২৮,৩৭০	৯'৩
১০ একর থেকে ১৫ একর	৩১,০০০	১০'২
১৫ একর থেকে ৩০ একর	৩১,৭৫২	১০'৪
৩০ একর থেকে ৫০ একর	৬,৭২৯	২'২

পাঞ্জাব প্রদেশের মোট আবাদী জমি হ'ল ২,১৯৩,৮৬০ একর, ভাগে প্রত্যেক কৃষাণ পরিবারের গড়ে ৭'২ একর ক'রে জমি পড়ে। দেখা যাচ্ছে, শতকরা ৫৫'৮টি কৃষাণ পরিবারের ৫ একরেরও কম জমি আছে। জমি এইভাবে প্রায় সব প্রদেশে খণ্ডিত-বিখণ্ডিত হবার ফলে ভারতের কৃষাণের দুরবস্থার সীমা নেই এবং কৃষাণের শোচনীয় দুরবস্থার জন্যে কৃষিরও অবনতি হ'চ্ছে। বর্গাচাষী, ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুরের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

বাংলাদেশ

আমাদের বাংলাদেশের কথাই বলি। ১৯১১ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে বাংলার লোকসংখ্যা শতকরা প্রায় ৩জন বাড়ে, ১৯২১ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে বাড়ে শতকরা প্রায় ৭ জন, আর ১৯৩১ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে বাড়ে শতকরা প্রায় ২০ জন। কিন্তু বাংলার খাদ্য-উৎপাদন কি সেই অনুপাতে বেড়েছে? বাড়ে নি। বাংলার খাদ্য উৎপাদন মোটামুটি প্রায় একই আছে। বাংলায় প্রায় ২ কোটি ৯০ লক্ষ একর জমিতে চাষ হয় এবং চাষের যোগ্য প্রায় ৩৭ লক্ষ একর জমি পতিত থাকে। সরকারী হিসেব অনুসারে প্রতি একর জমিতে ১২ মণ ১৬ সের ক'রে চাল হয়। কিন্তু ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার আগে প্রতি একর জমিতে এদেশে প্রায় ২৪ মণ চাল উৎপন্ন হ'ত। বঙ্গীয় প্রাদেশিক

ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটির রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ১৯০৬ থেকে ১৯২৬ সালের মধ্যে প্রতি একরে চালের ফলন প্রায় ২৷৷৹ মণ কমেছে। ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত ২০ বছরের হিসেব নিয়ে দেখা গিয়েছে যে বাংলাদেশে বৎসরে প্রায় ২৩ কোটি মণ চাল উৎপন্ন হয়। বাংলার প্রত্যেকটি লোক যদি দু'বেলা পেট ভ'রে খেতে চায় তাহ'লে প্রায় ২৭ কোটি মণ চাল লাগে বছরে। সুতরাং বাংলাদেশের ৩৭ লক্ষ একর পতিত জমিতেই যদি আবাদ করা যায় এবং সেখানে সরকারী হিসেব অনুসারেই যদি প্রতি একরে ১২ মণ ১৬ সের ক'রে চাল হয়, তাহ'লে আরও প্রায় ৪৷৷৹ কোটি মণ চাল আমরা পেতে পারি। আমাদের ঘাটতি পূরণ হয়ে গিয়ে বাড়্তি হয়। যদি বাংলার মাটির লুপ্ত ফলনশক্তি আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি, অর্থাৎ প্রাক্-বৃটিশ যুগের মতো প্রতি একর জমিতে ২৪ মণ চাল ফলাতে পারি তাহ'লে আমাদের দ্বিগুণেরও বেশী বাড়্তি হতে পারে। আর যদি বাংলার মাটিতে ট্র্যাক্টর চলে, হাজার হাজার সমবায় কৃষি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে ওঠে, শত শত ট্র্যাক্টর স্টেশন প্রতিষ্ঠিত হয়, জমিদার-জোতদার-মহাজন-শ্রেণী বাংলার মাটি থেকে অবলুপ্ত হয়ে যায়, তাহ'লে যে বাংলাদেশে কি হ'তে পারে-না-পারে তা শুধু আমরা আজ কল্পনাই করতে পারি।[১৬]

কিন্তু তা হয়নি এবং হ'চ্ছেও না। তার বদলে বাংলাদেশে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দিচ্ছে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে

১৬ W. Burns তাঁর পূর্ব্বোল্লিখিত রিপোর্টের উপসংহারে একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে যেকোন কৃষি-পরিকল্পনায় আমাদের সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। তিনি বলেছেন: "In any planning of agriculture for the future, one inevitably turns to the great Soviet experiment." (Op. Cit: P. 127)

ওয়াদিয়া ও মার্চেন্টও তাঁদের পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে সোভিয়েট প্রথাই একমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রথা যা আমাদের দেশে প্রবর্তন করলে কৃষির বৈপ্লবিক প্রগতি সম্ভব হ'তে পারে।

বাংলায় ১০ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ লোক মারা যায়। বাংলাব জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ২২ জন ভাল খাবার পায়, ৩১ জন কোনরকমে বেঁচে থাকে। দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন বলেছেন যে দারিদ্র্য ও খাদ্যাভাব এদেশে এত বেশী যে জনসাধারণ খাদ্যের সামান্য অংশও দৈবদুর্য্যোগঘটিত অসময়েব জন্যে কোনমতেই সঞ্চয় ক'রে রাখতে পারে না। অথচ বাংলাদেশে যখন লক্ষ লক্ষ লোক খাদ্যাভাবে মারা গিয়েছে তখন চালের কাববাবীবা প্রায় ১৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত মুনাফা করেছে। এ কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল? হ'ল এই জন্যে যে বাংলার জমি জমিদারের, বাংলার কৃষকেব নয়। ফ্লাউড কমিশন তদন্ত ক'রে বলেন যে বাংলায় একবছরে প্রায় ১৪৩ কোটি টাকাব ফসল উৎপন্ন হয়। বর্গাচাষ হয় পাঁচভাগেব একভাগ জমিতে এবং ফসলের অর্দ্ধেক নেন জমিদারেরা, অর্থাৎ প্রায় ১৪½ কোটি টাকা। এই জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি। জমিব দখলীস্বত্ব থেকে চাষীদের বঞ্চিত ক'বে ইংরেজবা এ-দেশে নূতন এক জমিদাবশ্রেণী সৃষ্টি করলেন এবং তাদের সঙ্গে রাজস্ব সম্পর্কে একটা চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত ক'বে নিলেন। রাজস্বের পরিমাণ ঠিক হ'ল মোট প্রায় ৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। জমিদারেরা জমি নিয়ে যা খুশী কবতে পাবেন, কৃষকদের খাজনাও যথেচ্ছ বৃদ্ধি কবতে পারেন, শুধু বাৎসরিক নির্দ্দিষ্ট রাজস্বেব পরিমাণ সরকারেব হাতে তুলে দিলেই হ'ল। এই ব্যবস্থাব ফলে জমিব উপর দায়িত্বহীন মালিকের সংখ্যা গেল বেড়ে। এক খণ্ড জমিব উপব জমিদার, তালুকদার, গাঁতিদার, পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, জোতদার প্রভৃতি বহু মালিক পরগাছার মতো গজিয়ে উঠল। কোন কোন জায়গায় একখণ্ড জমির উপর মালিক আছে প্রায় ৩২ জন। এঁরা সকলেই জমির মালিক, কিন্তু আবাদের সঙ্গে এঁদের কোন সম্পর্ক নেই। চাষের দায়িত্ব চাষীর। চাষীর এ-দায়িত্ব পালন করার ক্ষমতা নেই। তার বাৎসরিক আয় মাত্র

৪৩৲ টাকা। এই আয় থেকে সে কি-ই বা খাবে, কি-ই বা জমির মালিকদের দেবে, আর কি দিয়েই বা চাষের খরচ বহন করবে? বাংলাদেশে মোট ২ কোটি ৯০ লক্ষ একর চাষের জমি আছে, তার মধ্যে গত দেড়শ' বছরের মধ্যে জমিদার-তালুকদার-জোতদারেরা মাত্র ১৭ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করেছেন এবং সরকার তাঁদের মোটা রাজস্ব থেকে করেছেন একলক্ষ একর জমিতে। অর্থাৎ ১৫০ বছরে সরকার ও জমিদারদের প্রচেষ্টায় আবাদী জমির মাত্র ১৭ ভাগের এক ভাগে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, নদীমাতৃকা বাংলাদেশ যে ধীরে ধীরে ভয়ঙ্কর মহাশ্মশানে পরিণত হবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে?

বাংলার এই বীভৎস মূর্ত্তি চিরদিন ছিল না। সেকালের রাজারা প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। পরগাছা মধ্যস্বত্বভোগীরা সেকালে সৃষ্টি হয়নি। প্রজার স্বত্ব ছিল জমিতে এবং সেই স্বত্ব থেকে প্রজাদের বঞ্চিত করার অধিকার কারও ছিল না। রাজা সেচের ব্যবস্থাও করতেন রাজকোষ থেকে। উৎপন্ন ফসলের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ রাজস্ব দিতে হ'ত। বাংলা ছিল সত্যিই সোনার বাংলা। মুসলমান বাদশাহ ও নবাবদের আমলেও আজকের মতো বাংলার এই শোচনীয় অবস্থা হয়নি। নবাবী আমলে প্রজাদের সাধারণতঃ দুইভাগে ভাগ করা হ'ত। প্রথম **'খোদ্‌কস্ত'** বা স্থায়ী রায়ত—যারা চিরকাল আপন পূর্ব্বপুরুষদের ভিটেয় বাস করত এবং উত্তরাধিকার সূত্রে জমির দখলীস্বত্ব ভোগ করত, চাষ আবাদ করত। দ্বিতীয় **'পাইকস্ত'** বা অস্থায়ী রায়ত—যারা ভিন্ন স্থান থেকে এসে চাষ আবাদের জন্যে জমি নিত। জমিতে তাদের কোন স্বত্ব না থাকলেও, বহুকাল জমিতে চাষ আবাদ করার ফলে তারা দখলীস্বত্ব উপভোগ করত। এই দুই শ্রেণীর প্রজার অধীনে থেকে যারা চাষ করত

তাদের বলা হ'ত 'কোরুফা' প্রজা। জমির উৎকর্ষ সাধনের জন্যে সেচের ব্যবস্থা, ভাল বীজ ও সারের ব্যবস্থা বাদশাহরা করতেন। বাংলার উপাধি ছিল তখন "জিন্নেৎ উল্ বেলাৎ" (মর্ত্ত্যে স্বর্গতুল্য)। সার্থক উপাধি স্বীকার করতেই হবে।[১৭] তারপর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা জমির উপর নূতন যে পরগাছা-শ্রেণীর সৃষ্টি করলেন, বাংলার মাটিতে যে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য-বোধহীন জমিদার-তালুকদার-পত্তনীদার-গাঁতিদার-জোতদারশ্রেণী গজিয়ে উঠল, তাতে 'সোনার বাংলা', 'জিন্নেৎ উল্ বেলাৎ' বাংলা ধীরে ধীরে মহাশ্মশানের ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ করল। সেচের অবনতি ঘটল, নদ-নদী হেজে-মজে গেল, পথঘাটে জঙ্গল হ'ল, চাষীর জমির স্বত্ব গেল, ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষীর সংখ্যা বাড়তে লাগল। বাংলায় আজ তাই দুর্ভিক্ষ, মহামারী, খাদ্যাভাব, রোগব্যাধি সব একে একে দেখা দিচ্ছে। এই হ'ল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধারাবাহিক অপকীর্ত্তির পরিচয়।

সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদে পার্থক্য এইখানে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের এই পার্থক্য আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়। সাম্রাজ্যবাদের ছবি দারিদ্র্যের ছবি, দুর্ভিক্ষের ছবি, জাতীয় অবনতি ও অপমৃত্যুর ছবি, লুণ্ঠন ও শোষণের ছবি। সমাজতন্ত্রের ছবি প্রাচুর্য্যের ছবি, ঐশ্বর্য্যের ও সম্পদের ছবি, জাতীয় প্রগতি ও পুনরুজ্জীবনের ছবি, সাম্য ও স্বাধীনতার ছবি।

প্রগতি ও প্রাচুর্য্যের পথে সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার অভিযানের কথা আমরা আগে বলেছি। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই ঐন্দ্রজালিক প্রগতি

---

১৭ শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় : মধ্যযুগে বাঙ্গলা (১৩৩০)
শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় : বাঙ্গলার ইতিহাস—নবাবী আমল (১৩১৫)
ভবানী সেন : ভাঙ্গনের মুখে বাংলা (১৯৪৫)
ভবানী সেন : মুক্তির পথে বাংলা (১৯৪৫)

ও প্রাচুর্য্য কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল তার ইতিহাসও আমরা বর্ণনা করেছি। দারিদ্র্য, অভাব ও অবনতির মূল সমাজের যে-স্তরে নিহিত, বল্‌শেভিক-বিপ্লবের পর সেই সামাজিক স্তর বিলুপ্ত ক'রে সেই মূল উপ্‌ড়ে ফেলা হয়। প্রথমে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূম্যধিকারীদের একেবারে নির্ম্মূল ক'রে ফেলা হয়। তাদের জমি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি সোভিয়েট সরকার বাজেয়াপ্ত ক'রে নিয়ে কৃষকদের বণ্টন ক'রে দেয়। ছোট ছোট জমির টুক্‌রো নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে কৃষাণদের চাষবাসের ব্যবস্থাও ধীরে ধীরে একেবারে বদলে ফেলা হয়। সমবায় কৃষি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে ওঠে এবং এক-একটি প্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার কৃষাণ পরিবার যোগদান করে। প্রথমে ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষীরা আসে, তারপর আসে মধ্য-শ্রেণীর কৃষকরা। সরকারী কৃষি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে সমবায়-প্রথায় চাষের উপকারিতা ও আবশ্যকতা কৃষাণদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। পুরাতন পদ্ধতিতে চাষ আবাদ না ক'রে, নূতন বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ-আবাদ আরম্ভ করা হয়। যন্ত্রপাতি ও ট্র্যাক্‌টর স্টেশন চারিদিকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে কৃষাণদের যন্ত্রের সাহায্যে আবাদ করার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। দেখতে দেখতে মধ্যএশিয়ার মাটির ফলনশক্তি দ্বিগুণ, তিনগুণ, চতুর্গুণ পর্য্যন্ত বেড়ে যায়।

জমিদার ও নানাশ্রেণীর ভূমির স্বত্বাধিকারীদের বিলুপ্ত ক'রে, সমবায় কৃষি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবাদ ক'রে গত পনের বছরের মধ্যে সোভিয়েট মধ্যএশিয়ার গ্রাম্য-সমাজের ছবি একেবারে বদলে ফেলা হয়েছে। হাজার হাজার একর জমি, পার্ব্বত্য ও প্রান্তর-ভূমি আজ আবাদী জমিতে পরিণত হয়েছে। বন্ধ্যা ও বোবা মাটি, উদাসীন ও রুক্ষ মরুভূমি, নিষ্ঠুর পার্ব্বত্য-ভূমি আজ নবজাত শস্যের কলরবে মুখর হয়ে উঠছে। আজ আর মধ্যএশিয়ায় জলের অভাব নেই,

সেচের শোচনীয় দুরবস্থাও নেই। নূতন নূতন খাল কেটে, বাঁধ তুলে, হ্রদ তৈরী ক'রে জলাভাব দূর করা হয়েছে। উজ্‌বেকিস্তানে দিজ্‌-কেত্‌-কেন্‌ খাল প্রায় ১৭৫,০০০ একর জমিতে জলসেচন করে। ১৭০ মাইল লম্বা সুদীর্ঘ ফর্গানা খাল উজ্‌বেকিস্তান ও তাজিকিস্তানের লক্ষ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন ক'রে তার বন্ধ্যতা ঘুচিয়েছে। কাতা-কুর্গান্‌ উপত্যকায় নূতন যে বাঁধ দেওয়া হয়েছে সম্প্রতি তাতে প্রায় ৫৫,৮০০,০০০ একর ফিট জল ফুলে উঠে নূতন একটি কৃত্রিম "উজ্‌বেক সাগর" তৈরী করবে। ১৯৪২ সালে যে উত্তর তাস্কেন্দ খাল কাটা হয়েছে তাতে প্রায় ১২০,০০০ একর নূতন জমিতে সেচের সুব্যবস্থা হবে। ১৯৩৯ সালের মধ্যে তাজিকিস্তানে প্রায় ১১২৫০ মাইল নূতন খাল কেটে ৩০০,০০০ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৯৪২ সালের মধ্যে আরও ৮০,০০০ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হবে ঠিক হয়। কির্‌গিজস্তানের চু-উপত্যকায় প্রায় ১ লক্ষ একর পতিত জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে চু-মিশ্‌ বাঁধ গঠন ক'রে। তুর্কমেনিস্তানে ভলুয়েভ্‌ ও বার্সিগ্‌-কার্কর খাল কাটা হয়, পুরাতন কাউস্যুত-বেণ্ট্‌স্কি খাল সংস্কার করা হয় এবং তাস্কেপ্রু বাঁধ গ'ড়ে তোলা হয়। তুর্কমেনদের বিভীষিকা হ'ল কারাকুম মরুভূমি। ভূবিজ্ঞানীরা বলেন যে পুরাকালে নাকি আমু-দরিয়া এই মরুর বুকের উপর দিয়ে ক্রাস্‌নোভোডস্কের কাছে ক্যাস্‌পিয়ান সাগরে গিয়ে মিশত। এখন আমু-দরিয়া আরল সাগরে গিয়ে মিশেছে। বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন, আমু-দরিয়ার পুরাতন সেই স্রোতধারা আবার ক্যাস্‌পিয়ান সাগর অভিমুখে ফিরিয়ে দেওয়া যায় কিনা। এ-প্রচেষ্টা আজও সম্পূর্ণ সফল হয়নি। যদি হয় তাহ'লে তুর্কমেনিস্তানে আবার নবজীবনের বান ডাকবে আমু-দরিয়ার কূলে কূলে। ইতিমধ্যে অবশ্য অন্য উপায়ে কারাকুম্‌ মরুভূমিকে বশ করার চেষ্টা করছেন

বিজ্ঞানীরা। কারাকুমের বহু শতাব্দীর ঘুম আজ বিজ্ঞানীর সোনার কাঠির স্পর্শে ভেঙেছে। মরুবুকে ফসল ফলছে। কেমন ক'রে? শুনলে অবাক হ'তে হয়। বিজ্ঞানীরা কারাকুম্ মরুর বুকে 'পরিখা-চাষের' (Trench Cultivation) ব্যবস্থা করেছেন। তাঁরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন, কারাকুমের শুক্নো বুকের অন্তঃস্থলের আবহাওয়ায় যে আদ্র'তা আছে তাতে জীবন ধারণ বেশ সম্ভব। কয়েক ফিট বালি খুঁড়ে কারাকুমের গহ্বরে প্রবেশ করলেই হ'ল। সেখানে কারাকুমের হৃদয় আজও শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়নি। মানুষের জন্যে নির্দ্দয় কারাকুম্ যে আজও ডালি ভ'রে ফসল দান করতে পারে তা কারাকুমের 'হৃৎপিণ্ডের' কাছাকাছি গেলেই বুঝতে পারা যায়। বিজ্ঞানীদের আহ্বানে তাই দলে দলে মরু-কৃষাণেরা ছুটে এল আধুনিক খন্তা, সাবল, কোদালি নিয়ে। দু'পাশ ঢালু ক'রে তারা কাবাকুমের বুকের উপর গভীর পরিখা কেটে তার মধ্যে কিছু ভাল মাটি নিয়ে এসে ফেলল। তারপর তারই উপর দিল শাক্-সবজী ও ফসলের বীজ ছড়িয়ে। কে বলে কারাকুমের ঘুম ভাঙে না, কারাকুম বন্ধ্যা? কারাকুমের বুকের গভীর অন্তঃস্থলে প্রচুর শাক সবজী ও ফসল ফলল।*

এইভাবে মধ্যএশিয়ায় আজ সোনা ফলছে। পতিত জমি আজ সেখানে নেই, মাটির বন্ধ্যতা আজ সেখানে ঘুচে গিয়েছে। বিজ্ঞানের সোনার কাঠির স্পর্শে, সমাজতন্ত্রের সঞ্জীবনী মন্ত্রে আজ মধ্যএশিয়ার গ্রাম নবজীবনের কলরবে মুখর হয়ে উঠেছে। গ্রাম ও নগরের ব্যবধান দ্রুত দূর হয়ে যাচ্ছে। আজ মধ্যএশিয়ার প্রত্যেকটি গ্রাম প্রাচুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের কেন্দ্র। বৈদ্যুতিক শক্তি, বৈদ্যুতিক আলো, টেলিগ্রাফ-টেলিফোন ও

* এই অধ্যায়ের উদ্ধৃতি, সংখ্যা ও তথ্যাদি সংগ্রহের নির্দেশ "গ্রন্থসূচীতে" সবিস্তারে দেওয়া হয়েছে।

"সোভিয়েট" আজ গ্রাম্য-সভ্যতাকে রূপান্তরিত করেছে। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক হাল্ডেন বলেছেন : "Human progress in historical time has been the progress of cities dragging a reluctant countryside in their wake". সোভিয়েট সমাজতন্ত্র আজ মধ্যএশিয়ার গ্রামীণ সভ্যতাকে প্রাগৈতিহাসিক নব্য-প্রস্তর যুগ থেকে তুলে এনে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। আর আমাদের সোনার ভারতবর্ষ, কবি ইক্‌বালের 'সারা দুনিয়ার সেরা আমাদের ভারতবর্ষ'—

আজ সাম্রাজ্যবাদের শোষণে ও পীড়নে গোরস্তানে পরিণত হয়েছে।

যন্ত্রের আহ্বান

সমরকন্দ-বোখারা-তাস্কেন্দ-আল্‌মাআতা-ফ্রুঞ্জ-স্টালিনাবাদ এখন সব মধ্যএশিয়ার আধুনিক মহানগরী। মধ্যযুগের গড়বন্দী বাদ্‌শাহী প্রাসাদ, বেগমখানা, মসজিদ, মাদ্রাসা, সরু সরু পথ, অলিগলি, নালা-নর্দমা আজ আর নেই। পুরাতন বাণিজ্য ও ব্যাধিকেন্দ্র, হাটবাজার, মেলা, ক্যারাভানসরাই, মুসাফিরখানা আজ অবলুপ্ত। আজ সেখানে বৈজ্ঞানিক যুগের ইস্পাত ও বৈদ্যুতিক শক্তির জয়স্তম্ভ বড় বড় মহানগরী সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী কবির স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে আজ সমরকন্দে, স্টালিনাবাদে। "এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে মিলন ঘটবে না কোনদিন"—সাম্রাজ্যবাদের কবি কিপ্‌লিঙের এ-বাণী আজ আর সত্য নয়। যাঁরা ভেবেছিলেন ইউরোপের নগর ও এশিয়ার গ্রাম, ইউরোপের কলকারখানা ও এশিয়ার ফসলক্ষেত, ইউরোপের বিদ্যুৎ ও এশিয়ার কেরোসিন, ইউরোপের ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, বিজ্ঞানী ও এশিয়ার

ভূতপ্রেত-ওঝা-মোল্লা-পুরোহিত—এদের মধ্যে মিলন ঘটবে না কোনদিন, চিরদিন এরা একই অবস্থায় অবিনশ্বর সত্যের মতো বিরাজ করবে, তাঁরা ভুল ভেবেছিলেন, দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের কোন অপরাধ নেই। ইউরোপ তখন সামন্তযুগ অনেক পিছনে ফেলে ধনতান্ত্রিক যুগে পদার্পণ করছে। বর্দ্ধিষ্ণু ধনতন্ত্র তখন বিশ্বব্যাপী আত্মপ্রসারের জন্যে ব্যাকুল। 'পুঁজিবাদ' তখন ধীরে ধীরে 'সাম্রাজ্যবাদে' রূপ পরিগ্রহ করছে। বহির্মুখী 'পুঁজিবাদের' দৃষ্টির সামনে দুটি বিরাট সমুদ্রপথের দুয়ার খুলে গেল। একটি আফ্রিকার ধার দিয়ে, উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে এশিয়ার পথ, আর একটি অতলান্তিকের বুকের উপর দিয়ে পশ্চিম দিকে উত্তর আমেরিকার পথ। এই দুই সমুদ্রপথে বাতাসে পাল তুলে অর্ণবপোতের অভিযান সুরু হ'ল। তখনও বাষ্পীয় পোতের যুগ আসে নি। প্রায় দেড় শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপের বৃটিশ, ফরাসী, ডাচ্, পর্তুগীজ ও স্প্যানিশ সাম্রাজ্যবাদীরা পৃথিবীর তিনটি মহাদেশে—এশিয়ায়, আফ্রিকায় ও আমেরিকায়—ঘাঁটি গেড়ে বসল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে এই সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ চলল, এবং তার ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদই ধীরে ধীরে প্রাধান্য লাভ করল। তারপর এল বাষ্পীয় শক্তির যুগ, বাষ্পীয় পোতের যুগ, শিল্পবিপ্লবের যুগ। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তের ব্যবধান অনেক ক'মে গেল। ১৮০০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্য তিনগুণ বেড়ে গেল, এবং ১৮৫০ থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যে আরও তিনগুণ বাড়ল।[১] এশিয়া ও আফ্রিকা হ'ল ইউরোপের কাঁচামাল সরবরাহের ঘাঁটি। এশিয়ার অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ মেদস্ফীত ধনতন্ত্রের দানবীয়

১ **Fabian Colonial Essays : Edited by Rita Hinden (1945 ed) : Pp. 36-50.**

ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে লাগল। এশিয়া সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেল। দারিদ্র্য, কুসংস্কার, ক্ষয়িষ্ণু গ্রাম্য সমাজ ও সভ্যতা নিয়ে এশিয়া প'ড়ে রইল পুরাতন প্রাগৈতিহাসিক যুগ ও মধ্যযুগের এক কোণে, আর ইউরোপের জয়যাত্রা সুরু হ'ল বৈজ্ঞানিক সভ্যতা ও সমৃদ্ধির পথে। তখনই সাম্রাজ্য-বাদের কবিরা ইউরোপ ও এশিয়ার চিরন্তন ব্যবধানের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁরা দেখেছিলেন প্রভুর দৃষ্টি দিয়ে, তাই ভেবেছিলেন ইউরোপ-এশিয়ার প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক বোধ হয় বাইবেলোক্ত শাশ্বত সত্য। কিন্তু তাঁদের সেই স্বপ্ন আজ সমরকন্দের পথের ধূলায় চূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

সমরকন্দ-তাস্কেন্দ-বোখারা আজ উজ্‌বেকিস্তানের আধুনিক নগর। আল্‌মা-আতা, ফ্রুঞ্জ, আস্‌খাবাদ আজ কাজাকস্তান, কিরগিজস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের নূতন রাজধানী। ডশাম্বেতে আজ আর প্রতি সোমবারে গ্রামের হাট বা মেলা বসে না। তারই পাশে তাজিকিস্তানের নূতন রাজধানী স্টালিনাবাদের কর্ম্মকোলাহল শোনা যায়। মুয়াজ্জানেরা আজও মসজিদের মিনার থেকে আজান হাঁকে, মোল্লারা আজও স্বাধীনভাবে চ'লে ফিরে বেড়ায়। কমিউনিস্টরা মসজিদ ধ্বংস করেনি, মোল্লাদেরও উচ্ছেদ করেনি। সোভিয়েট রাষ্ট্রের আদর্শ তা নয়। ধর্ম্মাচরণের ও ধর্ম্মপ্রচারের স্বাধীনতা যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির আছে, তেমনি ধর্ম্ম-বিরোধী প্রচারের স্বাধীনতাও সকলের আছে। ধর্ম্ম আজ সেখানে ব্যক্তিগত ব্যাপার। ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান আজ আর সেখানে শাসকশ্রেণীর তাঁবেদার নয়, ধর্ম্মবিশ্বাসীরাও শাসকদের হাতের খেলার পুতুল নয়। আজ তাই সোভিয়েট রাষ্ট্রের ক্রমোন্নতি ও নিরাপত্তা কামনা ক'রে মোল্লা-মৌলবীরা আল্লার কাছে তাদের প্রার্থনা জানায় এবং ধর্ম্মের ভয় দেখিয়ে জনসাধারণের উপর তারা প্রভুত্ব করতে চায় না। মধ্যএশিয়ায় 'ইসলাম ধর্ম্ম' আজ স্বেচ্ছাচারী আমীরের কবল থেকে মুক্ত। মোল্লাদের ব্যক্তি-

স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার যেমন কোন প্রয়োজন নেই আজ, তেমনি জনসাধারণের স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রায় মোল্লাদেরও বাধা দেবার কোন প্রবৃত্তি নেই। আজ 'শরীয়তের' বিধান যেহেতু স্বেচ্ছাচারী শাসকের মর্জ্জি অনুযায়ী বিকৃত হয় না, কোর্‌আন শরীফের আয়াত অজ্ঞ জনসাধারণকে বঞ্চিত ও বিপথচালিত করার জন্যে ব্যবহার করা হয় না, সেইজন্য সোভিয়েট মধ্যএশিয়ার মোল্লারাও স্বাধীন, মুসলমান জনসাধারণও স্বাধীন ও মুক্ত। আজ সমরকন্দ-বোখারা-তাস্কেন্দ-আস্‌খাবাদ-স্টালিনাবাদে মসজিদের মিনার থেকে মুয়াজ্জীনের আজান যেমন শোনা যায়, তেমনি শত শত কলকারখানা থেকে হাজার হাজার যন্ত্রের সমবেত কণ্ঠের আজান আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। মধ্য এশিয়ার লক্ষ লক্ষ মুসলমান শ্রমিকের ঘুম ভাঙে আজানের আহ্বানে। নূতন নূতন কলকারখানার চিম্‌নি-চূড়া তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। নূতন জীবনের আহ্বান। মসজিদে যারা যাবার তারা মসজিদে যায়, কিন্তু লক্ষ লক্ষ মুসলমান মজুরের নূতন জীবনের জয়যাত্রার পথে তারা অন্তরায় নয়। যন্ত্রের আজানে মুখর হয়ে ওঠে মধ্য এশিয়া। এতদিন পরে সত্যিই এশিয়ার ঘুম ভাঙল। ইউরোপ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, কান পেতে শোনে স্টালিনাবাদের কারখানায় কারখানায় যন্ত্র ও যন্ত্রীর নবযুগের আজানের ঐকতান। ভীত ও সন্ত্রস্ত "সাম্রাজ্যবাদ" গলিতনখদন্ত নিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে সমরকন্দ, স্টালিনাবাদের দিকে। কবি কিপ্‌লিঙের স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে যায় সমরকন্দের চিম্‌নি-চূড়ায়। ইউরোপ এসে হাত মেলায় এশিয়ার সঙ্গে। ইউরোপ মাথা হেঁট ক'রে থাকে এশিয়ার কাছে। ইউরোপের বিজ্ঞান, ইউরোপের যন্ত্র আজ এশিয়াও জয় করেছে। আজ তাস্কেন্দের উন্নতশির বড় বড় কলকারখানা সদম্ভে ইউরোপের কাছে এশিয়ার বৈজ্ঞানিক যুগের জয়বার্ত্তা ঘোষণা করতে পারে। আজ 'সমরকন্দ'

ইউরোপকে বলতে পারে : "পুরাতন জীর্ণ সভ্যতা বর্জ্জন ক'রে এগিয়ে এস আমার দিকে।" আজ তাজিকিস্তানের নগরাভিমুখী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম, তার সমবায় ও রাষ্ট্রীয় কৃষি প্রতিষ্ঠান, তার 'মেশিন্ ও ট্র্যাক্টর স্টেশন', তার শিশুসদন, হাসপাতাল ও শিক্ষানিকেতন, তার আধুনিক চাখানা, ক্লাব ও ক্রীড়াগার নিয়ে ইউরোপের হাজার হাজার গ্রামকে বিদ্রূপ করতে পারে, বলতে পারে : "আর কতদিন জীর্ণ, পরিত্যক্ত শতাব্দীর কবরের অন্ধকারে অমন ক'রে নিস্পন্দ শবের মতো অসাড় হয়ে প'ড়ে থাকবে? এবার তোমরা আমাদের দিকে এগিয়ে এস। তোমাদের নগর তোমাদের প্রতি উদাসীন। তোমাদের উপেক্ষা ক'রে, তোমাদের দূরে ঠেলে দিয়ে, তোমাদের মাটি ও মজ্জা শুষে, তোমাদের নগর প্রাণহীন যান্ত্রিক অগ্রগতির বড়াই করে। তোমাদের নগরের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা, বিক্ষুব্ধ জনতা, প্রাণঘাতী প্রতিযোগিতা ও অর্থলোলুপতা বিজ্ঞান ও যন্ত্রকে করেছে দানব, আর মানবকে করেছে যান্ত্রিক। যন্ত্রকে তোমরা জয় করো নি, যন্ত্র জয় করেছে তোমাদের। তোমাদের অহম্-সর্ব্বস্ব নগর তোমাদের সঙ্গে জীবনের এক দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। নগর ও গ্রামের বিচিত্র ঐকতান রচনা ক'রে তোমরা বিজ্ঞানের মর্য্যাদা দিতে পার নি। আমরা পেরেছি, তোমাদের উপেক্ষিত ও লুণ্ঠিত এশিয়া আজ পেরেছে। যন্ত্র আজ এশিয়াকে আত্মসাৎ করেনি, এশিয়ার মানুষ যন্ত্রকে করেছে ক্রীতদাস। এশিয়ার নগর, এশিয়ার কলকারখানা আজ এশিয়ার গ্রামকে উপেক্ষা ক'রে এগিয়ে যায় নি, গ্রামকে হাত ধ'রে তারা টেনে নিয়ে চলেছে নিজেদের বুকের কাছে। তার প্রমাণ চাও তো এসে দেখে যাও, এইখানে, ঠিক এশিয়ার বুকের উপর এই বোখারা, সমরকন্দ, তাস্কেন্দ, আস্খাবাদ, স্টালিনাবাদে, এই তুর্কমেনিস্তান, উজ্বেকিস্তান, কিরগিজস্তান, কাজাকস্তান, তাজিকিস্তানে। দেখবে, ইউরোপের মতো এশিয়ার গ্রাম

আজ উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত নয়। দেখবে, ইউরোপের মতো এশিয়ার নগর, এশিয়ার কলকারখানা, এশিয়ার যন্ত্র, এশিয়ার বিজ্ঞান আজ ধনতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত নয়, লুণ্ঠন শোষণ ও ধ্বংসের উন্মত্ততায় আত্মহারা নয়। দেখবে, সমাজতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত আজ এশিয়ার নগর। সমাজতান্ত্রিক সৃজনী-প্রতিভা ও গঠন-নৈপুণ্য দেখলে তোমরা মুগ্ধ হয়ে যাবে। তোমরা কিছুতেই একথা অস্বীকার করতে পারবে না যে আজ এশিয়া তোমাদের আত্মসর্ব্বস্ব ইউরোপকে এক শতাব্দী পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে।"

ইউরোপের নগর ও গ্রাম মাথা হেঁট ক'রে থাকে এশিয়ার কাছে। এশিয়ার হিমালয়, হিন্দুকুশ, থিয়েন্-শান্ হাসে, ইউরোপের আল্পস ও কার্পেথিয়ান্ মনে মনে ভাবে বিদ্রূপ। হিমালয় স্বপ্ন দেখে অতীতের, বর্ত্তমানের চড়াই-উৎরাই ডিঙিয়ে ভবিষ্যতের সোনালি উপত্যকার।

রুশ বিপ্লবে জারের সাম্রাজ্যবাদ ধূলিসাৎ হয়ে গেল। লুণ্ঠন ও শোষণের সাম্রাজ্যবাদী আদর্শও ধ্বংস হ'ল। বিপ্লবীরা নূতন সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হলেন। অগ্রগতির পথে তাঁদের অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হ'ল। সোভিয়েট রাষ্ট্র ভূমিষ্ঠ হবার পর ছোটবড় প্রায় দশটি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র একজোট হয়ে তাকে ধ্বংস করার জন্যে অভিযান করল। এই ঐতিহাসিক সঙ্কটের দিনে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট "সামরিক সাম্যবাদ" (War Communism) প্রবর্ত্তন করে। জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত নূতন সেনাবাহিনী ও দেশের বুভুক্ষু কৃষাণদের দাবী মেটাবার জন্যে গবর্ণমেণ্ট ছোট-বড়-মাঝারি শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে আয়ত্তে আনে। গোপন ও ব্যক্তিগত ব্যবসা বন্ধ ক'রে দিয়ে গবর্ণমেণ্ট প্রধান খাদ্যশস্যের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে। 'উদ্বৃত্ত বাজেয়াপ্ত প্রথা' প্রবর্ত্তন ক'রে কৃষকদের উৎপন্ন শস্যের উদ্বৃত্ত অংশ

গবর্ণমেণ্ট বাঁধা দামে কিনে নিয়ে শ্রমিক ও সৈন্যদের জন্যে সঞ্চয় করতে আরম্ভ করে। প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের জন্যে শ্রম বাধ্যতামূলক করা হয়। কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করে যে শ্রম না করলে আহার জুটবে না। শিশু সোভিয়েটের জীবন-মরণ সঙ্কটের দিনে এই যে সব সাময়িক নিয়ম-কানুন প্রবর্ত্তিত হয়েছিল, একে বলে 'সামরিক সাম্যবাদ'।

গৃহযুদ্ধ ও বাইরের শত্রুদের আক্রমণের পালা শেষ হয়ে গেল। শত্রুরা পরাজিত হয়ে যে যার ঘরে ফিরে গেল। কিন্তু এই যুদ্ধের ফলে শিশু সোভিয়েট রাষ্ট্রের নিদারুণ ক্ষতি হ'ল। ১৯২০ সালে উৎপন্ন খাদ্যশস্য জারের আমলের তুলনায় প্রায় অর্দ্ধেক ক'মে গেল। ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল চারিদিকে। কলকারখানা প্রায় অচল, কাঁচামালের ঘাটতি। খনি সব বন্যায় ভেসে গিয়েছে। কলকারখানাও অনেক জখম হয়ে গিয়েছে। লোহা ইস্পাত আগেকার তুলনায় শতকরা তিনভাগও আর উৎপন্ন হয় না। রাস্তাঘাট, যানবাহন চলাচলের পথ সব ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হয়েছে। সোভিয়েট ভূমিতে শ্মশানের শূন্যতা ও বিভীষিকা বিরাজ করছে। যুদ্ধ যতদিন চলেছে মজুর কৃষাণেরা ততদিন সোভিয়েট রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে প্রাণপণ সংগ্রাম করেছে, ব্যক্তিগত অভাব-অভিযোগের কথা তাদের মনেই হয়নি। যুদ্ধ শেষ হবার পর অভাবের চাপ অসহ্য হয়ে উঠল। কৃষকেরা ফসলের উদ্বৃত্ত অংশ আর দিতে চায় না। এমন কি সচেতন মজুরদেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। ক্ষুধার তাড়নায় মজুরেরা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। নূতন সোভিয়েট রাষ্ট্রের ভিৎ পর্য্যন্ত কেঁপে উঠল। এই সময় লেনিন বললেন যে যুদ্ধ-বিরতির পর যে নূতন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে 'সামরিক সাম্যবাদ' অচল। নূতন অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্ত্তন করা প্রয়োজন। ১৯২২ সালের মার্চ্চ মাসে দশম পার্টি কংগ্রেসে নূতন অর্থনৈতিক নীতি (New

Economic Policy অথবা 'N. E. P') প্রবর্ত্তন করা হয়। 'উদ্বৃত্ত বাজেয়াপ্ত প্রথা' তুলে দিয়ে উৎপন্ন শস্যের উপর 'কর' বসানো হয়। এই করের পরিমাণ অনেক কম। বলা হয় যে প্রত্যেক বৎসর চাষের আগেই কৃষকদের করের পরিমাণ জানিয়ে দেওয়া হবে। ব্যবসার স্বাধীনতার কথা ঘোষণা ক'রে লেনিন বললেন যে এই স্বাধীনতার সুযোগে গ্রামাঞ্চলে ধনতন্ত্রের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা থাকবে, কিন্তু তাহ'লেও এছাড়া গত্যন্তর নেই। স্বাধীনতা পেলে কৃষকেরা উৎসাহিত হয়ে উৎপাদন-বৃদ্ধির চেষ্টা করবে, কৃষির উন্নতি হবে, দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কট কেটে যাবে এবং বিধ্বস্ত সোভিয়েট রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে পুনর্গঠনের জন্যে শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে। লেনিনের কথাই সত্য হ'ল। এই নীতির ফলে মজুর ও কৃষকদের মধ্যে নূতন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল। মধ্যস্বত্বভোগী কৃষকরা কুলাক-বিরোধী সংগ্রামে এগিয়ে এল। দেশের উৎপাদন-সঙ্কট ও আর্থিক-সঙ্কট দূর হয়ে গেল।

এইবার সমাজতান্ত্রিক শিল্প-প্রসারের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হবার সময় এসেছে। পার্টির চতুর্দ্দশ কংগ্রেসে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হ'ল। যন্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা গড়তে হবে। শ্রমশিল্পের সর্ব্বাঙ্গীণ প্রসারের দিকে নজর দিতে হবে। শিল্পের প্রসার ও উন্নতি দুই উপায়ে সম্ভব। প্রথমতঃ, পুঁজিবাদীদের ব্যক্তিগত মালিকানা ও মুনাফার উপায়, সাম্রাজ্য-বাদীদের পররাজ্য লুণ্ঠন ও শোষণের উপায়। এই উপায়ে সমাজ-তান্ত্রিক দেশের পক্ষে শিল্প-প্রসারের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয় উপায় হ'ল নিজের দেশের সম্পদ ও সঙ্গতির উপর নির্ভর ক'রে শিল্প-প্রসারের পথে অগ্রসর হওয়া। এই দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করা ভিন্ন সোভিয়েট রাষ্ট্রের গতি নেই। পররাজ্য লুণ্ঠন ক'রে মূলধন বা কাঁচামাল সংগ্রহ করা সোভিয়েটের আদর্শ-বিরুদ্ধ। মূলধন ও কাঁচামাল

নিজের দেশ থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। কি উপায়ে করা সম্ভব? দেশের ধনিক ও জমিদারশ্রেণীর কবল থেকে কলকারখানা, জমি সব ছিনিয়ে নিয়ে, ব্যাঙ্ক, অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব নিয়ে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট তার লাভের অংশ দিয়ে কোন মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর মুনাফাবৃত্তি চরিতার্থ করেনি, তাকে শিল্পোন্নতির জন্যে নিয়োগ করেছে। এইভাবেই সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার কাজ সুরু হয়েছে সোভিয়েট দেশে।[২]

দেশের মুষ্টিমেয় একশ্রেণীর মেদস্ফীতির জন্যে বৃহত্তম জনসাধারণকে কঙ্কালে পরিণত করা এ-পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নয়। দেশের সামান্য একাংশের শিল্পোন্নতির জন্যে বৃহত্তর অংশের চরম দুর্গতি ও অবনতির পথ সুগম করাও সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার আদর্শ নয়। সমাজতান্ত্রিক শিল্প-পরিকল্পনা ব্যাপক ও সর্ব্বাঙ্গীণ। সমগ্র দেশের প্রত্যেক অংশ ও কেন্দ্রের সমান্তরাল প্রগতির দিকে লক্ষ্য রেখেই পরিকল্পনা রচনা করা হয়। সাম্রাজ্যবাদী রুশ জারের আমলে এরকম কোন ব্যাপক বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার অস্তিত্ব ছিল না। কোন সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষে এরকম পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়। সাম্রাজ্যবাদের জন্যে শোষণের ক্ষেত্র ও কেন্দ্র প্রয়োজন, কাঁচামালের ঘাঁটি প্রয়োজন, উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের বাজার প্রয়োজন এবং তার জন্যে অনুন্নত ও পরাধীন উপনিবেশের প্রয়োজন। সোভিয়েট রাষ্ট্রের এসব কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই। নিজের দেশের সম্পদ ও সঙ্গতির উপরেই তাকে নির্ভর করতে হবে এবং তার শিল্প-পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হবে জারের আমলের অনুন্নত দেশগুলির সর্ব্বাঙ্গীণ শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা করা।

জারের আমলের অনুন্নত পরাধীন উপনিবেশগুলির মধ্যে মধ্য এশিয়াই

---

২ **Short History of the C.P.S.U. (B) (Moscow Edition): Chaps 9, 10—Pp.248-299**

উল্লেখযোগ্য। মধ্য এশিয়ায় আধুনিক শ্রমশিল্পের কোন অস্তিত্বই ছিল না। মধ্য এশিয়ার কাঁচামাল মস্কো ও পেট্রোগ্রাদের কারখানায় চালান যেত। মধ্য এশিয়ার মজ্জা শুষে রুশ ধনিকগোষ্ঠী গলগণ্ডের মতো ফুলে ফেঁপে উঠত। রুশ জারের এই ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদী নীতি বাতিল ক'রে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট যে নূতন সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের নীতি গ্রহণ করল তাতে জারের আমলের এইসব অনুন্নত উপনিবেশগুলির উপরেই গুরুত্ব আরোপ করা হ'ল বেশী। উপনিবেশগুলি স্বাধীন প্রজাতন্ত্ররূপে শুধু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ কর্তৃত্বই যে পেল তা নয়, তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পথ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির সাহায্যে প্রশস্ত করা হ'ল। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে পার্থক্য এইখানে।

কি ভাবে এই সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের নীতি অনুন্নত দেশগুলির সমান্তরাল উন্নতির ও প্রগতির উদ্দেশ্যে কাজে পরিণত করা হয়েছে দেখা যাক। প্রথমে আমরা তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিজস্তান, কাজাকস্তান ও তুর্কমেনিস্তানে শ্রমশিল্পের প্রসার ও প্রগতির কথা আলোচনা করব,[৩] তারপর এই প্রগতির কারণ কি উল্লেখ করব।

তা জি কি স্তা ন

আমীর ও জারের আমলে তাজিকিস্তানে আধুনিক শ্রমশিল্পের কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত ছিল না। বর্ত্তমান তাজিকিস্তানের ৫৫,০০০ বর্গ মাইলের মধ্যে কোন যানবাহন চলাচলের ভাল রাস্তা পর্য্যন্ত ছিল না। কল-কারখানার অথবা ভাল পথঘাটের প্রয়োজন ছিল না জারের। যেখানে

---

৩ R.A. Davies & A.J. Steiger : Op. Cit : Ibid.
Leonard Barnes : Op. Cit
এ-ছাড়া তথ্য সংগ্রহের বিবরণ সবিস্তারে গ্রন্থশেষের গ্রন্থসূচীতে দেওয়া হয়েছে।

শ্রমশিল্পের অস্তিত্ব নেই, সেখানে পাহাড়-পর্ব্বত কেটে, নদনদী ডিঙিয়ে যানবাহন চলাচলের পথ তৈরী ক'রে লাভ কি? তাজিকদের তূলো ও অন্যান্য ফসল ঘোড়া-গাধা-উটের পিঠেই ব'য়ে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু সমাজতন্ত্রের আবির্ভাবে তাজিকিস্তানের কঙ্কালমূর্ত্তি জীবন্ত হয়ে উঠল, তাজিকিস্তানের প্রাকৃতিক রূপ পর্য্যন্ত বদলে গেল। স্টালিনাবাদ, লেনিনাবাদ প্রভৃতি নূতন নূতন সহর গ'ড়ে উঠল। খনি অঞ্চলেও অনেক নূতন নূতন নগরের প্রতিষ্ঠা হ'ল। স্টালিনবাদে আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত বড় বড় সিল্ক ও তূলোর কারখানা গ'ড়ে উঠল। লেনিনাবাদে বিরাট সিল্ক কারখানা দৈত্যের মতো গর্জ্জন ক'রে উঠল। জারাফ্শান্ উপত্যকায় নানারকমের ফলের প্যাকিং কারখানা, তূলোর কল, কাপড়ের কল, আটার কল, চামড়ার কল, বেকারী, অজস্র চিম্‌নি মাথা তুলে দাঁড়াল চারিদিকে। ১৯৪০ সালে প্রকাণ্ড একটি 'বিস্‌মাথ কম্‌বাইন' গ'ড়ে উঠল। নেফ্তি-আবাদ ও কে-আই-এম্-এ তেলের খনির সন্ধান পাওয়া গেল। দেখতে দেখতে এখানে 'নেফ্তি-আবাদ' বা তৈল-নগরও গ'ড়ে উঠল। একমাত্র কে-আই-এম্ খনি থেকেই ১৯৩৮ সালে ৩০,০০০ টন পেট্রল পাওয়া গেল। খনিজ ও নানা ধাতুর সন্ধানে ভূবিজ্ঞানীরা চারিদিকে যাত্রা করলেন, সুদূর পাহাড়ের কোল পর্য্যন্ত। তাজিক মেষপালকদের পর্য্যন্ত তাঁরা শিখিয়ে দিলেন কি ক'রে খনিজ চিনতে হয়। পাহাড়ের কোলে কোলে তাজিক রাখালেরা ঘুরে বেড়ায় ভেড়ার পাল নিয়ে, কতরকমের খনিজের সঙ্গে হয়ত হঠাৎ তাদের সাক্ষাৎ হয়। যদি তারা 'খনিজ' চিনতে শেখে তাহ'লে ভূবিজ্ঞানীর কাছে তারা মহানন্দে সংবাদটি এনে দিতে পারে। এইভাবে অনেক তাজিক রাখাল ভূবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে খনিজ-যাচাইয়ের প্রাথমিক শিক্ষা পেয়ে তাজিকিস্তানের ভূগর্ভস্থ মণিরত্নের সন্ধান এনে দিয়েছে

ভূবিজ্ঞানীদের গবেষণাগারে। অনেক আয়স (Ferrous) ও অনায়স (Non-Ferrous) ধাতুর খোঁজ দিয়েছে তারা। তুষারশুভ্র পামিরের কারা-মুর্জা গিরিশ্রেণী এতদিন পৃথিবীর সোনা ও রূপোর কেন্দ্রস্থল ব'লে পরিচিত ছিল। আজ সেখানে নূতন বিস্‌মাথ, আর্সেনিক্‌, টংস্টেন্‌ ও দিস্তার খনি খোঁড়া হয়েছে। জারাফ্‌শান্‌ উপত্যকার বুক চিরে রাং, দিস্তা, সোনা, রূপো, ইউরোনিয়াম্‌, রেডিয়াম্‌ প্রভৃতি আবিষ্কার করা হয়েছে।

শিল্পোন্নতির জন্যে প্রাকৃতিক শক্তি নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। তাজিকিস্তানের দরিয়াগুলির বারিসম্পদ প্রায় ৩ কোটি অশ্বশক্তির সমান বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত করতে পারে। আমীর বা জারের এদিকে কোন লক্ষ্যই ছিল না। জল এতদিন জলই ছিল শুধু। ১৯৪১ সালের মধ্যে দরিয়ার তীরে তীরে এই জল থেকে শক্তি সঞ্চারের জন্যে প্রায় ৫৭টি বৈদ্যুতিক শক্তিকেন্দ্র গ'ড়ে তোলা হ'ল, তার মধ্যে ভার্সবষ্ট্রয়, গার্ম, খোড়গ্‌, ভাখ্‌সষ্ট্রয় প্রধান। বৈদ্যুতিক স্টেশনের সঙ্গে সঙ্গে যানবাহন চলাচলের রেলপথ, মোটরপথ ও আকাশপথে ছেয়ে গেল চারিদিক। তুর্ক-সাইবেরিয়ান রেলপথের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হ'ল তাজিকদের আর্থিক জীবনের এবং তাজিকিস্তানের কয়েকটি রেলপথ শাখাপ্রশাখার মতো এসে মিশল এই বিরাট রেলপথে। উজ্‌বেক ও তুর্কমেন প্রজাতন্ত্রের ভিতর দিয়ে ক্যাস্‌পিয়ান সাগরের তীরে গিয়ে শেষ হয়েছে যে ট্রান্‌স-ক্যাস্‌পিয়ান রেলপথ, তারও একটা শাখাপথ প্রসারিত করা হ'ল তাজিকিস্তানের ভিতর পর্য্যন্ত। এইভাবে তাজিকিস্তানের সঙ্গে সমগ্র মধ্য এশিয়ার, এমন কি বিশাল সোভিয়েট ইউনিয়নের পর্য্যন্ত, সম্পর্ক স্থাপন করা হ'ল। একটি দেহের নানা শিরা-উপশিরার মতো অতি অল্প দিনের মধ্যে তাজিক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে পাহাড় কেটে, নদী

ডিঙিয়ে প্রায় ৪০০০ মাইল নূতন পথ তৈরী করা হ'ল। কেউ আর বিচ্ছিন্ন বা উপেক্ষিত হয়ে এককোণে প'ড়ে রইল না, কোন নগর বা কোন গ্রাম, কোন কলকারখানা বা কোন সমবায় কৃষিপ্রতিষ্ঠান। ১৯৩৯ সালে সংখ্যাবিজ্ঞানীরা হিসেব ক'রে দেখলেন যে ১৯১৩ সালের তুলনায় তাজিকিস্তানে প্রায় ১৯'৫ গুণ শিল্পোন্নতি হয়েছে। এ কিন্তু ভেল্‌কি নয়। সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের ধ্বংসস্তূপের উপর সমাজতন্ত্রের প্রসার ও প্রভাব এইভাবে প্রচণ্ড গতিতেই হয়ে থাকে।

উজ্‌বেকিস্তান

উজ্‌বেকিস্তানের প্রাচীন সহরগুলি আজ আর বাজার, মসজিদ, মাদ্রাসা, মুসাফিরখানার জন্যে বিখ্যাত নয়। সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন ও পুনর্গঠনের ফলে আজ সমরকন্দ, বোখারা, তাস্কেন্দের রূপ একেবারে বদ্‌লে গিয়েছে। তাস্কেন্দের কথাই বলি। তাস্কেন্দ আজ উজ্‌বেকিস্তানের রাজধানী। বিরাট বিরাট কলকারখানা তাস্কেন্দের চারিদিকে আজ গ'ড়ে উঠেছে। তাস্কেন্দের 'স্টালিন টেক্সটাইল কম্‌বাইন্‌' আজ সোভিয়েট ইউনিয়নের বড় বড় কাপড়ের কলগুলির মধ্যে অন্যতম। প্রায় ৭ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার খরচ ক'রে গড়ে তোলা হয় এবং প্রতি বছরে প্রায় ৬ কোটি ৫০ লক্ষ গজ কাপড় এই কারখানা থেকে তৈরী হয়। "ভোরোশিলভ্‌ এগ্রিকাল্‌চারাল মেশিনারী ওয়ার্কস্‌" তাস্কেন্দের আর একটি বিরাট কারখানা। এই কারখানায় ট্র্যাক্‌টর, হার্ভেষ্টর প্রভৃতি নানারকমের কৃষিযন্ত্র তৈরী হয়। যুদ্ধের সময় এখানে ট্যাঙ্ক ও আর্টি-লারীও তৈরী হয়েছে। এ-ছাড়া তাস্কেন্দে ছোট ছোট আরও অনেক কলকারখানা আছে। তুলো ও ফলের জন্যে বিখ্যাত ফর্গানা উজ্‌বেকি-স্তানের আর একটি সহর। এখানে বড় বড় তুলোর কল, ফল প্যাকিং-এর

কারখানা সব গ'ড়ে উঠেছে। এই সব নগর ও কলকারখানা ছাড়াও উজ্‌বেকিস্তানে তেল-কয়লার নিদারুণ অভাব ছিল। শুধু তুলো নয়, আজ নানারকমের খনিজ সম্পদের জন্যেও উজ্‌বেকিস্তান বিখ্যাত। ভূবিজ্ঞানীদের কঠোর গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে আজ রত্নগর্ভা উজ্‌বেকিস্তান তার ভূগর্ভ থেকে বহু মূল্যবান মণিরত্ন ও খনিজ উজাড় ক'রে দিচ্ছে উজ্‌বেকদের। কয়লা ও তেলের উৎপাদন দিন দিন বেড়েই চলেছে। ১৯৩৮ সালে উজ্‌বেকিস্তানের নূতন খনি থেকে প্রায় ৭০০,০০০ টন তেল উৎপন্ন হয়। ফর্গানা উপত্যকার শোর্‌-সু ও ইয়ার-কুর্গানে, বোখারা ও দক্ষিণ উজ্‌বেকিস্তানে, শিরাবাদ ও দক্ষিণ সমরকন্দে অনেক নূতন নূতন তেলের খনি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং কয়েকটি খনির কাজ ইতি-মধ্যেই চালু করা হয়েছে। তেলের উৎপাদন আজ যে ১৯৩৮ সালের তুলনায় কতগুণ বেড়েছে তার ঠিক নেই। কারণ ১৯৪২ সালের মোট উৎপাদন ১৯৪১-এর ২১½ গুণ বেশী হবে ব'লে ঘোষণা করা হয়েছিল। সুতরাং বর্ত্তমানে উজ্‌বেকিস্তান যে সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার মধ্যে অন্যতম খনিজ তেলের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। উজ্‌বেকিস্তানের কয়লার খনিগুলি নূতন হ'লেও ভূবিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান ক'রে দেখেছেন যে জারাফ্‌শানের খনিতে প্রায় ১৫০,০০০,০০০ টন কয়লা মজুত আছে। কুগিতাই ও শোরসুর খনিতে ইতিমধ্যে কয়লা তোলার কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। তাস্কেন্দের কাছে আল্‌মালিকে যে বিরাট তামা পরিশোধনের কারখানা আছে তাতে প্রতি বছরে প্রায় ৭৫,০০০ টন খনিজ তামা পরিশোধন করা হয়ে থাকে। সুরাবের কাছে ভূবিজ্ঞানীরা কোটি কোটি টন্ লিগ্‌নাইটের + (Lignite) সন্ধান পেয়েছেন

+ উদ্‌ভিদের শেষ পরিণতি পাথুরে কয়লা, কিন্তু তারও প্রকারভেদ আছে। লিগ্‌নাইট এক রকমের ব্রাউন্ কয়লা। লিগ্‌নাইটকে কয়লার অর্দ্ধ-পরিণত রূপও

এবং সেখানে খনির কাজ রীতিমত সুরু হয়েছে। নূতন লোহা ও ইস্পাতের বিরাট কারখানাও এই যুদ্ধের মধ্যে উজ্‌বেকিস্তানে তৈরী করা হয়েছে। চিরচিক্ নদীর তীরে যে বিশাল কারখানা গ'ড়ে উঠেছে তার নাম 'চিরচিক্‌স্ট্রয়'। এখানে কয়েকটি বড় বড় বারি-বিদ্যুতের স্টেশন (Hydro-Electric Station), নাইট্রোজেন সার তৈরীর কারখানা এবং একটি কেমিক্যাল্ ওয়ার্কস্ আছে। এত বড় কারখানা গোটা সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যেই খুব কম আছে। ১৯৩২ সালে এই কারখানা তৈরীর কাজ আরম্ভ হয়, ১৯৪০ সালে কারখানা আংশিকভাবে চালু হয়, এবং ১৯৪১ সালে কারখানা নির্ম্মাণ শেষ হয়।

শিল্পায়নের সঙ্গে উজ্‌বেকিস্তানের বৈদ্যুতিক শক্তির প্রসারও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা উচিত। প্রায় ৬০টি বৈদ্যুতিক শক্তিকেন্দ্র থেকে আজ উজ্‌বেকিস্তানের বৈদ্যা।তক শক্তি সরবরাহ করা হয় এবং তার পরিমাণ ১৯৩৭ সালেই ছিল ২৭৬,২০০,০০০ কিল্-ওয়াট। চিরচিক্ নদীর তীরে যে নূতন বৈদ্যুতিক স্টেশন গ'ড়ে উঠেছে সেখান থেকে প্রায় ২৭০,০০০ কিল্-ওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি সেখানকার কারাখানাগুলিতে সরবরাহ করা হয়। ১৯৩৮ সালের হিসেবে দেখা যায় যে ১৯১৩ সালের তুলনায় উজ্‌বেকিস্তানের শ্রমশিল্পের প্রসার প্রায় ৬ গুণ বেড়েছে এবং শুধু উজ্‌বেকিস্তানের উৎপাদনই তুরস্ক, ইরান ও আফগানিস্তানের মোট উৎপাদনকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের শিল্প-প্রগতির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে উজ্‌বেকিস্তান, মধ্যযুগ থেকে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগের দিকে।

বলা চলে। সাধারণ কয়লার তুলনায় এতে কার্বনের ভাগ কম এবং অক্সিজেনের ভাগ বেশী। আমাদের ভারতবর্ষের পাঞ্জাব, বিকানির প্রভৃতি স্থানে লিগ্‌নাইট পাওয়া যায়।

তুর্কমেনিস্তান

প্রাকৃতিক সম্পদ তুর্কমেনিস্তানেরও অফুরন্ত হ'লে কি হবে, কে সেই সম্পদকে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণের জন্যে কাজে লাগাবে? আমীর ও তাঁর দেওয়ান-মোল্লা-মোসাহেবরা? জারের কর্ম্মচারীরা? তা কখনই সম্ভব নয়। তা যদি হ'ত তাহ'লে ভারতের অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ থাকতে ভারতের "দারিদ্র্য" আজ সারা দুনিয়ায় চল্‌তি প্রবাদে পরিণত হ'ত না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসনের ফলে তাই হয়। তুর্কমেনিস্তানেও তাই হয়েছিল। প্রায় ৭০০০ বর্গ মাইল জুড়ে তুর্কমেনিস্তানের কারা-বোগাজ্-গল্ উপসাগর সোডিয়াম্ সাল্‌ফেটের বিরাট কেন্দ্র। এই উপসাগরের জলে লবণের পরিমাণ ক্যাস্‌পিয়ানের জলের চাইতে প্রায় বিশগুণ বেশী। এখানে আগে জন-মানবের কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত ছিল না। বাষ্প হয়ে লবণ এসে জমে' যেত তীরে এই উপসাগরের জল থেকে। অথচ এই লবণ রঞ্জন-শিল্প, কাচ শিল্প, কাগজ তৈরী, ধাতু গলানোর জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আজ এই উপসাগরের তীরে হাজার হাজার বাষ্পীয় কোদালি চলছে, তীর থেকে জমাট-বাঁধা লবণের চাঁই তুলে এনে বোঝাই করা হ'চ্ছে ট্রাকে। হাজার হাজার ট্রাক সেই লবণের বোঝা নিয়ে গিয়ে উজাড় ক'রে দিচ্ছে কাছে একটি কেমিক্যাল্ কারখানায়। তারপর হাজার হাজার শ্রমিক, কেমিস্ট, ইঞ্জিনিয়ার তাকে প্রয়োজনীয় 'কেমিক্যালে' রূপান্তরিত করছে নানারকমের শিল্পের জন্যে। আর এই উপসাগরের তীরে বালুতটের উপর গ'ড়ে উঠেছে নূতন একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আলোয় আলোকিত নগর, মানুষের কলরবে মুখর, কারখানার যন্ত্রের গর্জ্জনে রাতদিন প্রতিধ্বনিত। এমনি আরও সব কলকারখানা ও নগর গ'ড়ে উঠেছে তুর্কমেনিস্তানের বুকের

উপর, যেখানে আমীর ও জারের আমলে ঘূর্ণীবাত্যার বুকফাটা আর্ত্তনাদ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাওয়া যেত না। ধূ ধূ করত দিগন্তলীন মরুভূমি আর ক্যারাভানের নির্জ্জন, নির্ম্মম, উদাসীন পথ। আজ সেখানে নূতন নগর ও কারখানা গ'ড়ে উঠেছে। যেমন কারাকুম্ মরুর বুকের উপর বিরাট এক গন্ধকের কারখানা গ'ড়ে উঠেছে, আর তাকে কেন্দ্র ক'রে একটি ছোট্ট ঝক্‌ঝকে নগর, যেখানে একদিন ক্লান্ত ক্যারভানের শ্রান্ত উটেরা বিশ্রাম করত, তারপর আবার মরুবালু উড়িয়ে যাত্রা করত কাজাকস্তানের বাজারের দিকে এবং পথের আশেপাশে কোন জীবন্ত প্রাণীর সাড়াশব্দ পর্য্যন্ত ছিল না। আর আজ? আজ এখানকার গন্ধকের কারখানা থেকে ১৫৫ মাইল লম্বা প্রকাণ্ড এক শান্-বাঁধানো রাস্তা সোজা চ'লে গিয়েছে তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী আস্‌খাবাদে। মোটর-ট্রাক্-লরী-গাড়ী সব এক নিশ্বাসে, উর্ধ্বশ্বাসে কারখানা থেকে রাজধানী পর্য্যন্ত দৌড়ে যায় আর আসে। সোভিয়েট ইউনিয়নের আর কোথাও নাকি এতবড় শান্-বাঁধানো সড়ক একটানা তৈরী করার প্রয়োজন হয়নি আজ পর্য্যন্ত।

তুর্কমেনিস্তানের সর্ব্বাঙ্গীণ জাতীয় শিল্পায়নের জন্যে ১৯২৮ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রায় ১০০ কোটি রুব্‌ল মূলধন নিয়োগ করা হয়। এই মূলধনের সাহায্যে বড় বড় গুরুশিল্পের কারখানা গ'ড়ে তোলা হয় তুর্কমেনিস্তানে। আমু-দরিয়ার চার্জৌ বন্দরে এবং ক্যাস্‌পিয়ানের ক্র্যাস্‌নোভোডস্ক বন্দরে বিরাট বিরাট জাহাজ নির্ম্মাণের কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। বড় বড় সিল্ক, কাপড় ও পশমের কল, কাচ ও সিমেন্টের কারখানা, যন্ত্রের কারখানা আস্‌খাবাদে গ'ড়ে ওঠে। তেল ও কয়লার অনেক নূতন খনি খোঁড়া হয়। যান-বাহনের পথের দিক থেকে ট্রান্‌স-ক্যাস্‌পিয়ান রেলপথ নূতন ক'রে

প্রসারিত করা হয়, তাস্কেন্দ পর্য্যন্ত ডবল লাইন গিয়ে গিয়ে আরও অনেক শাখাপথও খোলা হয়। এ-ছাড়া আরও একটি নূতন রেলপথ তুর্কমেনিস্তান থেকে ইরান পর্য্যন্ত ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে যাবার কথা। সম্প্রতি এক সংবাদে প্রকাশ যে আরও একটি ১০৮৫ মাইল লম্বা রেলপথ আমু-দরিয়ার চার্জৌ বন্দর থেকে তৈরী করা হ'চ্ছে, কোথায় কোন্‌খানে গিয়ে এ-পথের শেষ হবে তা আজও সঠিক জানা যায়নি। এই রেলপথের সঙ্গে ক্যাস্‌পিয়ানের জলপথ, ক্র্যাস্‌নোভোডস্ক, বাকু ও আস্ত্রাখানের বাষ্পীয় পোতের পথও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কারণেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েটের মধ্যে তুর্কমেনিস্তানের গুরুত্ব অত্যন্ত বেড়েছিল। এ-ছাড়া ইরান ও বেলুচিস্তান ঘুরে যে সুদীর্ঘ স্থলপথ ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত এসেছে তারই মধ্যে একটি বড় জংশন হ'ল তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী আস্‌খাবাদ।

কিরগিজস্তান

কিরগিজস্তানের আদিম যাযাবর অধিবাসীদের মধ্যে একটা প্রাচীন লোককথা প্রচলিত আছে যে কিরগিজস্তানই হ'ল মানবের আদি বাসস্থান। কথাটা লোককথা হ'লেও ফেলনা নয়, কারণ নৃবিজ্ঞানী ও প্রত্নবিদদের মধ্যে অনেকেই আজ স্বীকার করেন যে মধ্য এশিয়াই হ'ল মানবসভ্যতার জন্মভূমি। সে যাই হ'ক—কিরগিজদের লোককথার কথাই বলি। আদি মানব 'আদম' স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে নাকি কিরগিজস্তানে এসে 'ওশ্‌' সহর তৈরী করেন। 'আদম' অবশ্য সঙ্গে ক'রে গোটা দশ গুটি পোকা আনতে ভোলেননি। এই দশটি গুটিপোকা অনর্গল সূতো কাটল এবং সেই সূতো থেকে যে সিল্কের কাপড় তৈরী হ'ল তাই জড়িয়ে আদিপুরুষ 'আদম' তাঁর নগ্নতা ঢেকে সভ্য হলেন।

আর সেই সময় থেকেই তো 'ওশ্' নগরে রেশম শিল্পের পত্তন হ'ল। অন্ততঃ কিরগিজদের তাই বিশ্বাস। কথাটা খানিকটা সত্যি বৈ কি! কিরগিজরা গুটিপোকার চাষ এবং রেশমের ব্যবসা বহুকাল ধ'রে ক'রে আসছে। থলিভর্ত্তি গুটিপোকা মেয়েরা বুকে ঝুলিয়ে রাখত। বারদিন এইভাবে ঝুলিয়ে রাখলে গুটিপোকাগুলি সুতোর আঁশে পরিপুষ্ট হ'ত। এইসব অনেক কাহিনী। শুধু তাই নয়, আগের কালে মক্কার পর বোধ হয় "ওশ্" নগরীই ছিল মুসলমানদের প্রধান তীর্থস্থান। নগরীর পাশে পাহাড়ের চূড়ায় দেখা যেত রামধনু রঙের "তখ্‌ৎ-ই-সুলেমান্" বা সুলেমানের সিংহাসন। যে পর্ব্বতচূড়ায় এককালে রামধনুরঙের তখ্‌ৎ-ই-সুলেমান্-এর উদয় হ'ত পুণ্যার্থী মোল্লাদের দৃষ্টিপথে, আজ সেই পর্ব্বতেরই পাদদেশে বিরাট রেশমের কারখানা গ'ড়ে উঠেছে। "ওশ্" এখন আধুনিক মহানগরী বিশেষ। কিরগিজ মেয়েরা এখন আর বুকে ক'রে গুটিপোকায় তা দেয় না। আজ তারা নিজেরাই সব জ্ঞানী গুণী আধুনিক রেশম-বিশারদ। শুধু রেশম কেন, কিরগিজস্তানের পাহাড়ে পাওয়া যায় না এমন খুব অল্পই প্রাকৃতিক উপাদান ও সম্পদ পৃথিবীতে আছে। অথচ এত সম্পদের মালিক হয়েও তার সন্ধান পায়নি, ত ভোগ করতে পারেনি কিরগিজরা। যুগ যুগ ধ'রে অত্যাচারী শাসকের অবজ্ঞার বোঝা মাথায় নিয়ে এই কিরগিজরা পাহাড়ের কোলে কোলে অসভ্য যাযাবর জীবন যাপন করেছে। প্রকৃতির বিরানব্বইটি মৌলিক উপাদানের মধ্যে বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই প্রায় ষাটটি উপাদানের হদিস্ পেয়েছেন কিরগিজস্তানে। শুধু হদিস্ মাত্র নয়, এত প্রচুর পরিমাণে এইসব উপাদান মজুত আছে এখানে যে শিল্প-বাণিজ্যের জন্যে রীতিমতভাবে তা ব্যবহার করা যায়। কিরগিজস্তানের পাহাড়ের কোলে কোলে আজ লবণ, অভ্র, রাং, এণ্টিমনি, সীসা ও সোনার খনি

খোঁড়া হয়েছে। দুর্লভ 'ইণ্ডিয়াম্‌ও' প্রচুর পরিমাণে আজ এখানকার 'মৈলি-সুর' খনি থেকে টেনে তোলা হ'চ্ছে। অভ্র ও এ্যাণ্টিমনির কারখানাও তৈরী করা হয়েছে। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে প্রায় ৬ কোটি ডলার মূলধন নিয়োগ করা হ'য়েছে এইসব কল-কারখানা ও শিল্পবাণিজ্য গ'ড়ে তোলার জন্যে। অনেক নূতন কয়লার খনি খোঁড়া হয়েছে। কির্‌গিজস্তানে এত প্রচুর পরিমাণে কয়লা পাওয়া যায় যে এই অঞ্চলকে মধ্যএশিয়ার "stokehole" বলা হয়ে থাকে। ১৯৩৬ সালে ১,০০০,০০০ টন্ কয়লা মোট সব খনি থেকে তোলা হয়। এখন প্রায় ২,০০০,০০০ টন্ কয়লা তোলা হয়ে থাকে। ১৯৪০ সালের শেষের দিকে আংরেনে প্রায় ১৪৭ ফিট গভীর এবং ১৫০-২২৫ ফিট চওড়া কয়লার একটা শিরার সন্ধান পাওয়া যায়। হাজার হাজার খনিমজুর আজ এখানকার নূতন কয়লাখনিতে কাজ করে। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যান্য প্রজাতন্ত্র থেকে মধ্য এশিয়ায় কয়লা আমদানি করতে হ'ত। আজ আর তা করতে হয় না। আজ প্রয়োজন হ'লে মধ্য এশিয়াই অন্যান্য ঘাটতি অঞ্চলে কয়লা সরবরাহ করতে পারে।

মধ্য এশিয়ার অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের মতো কির্‌গিজস্তানেরও সর্ব্বাঙ্গীণ শিল্পায়নের পথে প্রধান বাধা ছিল যানবাহনের পথের অভাব-অসুবিধা। আজ আর সে-অভাব ও অসুবিধা নেই। তুর্ক-সাইবেরিয়ান্ এবং অন্যান্য রেলপথ 'ওশ্‌' ও জালালাবাদ পর্য্যন্ত প্রসারিত করা হয়েছে, এবং ক্যাণ্ট্ থেকে ইসিক্-কুল্ হ্রদের তীর পর্য্যন্ত আর একটি রেলপথ নূতন তৈরী করা হয়েছে। কির্‌গিজস্তানের রাজধানী ফ্রুঞ্জ থেকে তোক্‌মাক্-রাইবাচি পর্য্যন্ত, সেখান থেকে দক্ষিণে নারিন্‌স্ক এবং থিয়েন্-শান পর্ব্বতমালার ভিতর দিয়ে চীনের সিন্‌কিয়াং প্রদেশের কাশগর পর্য্যন্ত প্রশস্ত মোটরপথ তৈরী করা হয়েছে। এ-ছাড়া ওশ্-খোড়গ্, ফ্রুঞ্জ-জালালাবাদ, ফ্রুঞ্জ-ওশ্

মোটরপথও নূতন তৈরী করা হয়েছে, নগরের সঙ্গে নগরের এবং কারখানার সঙ্গে কারখানার সংযোগ রক্ষার জন্যে। এই যানবাহনের উন্নতির ফলে বৈদ্যুতিক শক্তিবৃদ্ধিও হয়েছে অসাধারণ। প্রায় ১৭টি বৈদ্যুতিক স্টেশন থেকে কিরগিজস্তানের কলকারখানায় ৩০,০০০,০০০ কিল্‌-ওয়াট্‌ বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা হয়ে থাকে আজকাল। কিরগিজরা আজ আর সেই আদমের যুগের আদিম অসভ্য কিরগিজ নেই। তারা আজ আধুনিক, সুসভ্য, সুশিক্ষিত কিরগিজ।

কা জা ক স্তা ন

১০,৫৯৮০০ বর্গ মাইল ব্যাপী বিশাল কাজাকস্তানকে তুলে এনে যদি আমাদের এই ভারতবর্ষের উপর বসিয়ে দেওয়া যায়, তাহ'লে মাত্র ১৭,০০০ বর্গ মাইলের একটা ছোট ভূখণ্ড ছাড়া গোটা ভারতবর্ষটাই ঢেকে যাবে। যদি কোন পরিব্রাজক এই বিশাল দেশটি দেখতে চান তাহ'লে তিনি দেখবেন একদিকে দুর্লঙ্ঘ্য গিরিশ্রেণীর অনন্ত ওঠা-নামা, একদিকে 'ষ্টেপী' বা তৃণগুল্মহীন বিবর্ণ প্রান্তরের দিগন্তব্যাপী বিস্তার, আর একদিকে সীমাহীন, ধূ ধূ মরুভূমির বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমি। ই নিয়েই কাজাকরা পরম নিশ্চিন্তে ছিল এতদিন। যাযাবরবৃত্তি ও পশুপালনই ছিল তাদের প্রধান পেশা। ক্ষুদ্র, মধ্যম ও বৃহৎ তিনটি গোষ্ঠীতে তারা বিভক্ত ছিল, এবং এক গোষ্ঠীর মাথার উপরে ছিল এক-একজন ক্ষুদে আল্লা খাঁ, কারও সঙ্গে কারও সদ্ভাব বা সম্প্রীতি ছিল না। তারপর সবার উপরে এসে রাজা হয়ে বসলেন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ রুশ জার, যত রকমে পারলেন এই বর্ব্বর যাযাবরদের শোষণ করলেন, তাদের উগ্র ও বন্য বিদ্রোহী স্বভাব দমন করার চেষ্টা করলেন। কাজাকস্তান যেমন চিরদিন বৃহদাকার কদাকার জীবের মতো তার পাহাড়-মরু-প্রান্তর নিয়ে নিঃস্পন্দ

অচেতন হয়ে ছিল, তেমনই অচেতন রইল। চেতনা হ'ল কাজাকস্তানের বিপ্লবের চাবুক খেয়ে। কাজাকরাও জাগল।

কে জানত এই মরু-প্রান্তর-পাহাড় কেটে-ফুঁড়ে বন্য প্রকৃতির অসভ্য কাজাকরাই একদিন আধুনিক নগর গঠন করতে পারে? এবং তাও আবার মাত্র বিশ বৎসরের মধ্যে? কে-ই বা কল্পনা করেছিল যে কাজাকস্তানের মরু-প্রান্তর পাহাড়ের বুকে এত মণিরত্ন, এত ঐশ্বর্য্য, এত প্রাকৃতিক সম্পদ আত্মগোপন ক'রে আছে। জারের আমলের বিলাসী বিজ্ঞানীরা একসময় নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে বলতেন: "মধ্য এশিয়ার এইসব হতভাগাদের দেশে খনিজ সম্পদ ব'লে কোন পদার্থ নেই।" আজকের কাজাকরা, আজকের বিজ্ঞানীরা তাঁদের জবাব দেবেন: "খনিজ সম্পদের দিক দিয়ে মধ্য এশিয়া পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ক'রে আছে।" কাজাকদের যাযাবর জীবন এবং ভ্রাম্যমান কিবিৎকা দেখে যাঁরা বিদ্রূপ ক'রে বলতেন: 'এইসব অসভ্য বর্ব্বরেরা সভ্য হবে না কোনদিন,' তাঁরা এসে আজকের কাজাকস্তানের আধুনিক নগরগুলি একবার দেখে যান! লজ্জায় তাঁরা মাথা হেঁট ক'রে থাকবেন। দেখবেন, অসভ্য কাজাকরাই আজ তাঁদের 'সভ্যতার' শিক্ষক হ'তে পারে। দেখবেন, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ যে-দেশকে নরকে পরিণত করে, যে-দেশের মানুষকে করে পশু, সমাজতন্ত্র সেই নরককে আবার সোনার স্বপ্নপুরী করতে পারে, সেই সব 'পশুকে' আবার সুসভ্য মানুষও করতে পারে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ঐন্দ্রজালিক শক্তি এক শতাব্দীর কাজ দশ বছরে করতে পারে, যা আজও পৃথিবীর অনেক প্রতিভাশালী বিজ্ঞানীরা ধনিকগোষ্ঠীর দাসত্ব ক'রে কল্পনা করতে পারেন না।

গতকালের মরু-প্রান্তর-পাহাড়ের দেশ কাজাকস্তানে আজ বড় বড় কলকারখানা ও নগর গ'ড়ে উঠেছে। 'গতকাল ও আজ' বলছি ব'লে

কেউ যেন না মনে করেন যে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার মোহে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আমি অত্যুক্তি করছি। অত্যুক্তির বা অতিরঞ্জনের আদৌ প্রয়োজন নেই এখানে। রাশি-রাশি তথ্য আছে, সংখ্যা আছে, বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিমানেরা বিচার ক'রে দেখুন। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে ১২০টি বড় বড় কারখানা কাজাকস্তানে গ'ড়ে তোলা হয়েছে, অর্থাৎ গড়ে বছরে দশটি ক'রে। যুদ্ধের মধ্যে আরও অনেক কারখানা তৈরী করা হয়েছে। আর ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে, অর্থাৎ যুদ্ধের মধ্যে, প্রায় ৪৪টি নূতন সহর ও নগর গ'ড়ে উঠেছে কাজাকস্তানে। প্রত্যেকটি সহর ও নগর যদি শিল্পকেন্দ্র হয়, তাহ'লে যুদ্ধের মধ্যে শিল্পের প্রসার কতটা হয়েছে তা অতি সহজেই বুঝতে পারা যায়। এই শিল্প-প্রগতি কাজাকস্তানে সম্ভব হয়েছে এই জন্যে যে কাজাকরা আজ মরু-প্রান্তর পাহাড় ভেদ ক'রে রেলপথ ও মোটর পথ তৈরী করেছে, আজ তারা ঘোড়া-উট ছেড়ে ট্রাকে-ট্রেনে-মোটরে কাজাকস্তানের এককোণ থেকে আর এককোণে চ'লে ফিরে বেড়াচ্ছে। রেলপথের কথা বলতে হ'লে প্রথমেই বড় বড় চারটি রেলপথের কথা বলতে হয়। চকালভ-তাস্কেন্দ রেলপথ পশ্চিমদিক থেকে কাজাকস্তানে প্রবেশ ক'রে আরাল সাগর ছুঁয়ে তাস্কেন্দ পৌঁছেচে। তুর্কীস্তান-সাইবেরিয়ান্ রেলপথ প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিমে নোভোসিবিরস্ক্ থেকে আল্মা-আতা পর্য্যন্ত গিয়ে তারপর পশ্চিমে চিম্‌কেণ্ট সহর পর্য্যন্ত এবং সেখান থেকে চকালভ্-তাস্কেন্দ রেলপথে মিশেছে। ট্রান্স-সাইবেরিয়ান্ রেলপথ কাজাকস্তানের ভিতর দিয়ে খানিকটা গিয়ে সীমানা ছুঁয়ে ছুঁয়ে আরও প্রায় ১০০০ মাইল পর্য্যন্ত গিয়েছে। আর একটি নূতন রেলপথ তৈরী হয়েছে উরাল অঞ্চলের ম্যাগ্‌নিটোগর্স্কের দক্ষিণ থেকে বল্‌কাশ হ্রদের তীরে আক্‌মোলিন্‌স্ক ও কারাগাণ্ডা পর্য্যন্ত। এই পথের উপর দিয়ে কাজাকস্তান থেকে কারাগাণ্ডার

কয়লা উরালের শিল্পকেন্দ্রে চালান যায়। এই রেলপথগুলি কাজাকস্তান প্রজাতন্ত্রকে ঠিক যেন জালের মতো জড়িয়ে রয়েছে। এ-ছাড়াও আরও কয়েকটি শাখাপথ তৈরী করা হয়েছে। তার মধ্যে চকালভ্-তাস্কেন্দ রেলপথ থেকে এম্বার তেলের খনি পর্যন্ত ৩২১ মাইল লম্বা রেলপথ, বল্‌কাশের তীর থেকে জেজ্‌কাজ্‌গানের তামার খনি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ২৫৬ মাইল লম্বা রেলপথ এবং আক্‌মোলিন্‌স্ক থেকে পাভলোদার পর্য্যন্ত আর একটি ৪০০ মাইল লম্বা রেলপথ উল্লেখযোগ্য। এ তো গেল রেলপথের কথা। রেলপথ ছাড়াও সির-দরিয়া, নারা, ইর্‌তিশ্‌ ও ইলি নদীতে আরও প্রায় ৭২০০ মাইল জলপথ আছে। প্রশস্ত মোটরপথও তৈরী হয়েছে অনেক। একমাত্র ১৯৪০ সালেই ১৩৩০ কিলোমিটার মোটর পথ তৈরী করা হয়েছে। আর সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে প্রত্যেক মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রের মতো কাজাকস্তানেরও আকাশপথে যোগাযোগ আছে।

কাজাকস্তানে আজ অফুরন্ত তেল, কয়লা, তামা, নিকেল, সোনা রূপো, সীসা, দিস্তা, ক্যাড্‌মিয়াম্‌, গ্যালিয়াম্‌ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এম্বা সহর ও নদীর তীরের তেলের কেন্দ্র আজ বিশ্ববিখ্যাত। প্রায় ১ লক্ষ ৫৬ হাজার বর্গ মাইল ব্যাপী এই তেলের অঞ্চলে ১২৯ কোটি টন্‌ তেল মজুত আছে ব'লে ভূবিজ্ঞানীরা অনুমান করেন। আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি ক'রে এম্বায় শত শত কূপ খোঁড়া হয়েছে। মার্কিন ড্রিলিং যন্ত্রের শব্দে এম্বার নিশুতি রাতের স্তব্ধতা ভেঙে যায়। এম্বার মাটি থেকে কাজাকরা টন্‌ টন্‌ খনিজ তেল নিষ্কাশন করে। এম্বা থেকে ৪৩৪ মাইল লম্বা পাইপ-লাইনের এই খনিজ তেল বহন ক'রে নিয়ে যায় উরালের ওর্স্ক পরিশোধন কারখানায়। তামারও অভাব নেই কাজাক-

স্তানে। পশ্চিম কাজাকস্তানের জেজ্‌কাজান্‌ অঞ্চলে প্রায় ৩১ লক্ষ টন খনিজ তামা মজুত আছে ব'লে ভূবিজ্ঞানীরা অনুমান করেন। বাশেক্-উল্‌স্কেও প্রায় ২০ লক্ষ টন খনিজ তামা, ২৬ লক্ষ টন সীসা এবং ৪৬ লক্ষ টন দিস্তা মজুত আছে। এইসব অঞ্চলে খনির আশেপাশে আজকাল নূতন নূতন নগর গ'ড়ে উঠেছে এবং খনিজ পরিশোধনের কারখানাও তৈরী হয়েছে অনেক। এই তামার খনি অঞ্চলের উত্তরে হ'ল কারাগাণ্ডা। কারাগাণ্ডার কয়লা উক্রেইনের ডন্‌বাস অঞ্চল এবং সাইবেরিয়ার কুজ্‌বাস অঞ্চলের পরেই উল্লেখযোগ্য। ১৯২০ সালের আগে কারাগাণ্ডায় কয়লার বাৎসরিক উৎপাদন ছিল ৩৫ হাজার টন মাত্র, আর ১৯৪০ সালে উৎপাদন হয় ৪৫ লক্ষ টন। আমীর ও জারের আমলে এই কারাগাণ্ডা ছিল একটি গণ্ডগ্রাম, আর আজ কারাগাণ্ডা হ'ল অতি-আধুনিক সহর, প্রায় দেড় লক্ষ লোকের বাস এখানে। এ-ছাড়া আল্‌তাই পাহাড়ের কোলে অনায়স ধাতুর খনিগুলি এবং তার সংলগ্ন কারখানা ও নগরগুলিও সব নূতন। কয়েক বছর আগেও এদের কোন চিহ্ন ছিল না। ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে কাজাকস্তানের শিল্পোৎপাদন প্রায় ২৲ গুণ বেড়েছে, ১৯২৮ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে শ্রমিকদের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৬ লক্ষ, আর ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে, আগেই বলেছি, নূতন সহর ও নগরের সংখ্যা বেড়েছে ৪৪টি। কাজাকস্তানের এইসব সহর, নগর, খনি, কলকারখানা, রেলপথ প্রভৃতির বয়স খুব বেশী হ'লেও ১৫-২০ বৎসর মাত্র। পনের কুড়ি বছরে শিশু তারুণ্য লাভ করে, কিন্তু কোন স্থানের ভৌগোলিক রূপ বদলে যায় কি? ইতিহাসে এর আগে কি অনুরূপ কোন কাহিনী শুনতে পাওয়া গিয়েছে? যায়নি বলেই আমরা জানি। অথচ আজকাল শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। কারণ

পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশে আজ নূতন সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার আদর্শ নূতন, তার প্রেরণা নূতন, তার গঠন-নৈপুণ্য ও কর্ম্ম-কুশলতাও অসাধারণ। আমরা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের পায়ের কাছে নতজানু হয়ে জীবনযাপন করি, আমরা একচেটিয়া পুঁজিবাদের কাছে করজোড়ে জীবিকা ভিক্ষা করি, তাই মধ্যএশিয়ার এই বৈপ্লবিক প্রগতি ও রূপান্তরের ইতিহাস আমাদের কাছে 'ঠাকুরদাদার' রূপকথার মতোই মনে হবে। গরুর গাড়ীর উপর জড়সড় হয়ে ব'সে ধূসর পাণ্ডুর দৃষ্টি দিয়ে আমরা সোভিয়েট মধ্যএশিয়ার এই বৈমানিক প্রগতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারব না কোনদিন।

সমাজতান্ত্রিক নীতি

কিন্তু কথা হ'ল, এই বৈপ্লবিক রূপান্তর, এই বৈমানিক প্রগতি (পারমাণবিক প্রগতি বললেও অত্যুক্তি হয় না) মধ্য এশিয়ায় সম্ভব হ'ল কি ক'রে? সম্ভব হ'ল সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের সমাজতান্ত্রিক নীতি ও বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার জন্যে। শিল্পায়ন নীতি, অর্থনীতি, বৈদেশিক নীতি, দেশরক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্যের নীতি প্রভৃতি পরিকল্পনার ভার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের। সম্প্রতি দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতির ভারও প্রত্যেক স্বাধীন প্রজাতন্ত্রকে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করলেই ছোট ছোট প্রজাতন্ত্রগুলিকে কোণঠাসা করতে পারত। পারত, যদি গবর্ণমেণ্ট সাম্রজ্যবাদী গবর্ণমেণ্ট হ'ত, যদি পররাজ্য শোষণ করা তার নীতি হ'ত, যদি ব্যক্তিগত বা মুষ্টিমেয় কোন শ্রেণীর মুনাফা ও মূলধন বৃদ্ধি করাই তার আদর্শ হ'ত। কিন্তু এই নীতির বিরুদ্ধেই সংগ্রাম ক'রে, বিপ্লবের রক্তস্রোতের ভিতর দিয়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রের, সোভিয়েট

গবর্ণমেণ্টের জন্ম হয়েছে। তাই এই নীতির বিপরীত নীতি অনুসরণ করাই সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের পক্ষে স্বাভাবিক। এই নীতি হ'ল, সাম্রাজ্যবাদের পূর্ব্বেকার শোষণকেন্দ্র, অনুন্নত দেশগুলির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও প্রগতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া। তাদের শুধু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা দিলেই চলবে না, অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও দিতে হবে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রথম সোপান হ'ল অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যাতে ছোট ছোট অনুন্নত প্রজাতন্ত্রগুলি অতি দ্রুত আত্মনির্ভরশীল হতে পারে সেই দিকেই সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের সতর্ক দৃষ্টি রইল গোড়া থেকে। সেইভাবেই শিল্পায়নের পরিকল্পনা ও বাজেট করা হ'ল। ১৯২৭-২৮ সালের বাজেটে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্যে রুশ প্রজাতন্ত্রের ব্যয় বরাদ্দ হ'ল ২'১৬, আর উজ্‌বেকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের হ'ল ২'৪৮ ও ৩'৮৭; জাতীয় শিল্পায়নের জন্যে রুশ প্রজাতন্ত্রের বরাদ্দ হ'ল ১'৬৫, উক্রেইনের ১'৬২ এবং উজবেকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের যথাক্রমে ৩'৩৯ ও ৮'৯০। এই ব্যয়-বরাদ্দ থেকেই বুঝা যায় সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য কি, শোষণ, না অর্থনৈতিক সাম্য? দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের বাজেট বাড়ল শতকরা ১৬৪'১, কিন্তু বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রগুলির বাজেট বাড়ল শতকরা ২৫০'৯। আর সব চাইতে অনুন্নত প্রজাতন্ত্রগুলির বাজেট বাড়ল আরও বেশী, যেমন কির্‌গিজ প্রজাতন্ত্রের শতকরা ৩৬৭'৭ এবং কাজাকস্তানের ৪০৫'১। প্রত্যেক প্রজাতন্ত্রকে নিজের আয়ের উপরেই যদি শুধু নির্ভর করতে হ'ত তাহ'লে ব্যয়-বরাদ্দ এত বাড়ত না। সোভিয়েট ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় বাজেট থেকে অনুন্নত প্রজাতন্ত্রগুলিকে সব চাইতে বেশী আর্থিক সাহায্য করা হয় তাদের দ্রুত উন্নতির জন্যে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্কটের মধ্যেও এই নীতির

কোন পরিবর্তন করা হয়নি।* ১৯৪৪ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের বাজেট বাড়ে (আগের বছরের তুলনায়) শতকরা ১৭'১ কিন্তু তাজিকিস্তান ও কাজাকস্তানের শতকরা বাজেট বাড়ে যথাক্রমে ৩০'১ এবং ২৮'৫। এই কারণেই লণ্ডনের পুঁজিবাদীদের মুখপত্র *"The Economist"* পর্য্যন্ত মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিল:

"১৯৪২ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের অর্থনৈতিক জীবনের কেন্দ্র এশিয়ায় স্থানান্তরিত হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের ইতিহাসে ১৯৪২ সাল এশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলির বিরাট শিল্প-প্রগতির বৎসর হিসাবে উল্লিখিত থাকবে।...এশিয়া আজ ইউরোপের জীবন রক্ষা করছে।" *

আর এই এশিয়ার যেসব অঞ্চল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীন ছিল, এই মহাযুদ্ধের মধ্যে তাদের অবস্থা কি হয়েছে? যেমন আমাদের ভারতবর্ষ ও বর্ম্মা? সে-কাহিনী এইবার আমরা সাম্রাজ্যবাদী নীতির আলোচনা প্রসঙ্গে বর্ণনা করব। সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের আদর্শ কি এবং তার শক্তিই বা কতখানি তা নিশ্চয়ই আমরা মধ্য এশিয়ার বৈপ্লবিক প্রগতির ইতিহাস থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছি। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের

---

* Alexander Baykov : The Development of the Soviet Economic System (1946 ed.) : Sec I, Chap II (4), Sec II, Chap VI, Sec IV, Chap XIX.

M.I. Bogolepov : The Soviet Financial System (1945 ed) : Pp. 26-32

Reginald Bishop : Wages and Prices in the U.S.S.R (1946 ed.)

* "In the course of 1942 the centre of gravity of the U.S.S.R's economic life has shifted to Asia ; and 1942 may rank in the U.S.S. R's history as the year of the great industrial ascendancy of its Asiatic republics···Asia is rescuing Europe." (The Economist : Dec 5. 1942)

আদর্শ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক সাম্যের আদর্শ। সোভিয়েট ইউনিয়নের সমস্ত সম্পদ, সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সমস্ত উৎপাদন, আয় ও লাভের মালিক সোভিয়েটের জনসাধারণ, সোভিয়েটের অন্তর্গত প্রত্যেক স্বাধীন ও স্বায়ত্ত প্রজাতন্ত্র। তাই প্রত্যেক সোভিয়েট নাগরিক, কর্ম্মী ও শ্রমজীবী যেমন তার ন্যায্য প্রাপ্য গবর্ণমেণ্টের কাছে দাবী করতে পারে, প্রত্যেক স্বাধীন ও স্বায়ত্ত প্রজাতন্ত্র তার প্রয়োজনানুযায়ী অংশ সেই সম্পদ, ঐশ্বর্য্য ও আয় থেকে দাবী করতে পারে। প্রত্যেক প্রজাতন্ত্রের এই দাবী যে সব সময় সবার আগে স্বীকার করা হয় তার জলন্ত প্রমাণ সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের বাজেটের ব্যয়-বরাদ্দ। আর সোভিয়েট জনসাধারণ বা শ্রমজীবীদের ন্যায্য দাবী ও প্রাপ্য যে কতটা পূরণ করা হয় তাও বলছি। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের জাতীয় আয় (National income) ৯৬০০ কোটি রুব্‌ল (১৯৩৭) থেকে বেড়ে হয় ১২৫৫০ কোটি রুব্‌ল (১৯৪০)। ১৯৩৭ সালে যখন মোট জাতীয় আয় ছিল ৯৬০০ কোটি রুব্‌ল তখন মোট জাতীয় মজুরী বাবদ দেওয়া হ'ত ৮২০০ কোটি রুব্‌ল। ১৯৭০ সালে যখন জাতীয় আয় বেড়ে হ'ল ১২৫৫০ কোটি রুব্‌ল তখন মোট জাতীয় মজুরী (National pay-roll) বেড়ে হ'ল ১২৩৭০ কোটি রুব্‌ল। শ্রমিকদের গড়্‌পড়তা মজুরীও অনেক বেড়ে গেল। পৃথিবীর কোন দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসে এরকম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। কারণ অন্যান্য দেশের জাতীয় সম্পদ ও জাতীয় ধনের মালিক জনসাধারণ নয়, মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণী। জাতীয় আয়ের মোটা অংশ তাঁরাই মুনাফারূপে আত্মসাৎ করেন, আর জনসাধারণ পায় তার কণামাত্র।

সমাজতন্ত্রের নীতি ও লক্ষ্য কি আমরা বুঝতে পারলাম। আমরা দেখলাম, সেই লক্ষ্য সামনে রেখে, সেই নীতি বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে

ইতিহাসের ধারা, এমন কি তথাকথিত ভৌগোলিক রূপ পর্য্যন্ত বদলে দেওয়া যায়। সোভিয়েট মধ্যএশিয়ার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও প্রগতির ইতিহাস থেকেই আমরা তার পরিচয় পেয়েছি। আমরা এও জানি 'সাম্রাজ্যবাদের' পক্ষে যেটুকু সামাজিক উন্নতির ব্যবস্থা করা এক শতাব্দীতেও সম্ভব নয়, 'সমাজতন্ত্রের' পক্ষে তা অনেকক্ষেত্রে এক বছরেও সম্ভব। তার প্রমাণ স্বরূপ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের জবানবন্দি দরকার। সুতরাং এইবার আমরা "বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে" কাঠগড়ায় দাঁড় করাব।

ব্রহ্মদেশ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ

প্রথমে ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধেই বলি। ১৮২৬ সালে আরাকান ও তেনাসারিম বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবলিত হয়। দ্বিতীয় বর্ম্মী যুদ্ধের পর বর্ম্মার নীচের অর্দ্ধেক অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বৃটিশরা দখল করে। তৃতীয় বর্ম্মী যুদ্ধের পর, প্রায় ১৮৮৬ সালে গোটা বর্ম্মা বৃটিশেরা অধিকার ক'রে বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং মোটামুটি প্রায় এক শতাব্দী হ'ল বর্ম্মা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে রয়েছে বলা চলে। ১৯৩৭ সালে বৃটিশ শাসকরা ব্রহ্মদেশ থেকে ভারতবর্ষকে বিচ্ছিন্ন করে। বিচ্ছিন্ন করার কারণ হ'ল অর্থনৈতিক। এই বিচ্ছেদের ফলে ভারতবর্ষ তার অরণ্য সম্পদের শতকরা ২৫ ভাগ, রবারের ৪৬ ভাগ, চালের ১৫ ভাগ, পেট্রলের ৬৮ ভাগ, রূপোর ৯৯ ভাগ এবং সম্পূর্ণরূপে টংস্টেন্, দিস্তা, সীসা, রাং ও এ্যণ্টিমনি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বঞ্চিত করা হয়েছে এইজন্যে যে এসব সম্পদের মালিক বর্ম্মীরা নয়, বৃটিশ ধনিক ও বণিকেরা। তাদের শোষণের সুবিধার জন্যেই এই বিচ্ছেদ। সেকথা আমরা পরে বলছি। সোভিয়েট মধ্যএশিয়ার বিস্ময়কর প্রগতির সঙ্গে বর্ম্মার শোচনীয় দুর্গতির তুলনা করতে হ'লে আমাদের মনে রাখা উচিত যে কাজাকস্তান নিয়ে গোটা সোভিয়েট

মধ্যএশিয়ার লোকসংখ্যা ১,৬৬,৬৭০০০ এবং বর্ম্মার লোকসংখ্যা হ'ল ১,৬৮,০০০০০। বর্ম্মা ও সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার লোকসংখ্যা প্রায় সমান। কিন্তু প্রায় এক শতাব্দী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে থেকে এই ১ কোটি ৬৮ লক্ষ বর্ম্মীর আজ কি দুরবস্থা হয়েছে?

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিপতিরা বাস্তবিকই বর্ম্মাকে লুণ্ঠন ও শোষণের "মগের মল্লুকে" পরিণত করেছেন। বর্ম্মার কৃষিক্ষেত, অরণ্য ও খনি থেকে আরম্ভ ক'রে কলকারখানা পর্য্যন্ত কোথাও বর্ম্মীদের কর্ত্তৃত্ব নেই, সর্ব্বত্রই বৃটিশ পুঁজিপতিদের একাধিপত্য। বৃটিশ মূলধন যে বর্ম্মায় কিভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে তা ভাবলেও ভয় হয়। ১৯১৪ সাল থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে বর্ম্মায় বৃটিশ মূলধন প্রায় তিনগুণ বেড়েছে এবং এখন মোট বৃটিশ মূলধন প্রায় ৫ কোটি পাউণ্ড। বর্ম্মার বিভিন্ন শিল্প-বাণিজ্যে বৃটিশ মূলধন এইভাবে নিয়োগ করা হয়েছে: ৫

তেল—১ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড
অন্যান্য খনি—১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড
যানবাহন—৬০ লক্ষ পাউণ্ড
কাঠ—৩৫ লক্ষ পাউণ্ড
ব্যাঙ্কিং ও বাণিজ্য—৫৫ লক্ষ পাউণ্ড
রবার, চা ইত্যাদি—১২ লক্ষ পাউণ্ড

এই মূলধনের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগই হ'ল বৃটিশ আর বাকি সামান্য অংশ হ'ল মার্কিন, ডাচ, জাপানী ও ভারতীয়। বৃটিশ মূলধনের বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে সর্ব্বত্রই কয়েকটি মাত্র বড় বড় বৃটিশ কোম্পানী একচেটিয়া

৫ Kate Mitchell : Industrialisation of the Western Pacific (Institute of Pacific Relations Inquiry Series—1942)—'বর্ম্মা' সম্বন্ধে অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য।

H.G. Callis : Foreign Capital in S.E. Asia ; P. 105

এ-ছাড়া তথ্য-সংগ্রহের বিস্তারিত বিবরণ গ্রন্থশেষের গ্রন্থসূচীতে পাওয়া যাবে।

অধিকার কায়েম ক'রে ব'সে আছে। যেমন "স্টীল ব্রাদার্স এ্যাণ্ড্ কোম্পানী লিমিটেড্"। এই কোম্পানী চালের কল, তেলের কল, কাপড়ের কল, সেগুন কাঠ, রবার, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য, সর্ব্বক্ষেত্রে মূলধন খাটাচ্ছে এবং বর্ম্মা থেকে এই কোম্পানীর বাৎসরিক নীট্ মুনাফা হ'চ্ছে প্রায় ৪ লক্ষ পাউণ্ড। বর্ম্মার তেলের খনি ও কলগুলির একচেটিয়া মালিক তিনটি মাত্র বৃটিশ কোম্পানী—"বর্ম্মা অয়েল্ কোম্পানী," "দি বৃটিশ-বর্ম্মা পেট্রলিয়াম্ কোম্পানী" এবং "দি বর্ম্মা শেল্ অয়েল্ স্টোরেজ্ এ্যাণ্ড ডিস্ট্রিবিউটিং কোম্পানী অফ্ ইণ্ডিয়া।" শেষোক্ত কোম্পানীর অর্দ্ধেক শেয়ার হ'ল 'বর্ম্মা অয়েল্ কোম্পানীর'। এই 'বর্ম্মা অয়েল্ কোম্পানী' বর্ম্মার বাইরে আরও কয়েকটি কোম্পানীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। যেমন "আসাম অয়েল্ কোম্পানী অফ্ ইণ্ডিয়া," "দি এ্যাংলো-ইরানিয়ান শেয়ার ট্রাস্ট্ লিঃ," "দি এ্যাংলো-ইরানিয়ান্ অয়েল্ কোং" এবং "দি টিন্ প্লেট্ কোম্পানী অফ্ ইণ্ডিয়া"। "টিন্ প্লেট কোম্পানীর" সঙ্গে আবার আমাদের দেশের টাটারা জড়িত। ১৯৪১ সালে "Oil Field Labour Enquiry Committee"-র রিপোর্টে প্রকাশ যে, এইসব খনির শ্রমিকদের দৈনন্দিন মজুরী হ'ল গড়ে ১৷৹ মাত্র। তেল ছাড়াও বর্ম্মার অন্যান্য খনিজ শিল্পের একচেটিয়া মালিক হ'ল কয়েকটি বৃটিশ কোম্পানী। তার মধ্যে প্রধান হ'ল "দি বর্ম্মা কর্পোরেশন্ লিঃ।" এই কোম্পানীকে পৃথিবীর মধ্যে রূপো ও সীসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মালিক বলা যেতে পারে। বর্ম্মার সমস্ত সীসে, রূপো, তামা, দস্তা, নিকেল, সোনা বদ্উইন্-নামতু অঞ্চলে মজুত আছে। এই অঞ্চলের একচেটিয়া মালিক বৃটিশ পুঁজিপতিদের "বর্ম্মা কর্পোরেশন্ লিমিটেড্"। রাং ও টংস্টেন্ বর্ম্মার খনিজ সম্পদের মধ্যে অন্যতম্। এই রাং ও টংস্টেন খনিগুলির অধিকাংশই তাভয় ও মাইগুই জেলায় সীমাবদ্ধ এবং খনিগুলির মালিক "তাভয় টিন্

ড্রেজিং কর্পোরেশন্," "দি এ্যাংলো-বর্ম্মা টিন্ কর্পোরেশন্," "দি কন্সোলিডেটেড্ টিন্ মাইন্স অফ্ বর্ম্মা লিঃ" এবং "দি হাই স্পীড্ স্টীল্ এ্যালয়েস্ মাইনিং কোং"। বলা বাহুল্য, এই কোম্পানীগুলি সব বৃটিশ পুঁজিপতিদের। এই হ'ল বর্ম্মার খনিজ শিল্পের অবস্থা। বর্ম্মার জনসাধারণ হ'ল এইসব খনির দিনমজুর, আর খনি থেকে তারা যে প্রচুর খনিজ সম্পদ তুলে আনে তার একচেটিয়া মালিক হ'ল বৃটিশ পুঁজিপতিরা।[৬]

বৃটিশ পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদীরা আজ প্রায় একশ' বছরের মধ্যে বর্ম্মাকে দিনমজুরের দেশে পরিণত করেছে। বর্ম্মার মাঠে, বর্ম্মার ক্ষেতে, বর্ম্মার খনিতে, বর্ম্মার অরণ্যে আজ বর্ম্মীরা ক্ষেতমজুর, দিনমজুর। তাদের মালিক বৃটিশ পুঁজিপতিরা। কোটি কোটি টাকা মুনাফা ক'রে তারা দিন দিন স্ফীত হ'চ্ছে আর বর্ম্মীরা কঙ্কালসার হ'চ্ছে। বর্ম্মায় তাই কোন 'জাতীয় শিল্প-পরিকল্পনার' নাম আজ পর্য্যন্ত শোনা যায়নি। প্রায় একশ' বছরের মধ্যে বর্ম্মায় কোন উল্লেখযোগ্য শিল্প-প্রগতিও কিছু হয়নি। বর্ম্মার সমস্ত কলকারখানার তিনভাগের দু'ভাগই প্রায় চালের কল এবং শ্রমিকদের অর্দ্ধেক চালের কলের শ্রমিক।[৭]

	মোট কলকারখানা	মোট শ্রমিকসংখ্যা	চালের কল	চালের কলের শ্রমিক
১৯২৮	৯৬৮	১০১,৫৮৬	৬০৬	৪১,৩২৭
১৯৩০	৯৮০	৯৮,৭০১	৬১৩	৪২,১৩৭
১৯৩২	৯৪৮	৯০,৫৭৮	৬০৯	৪৩,২৫৪
১৯৩৪	৯৪৬	৮৫,৮২৯	৬৩৭	৪২,[illegible]
১৯৩৬	৯৮৫	৮৯,২৩০	৬৫৭	৪২,৮১৭
১৯৩৮	১০১৯	৮৬,৩৫২	৬৮৩	৪১,৫৬৪

৬ Kate Mitchell ; Op. Cit ; Ibid.

৭ Kate Mitchell ; Op. Cit ; Ibid.

১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে মোট কলকারখানা বেড়েছে ৩৪টি, তার মধ্যে চালের কল হ'ল ২৬টি, আর মোট শ্রমিকসংখ্যা কমেছে ২৮৭৮ জন,তার মধ্যে চালের কলের শ্রমিক কমেছে ১২৫৩ জন। সুতরাং প্রগতি কোন্ দিকে হ'চ্ছে তা অত্যন্ত স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে। প্রগতি হ'চ্ছে "চালের" দিকে, শ্রমশিল্পের দিকে নয়। এই সব চালের কলের মধ্যেও কয়েকটি বড় বড় কলে বৃটিশ মূলধন খাটছে এবং সেগুলি বর্ম্মার প্রধান চারটি বন্দর রেঙ্গুন, মৌলমেইন্, আকিয়াব ও বেসিনের কাছে অবস্থিত।

এই হ'ল বর্ম্মার প্রায় একশতাব্দীর শিল্প-প্রগতির ইতিহাস। এই ইতিহাস হ'ল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নির্ম্মম শোষণ ও লুণ্ঠনের মর্ম্মস্পর্শী ইতিহাস। এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আবার তাদের ভাঙা সিংহাসন মজবুত ক'রে তার উপর গদিয়ান হয়ে বসতে চাইছে। বর্ম্মী জনসাধারণ আজ আর তা চাইছে না। আজ বর্ম্মার জনসাধারণ বর্ম্মার পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করছে। বর্ম্মার জনসাধারণ আজ এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সেই সংগ্রাম বোমা-বারুদ দিয়ে দমন করার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আগামী কালের এশিয়া "স্বাধীন বর্ম্মার" জন্যে উৎকণ্ঠিত।

ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস প্রায় দুই শতাব্দীর ইতিহাস। এই সুদীর্ঘ দুই শতাব্দীর ইতিহাসের প্রত্যেকটি অধ্যায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ লুণ্ঠন ও শোষণের কাহিনীতে কলঙ্কিত। সে-কাহিনীর পূর্ণ বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভব নয়, তার জন্যে স্বতন্ত্র কয়েক খণ্ড গ্রন্থের প্রয়োজন। এখানে শুধু আমরা অতি সংক্ষেপে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পরিণতির কথা বলব, বিশেষ ক'রে শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। ভারতের একদা সমৃদ্ধ

শিল্প-বাণিজ্যের ক্রমিক অবনতি ও অবলুপ্তিই হ'ল সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পরিণতি।

'ভারতীয় শিল্পের' ইতিহাস-লেখক প্রবীণ বার্ডউড্ সাহেব ভারতের গ্রাম্যজীবন লক্ষ্য ক'রে বহুদিন পূর্ব্বে তার এক নিখুঁত ছবি এঁকেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন: "ভারতের প্রতিটি গৃহ সৌন্দর্য্যের নিকেতন। অতি ছোট গ্রামেও গৃহকর্ত্রীকে দৈনন্দিন কাজের অবসরে তুলো পিঁজ্তে ও সুতো কাটতে দেখা যায়। পথের ধারে তাঁতি ব'সে তাঁত চালায়। কোথাও কামার, কোথাও কাঁসারীর কারখানা। কোথাও স্বর্ণকার চাঁদের মতো হাঁসুলী, বালা ও ফুলফলের মতো আভরণ তৈরী করতে ব্যস্ত।" ভারতীয় গ্রাম্য-সমাজের এই ছবি সেকালের কাব্যে ও চিত্রেও দেখতে পাওয়া যায়। একশ' দেড়শ' বছর আগেও এই গ্রাম্য-সমাজের অস্তিত্ব ছিল এদেশে। প্রত্যেকটি গ্রাম ছিল অর্থনৈতিক দিক থেকে আত্ম-নির্ভরশীল। চাষীরা চাষ করত, কামার-কাঁসারী-কুমোর-চামার-তাঁতি-সূত্রধর, যে-যার নিজের কাজ করত এবং তাদের খাদ্যের অভাব ছিল না। আজও সেই সব গ্রাম আছে কিন্তু সেই গ্রাম্য-সমাজ আর নেই। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সেই আত্মনির্ভরশীল গ্রাম্য-সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়েছে।

প্রাচীন কাল থেকেই বয়নশিল্পে ভারতের খ্যাতি। সেই খ্যাতি শুধু ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। কত রকমের বস্ত্রই যে এ-দেশের তাঁতিরা বুনত তার ঠিক নেই। যেমন 'ঝুনা' —মাকড়সার জালের মতো অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র; 'খাসা'—একরকমের অতি উৎকৃষ্ট মলমল; 'সব-নম্'—পার্সী ভাষায় একে বলা হ'ত 'সান্ধ্য শিশির', ঘাসের উপর পেতে দিলে শিশির ভেজা দূর্ব্বাদল ব'লে মনে হ'ত; 'আব্ রোয়ান্' (আব্-জল, রোয়ান্-প্রবাহ) বা নির্ম্মল জলপ্রবাহের মতো স্বচ্ছ

বস্ত্র ; "আল্‌বাল্লে" বা অতি উৎকৃষ্ট ; 'তঞ্জেব' (পার্সী তন্-শরীর, জেব্-অলঙ্কার) বা দেহের অলঙ্কার স্বরূপ বস্ত্র ; 'তুরন্দাম্' বা অঙ্গরক্ষক ; 'তন্-সুখ' বা দেহের সুখ ; 'বদন-খাস্' ; 'সরবন্দ' বা শিরবন্ধ, মাথার পাগড়ীর জন্যে ব্যবহৃত হ'ত ; 'কুমিস্' বা শার্টের কাপড় ; 'ডুরিয়া' বা দুই রকমের সুতো দিয়ে বোনা নানারকমের কাপড়, যেমন পাদশাহীদার, কুণ্ডিদার, ডাকান, কাগজাহী, কলাপাত ইত্যাদি ; 'চারখানা'—নানারকমের সুতো দিয়ে বোনা, নানারকমের নাম তার, যেমন নন্দনশাহী, আনার দানা, কবুতর খোপা ইত্যাদি ; 'জামদানী'—তাঁতে ফুল তোলা ও কারুকাজ করা একরকমের কাপড়। এইসব নানারকমের কাপড় ছাড়াও দোসুতী, শতরঞ্জি, সুসী, নিমজা প্রভৃতিও এদেশে তৈরী হয়েছে প্রচুর। এই বয়নশিল্পই বা আজ কোথায় এবং তাঁতিরাই বা কোথায় ? তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। বৃটিশ পুঁজিপতিদের সর্ব্বগ্রাসী মূলধন তাদের ভারতের মাটি থেকে উচ্ছেদ করেছে।

প্রত্নবিদ্ ও প্রাচীন ইতিহাস-লেখকরা আজ সকলেই প্রায় একবাক্যে স্বীকার করেন যে দামাস্কাসের প্রসিদ্ধ তরবারি ভারতীয় ইস্পাতে প্রস্তুত। পারস্যে ও তুরস্কে ভারতের তরবারি একদিন খ্যাতিলাভ করেছিল। প্রাচীন গ্রীসেও ভারতীয় ইস্পাত ব্যবহারের কথা উল্লেখ আছে। ভারতের কামারেরা ঘরের কাজের জন্যে দা-বঁটি-কাস্তে-ছুরি-কাঁচি এবং চাষের জন্যে ফাল, কোদাল, বিদে, নিড়ানী সবই তৈরী করত। খাঁড়া-বগি-রাম দা-টাঙ্গী-তলোয়ার-বন্দুক-বর্ম্ম সবকিছু তৈরী করতে তারা সিদ্ধহস্ত ছিল। আগ্নেয়াস্ত্রও আমাদের দেশের কামারেরা অনেক তৈরী করেছে। এই বাংলাদেশের কামারেরাই একদিন জনার্দ্দন, জন্মেজয়, বিশ্বম্ভর, জাহান্ কোষা, দলমাদল, কালেখাঁ, ফতেখাঁ প্রভৃতি যেসব কামান তৈরী করেছে তা দেখলে আজও অবাক হতে হয়। দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ লৌহস্তম্ভ যে

আমাদেরই দেশের কামারের কারিগরি তা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু এই সব কামারেরা আজ কোথায়? এই সব কামারের বংশধরেরা আজ ক্ষেতমজুর কিংবা ভাগচাষী। মুনাফালোভী বৃটিশ পুঁজিপতিরা তাদের ধ্বংস করেছে।

এ-ছাড়া কাঁসা-পিতলের কাজ, মিনা ও বিদ্‌রীর কাজ, চামড়ার ও কাচের কাজের জন্যেও ভারতের কারিগরেরা প্রসিদ্ধ ছিল। নৌ-শিল্পও ভারতের অতি প্রাচীন শিল্প। বৈদিক যুগেও শত দাঁড়যুক্ত তরণী সমুদ্র-মধ্যবর্ত্তী দ্বীপে যাতায়াত করত। রামায়ণ, মহাভারত, স্মৃতি সংহিতা-গুলিতেও এদেশের জাহাজের খবর যথেষ্ট পাওয়া যায়। বৌদ্ধ জাতক গল্পগুলিতে এবং অন্যান্য পালি গ্রন্থে সমুদ্র-যাত্রার নানা বর্ণনা পাওয়া যায়। "শিল্প-সংহিতায়" নানারকমের তরণী তৈরীর বিধান থেকেই বুঝা যায় সেকালে নৌ-শিল্পের উন্নতি এদেশে কতদূর হয়েছিল। 'সামান্য' ও 'বিশেষ' দুইভাগে বিভক্ত ক'রে নানা জাতীয় ছোটবড় তরণী নির্ম্মাণের বিধান আছে 'শিল্প-সংহিতায়।' সামান্যের মধ্যে 'ক্ষুদ্রা', 'মধ্যমা', 'ভীমা' থেকে 'মন্থরা' পর্য্যন্ত দশ রকমের নদীতে চালাবার উপযুক্ত নৌকার আকার ও নামের উল্লেখ আছে। 'বিশেষ'কে আবার 'দীর্ঘা' ও 'উন্নতা' এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। 'লোলা', 'সত্বরা', 'জত্বলা', 'গামিনী' 'প্লাবিনী' ইত্যাদি দশ রকমের দীর্ঘা তরণীর দৈর্ঘ্য বেশী, উন্নতি অল্প। সম্ভবতঃ এই ধরণের নৌকাগুলি বড় নদীতে ও উপকূলে চালাবার উপযুক্ত ক'রে তৈরী করা হ'ত। উন্নতা শ্রেণীর উর্ধ্বা, স্বর্ণমুখী, গর্ভিনী, মন্থরা প্রভৃতির দৈর্ঘ্যের তুলনায় উন্নতি বেশী হওয়ায় এগুলি গভীর জলে সমুদ্র-যাত্রার জন্যে ব্যবহার করা হ'ত। ষোল হাত দীর্ঘ পটল-চেরা জেলে ডিঙ্গী থেকে প্রায় দু'শ হাত লম্বা বিশেষ পোত পর্য্যন্ত এ-দেশে তৈরী হ'ত। জাতক গল্পে আট শ' হাত লম্বা, ছ'শ হাত চওড়া জাহাজ এবং পাঁচ শ'

গাড়ী মাল বোঝাই পোতের কথাও পাওয়া যায়, কোন কোন গল্পে আবার এক জাহাজে হাজার লোক যাত্রার কথাও আছে। 'শিল্প-সংহিতায়' নৌকা রং করা এবং সোনা-রূপো-তামা দিয়ে মুড়ে দেওয়ার কথাও আছে। চার মাস্তুলের জাহাজ সাদা, তিন মাস্তুলের জাহাজ লাল, দুই মাস্তুলের হলদে এবং এক মাস্তুলের নৌকা নীল রঙে রং করার জন্যে বলা হয়েছে। তরণীর অগ্রভাগে সিংহ, বাঘ, হাতি, সাপ, ব্যাং, ময়ূর, হাঁস প্রভৃতি পশু-পক্ষীর মুখের অনুকৃতি দেওয়ার রীতি ছিল। এই বাংলাদেশের মধ্যেই গৌড়ে 'লাঘাটা' ও 'চিড়াই বাড়ী' নৌকা নির্ম্মাণের ঘাঁটি ছিল। সন্দীপ, সোনার গাঁ প্রভৃতি স্থানে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতেও রণতরীর মেলা বসত। চট্টলের (চট্টগ্রাম) হিন্দু-মুসলমান সূত্রধরেরা পোত নির্ম্মাণের জন্যে বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু আজ কোথায় বা সেই নৌশিল্প, আর কোথায় বা সেই সূত্রধর? আজ সারা জগতের ৬ কোটি ৫২ লক্ষ ৭১ হাজার টন জাহাজের মধ্যে (১৯৩৮ সালের হিসাব) ভারতের আছে মাত্র ১ লক্ষ ৪৬ হাজার টন, অর্থাৎ ০'২৩ ভাগ মাত্র। ভারতের স্থান সকলের নীচে।

প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ইতিহাস সর্ব্বজনবিদিত। সভ্যতার ইতিহাস রচয়িতারা কোনদিনই তা অস্বীকার করবেন না। কিন্তু সেই গৌরবময় যুগ কিভাবে কলঙ্কময় হ'য়ে উঠল, কি ক'রে সেই আত্মনির্ভরশীল গ্রাম্য-সমাজ, সেই শিল্পী-সমবায়, সেই কামার-কুমার-তাঁতি-কাঁসারী-সূত্রধরদের অবনতি ও অবসান হ'ল ধীরে ধীরে, তারই কাহিনী বলব। সেই কাহিনীই সাম্রাজ্যবাদী শোষণের কাহিনী। সেকালের গ্রাম্য-সমাজের মোহে আমরা মুগ্ধ নই। সেকালের শিল্প-বাণিজ্য যে উন্নতির চরমে উঠেছিল তাও আমরা বলছি না। যন্ত্র ও বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে, বর্দ্ধিষ্ণু শ্রমশিল্পের ও নাগরিক সভ্যতার প্রভাবে গ্রাম্য-সমাজের আত্ম-

নির্ভরশীল অর্থনৈতিক ভিত্তি ভেঙে যাওয়াই স্বাভাবিক। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই ভাঙনের কাজটাকেই বরং সুদূরপ্রসারিত বাস্তব ইতিহাসের বিচারে প্রগতিশীল বলা যায়। কারণ ভারতের সেকালের আত্মনির্ভর গ্রাম্য-সমাজ যতই সমৃদ্ধ হ'ক, তার সঙ্কীর্ণতা, স্থিতিশীলতা ও কূপমণ্ডুকতা ভারতের অগ্রগতির পথে প্রবল অন্তরায়ও ছিল। শিল্পী ও কারিগরদের দক্ষতারও সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে অপমৃত্যু ঘটছিল। ভারতের জাতীয় জীবনে গভীর সঙ্কটের ছায়া নামছিল। এই রক্ষণশীলতা ও পরিবর্ত্তনবিমুখতাকে ভেঙে দিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ পরোক্ষে ভারতের সামাজিক প্রগতির সহায়তাই করেছিল। কিন্তু সেটা সচেতনভাবে নয়, পরোক্ষে নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই। ভারতের জাতীয় ও সামাজিক প্রগতির যাত্রাপথে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সচেতনভাবে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কৌশলে ভারতবর্ষে যন্ত্রশিল্পের প্রসার স্বাভাবিক ভাবে হয়নি এবং হয়নি ব'লেই আজ ভারতের জনসাধারণের এই চরম দারিদ্র্য, দুর্গতি ও অবনতি। বৃটিশ পুঁজিপতিরা চিরদিন ভারতের শিল্পোন্নতির পথে অন্তরায় হয়েছে। ভারতবর্ষের কাঁচামালে বৃটেনের কারখানায় যে পণ্য উৎপন্ন হয়েছে সেই পণ্য ভারতের বাজারে বেচে বৃটিশ পুঁজিপতিরা তাদের মুনাফা ও মূলধন বাড়িয়েছে। শোষণের এই সনাতন সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের সংস্কার করেছে তারা মধ্যে মধ্যে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাকে বদলাবার প্রয়োজন বোধ করেনি। বৃটিশ মূলধনের ক্রমবর্দ্ধমান নিষ্পেষণে এবং পুরাতন গ্রাম্য-অর্থনীতির ক্রমিক অবনতির ফলে তাই ভারতের জাতীয় অপমৃত্যু হয়েছে।[৮]

---

৮ Karl Marx ; Capital ; Vol I, Chap XIV. Sec 4.
Karl Marx ; "The Future Results of British Rule in India."

ভারতবর্ষ চিরদিনই বস্ত্রাদি রপ্তানি ক'রে এসেছে। বৃটিশ আমলে দেখা গেল ১৮১৪ থেকে ১৮৩৫ সালের মধ্যে ভারতে বৃটেনের বস্ত্র রপ্তানি ১০ লক্ষ গজেরও কম থেকে প্রায় ৫ কোটি ১০ লক্ষ গজ পর্য্যন্ত বেড়েছে, আর ভারতের বস্ত্র রপ্তানি ১,২৫০,০০০ থেকে ৩০৬,০০০ পর্য্যন্ত কমেছে। এইভাবে বৃটেনের কাপড়ের কলগুলি ধীরে ধীরে আমাদের দেশের তাঁত-শিল্পকে উচ্ছেদ করেছে। রেশমশিল্প, লোহা, কাচ ও কাগজশিল্পেরও অবনতি হয়েছে এইভাবে। গোটা উনবিংশ শতাব্দী এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত বৃটিশ পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদীদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষকে বিরাট এক কাঁচামালের ঘাঁটিতে পরিণত করা। ভারতবর্ষকে শুধু কাঁচামালের ঘাঁটিতে পরিণত করতে পারলে বৃটিশ পণ্য বিক্রয়ের একচেটিয়া বাজারেও পরিণত করা সহজ। তার জন্যে নানারকমের শুল্ক-নীতির ও বাণিজ্য-নীতির প্রাচীর তুলে দেওয়া হ'ল চারিদিকে যাতে আর কোন বিদেশী ভাগীদার কেউ না আসতে পারে। ভারতীয় কাঁচামালের প্রধান ক্রেতা হ'ল বৃটেন, আর বৃটিশ পণ্যের প্রধান ক্রেতা হ'ল ভারতবর্ষ। কাঁচামালের মূল্যও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দয়ার উপর নির্ভর করে। তারাই যখন একমাত্র ক্রেতা তখন যে দাম তারা ন্যায্য মনে করবে তাই ভারতীয়কে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে হবে, কারণ অন্য দেশে যাচাই করতে যাওয়ার সুযোগ তার নেই। আর বৃটিশ পণ্য তারা যে দামে বিক্রী করা উচিত মনে করবে সেই দামেই আমাদের কিনতে হবে, কারণ অন্য দেশের মালের সঙ্গে যাচাই ক'রে কেনার সুযোগ নেই। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদীরা এই কৌশলে ভারতবর্ষকে

New York Daily Tribune, Aug, 1853

R. Palme Dutt ; India Today (Indian Edition, 1947) ; Part II, Chaps IV, V ; Pp. 69-107.

K.S. Shelvankar ; The Problem of India : Pp 91-106.

লুঠের রাজ্যে পরিণত করল। তারা ভারতবর্ষে মূলধন নিয়োগ করল প্রধানতঃ তাদের এই শোষণ ও লুণ্ঠনের পথ প্রশস্ত করার জন্যে। ১৯১১ সালে দেখা গেল প্রায় ৩৬ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড মূলধন বৃটিশ পুঁজিপতিরা ভারতে ও সিংহলে নিয়োগ করেছে। এই মূলধন কোন্ ক্ষেত্রে কতটা নিয়োগ করা হয়েছে তার হিসেব দেখলেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মহৎ উদ্দেশ্য দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে :

	(দশ লক্ষ পাউণ্ডের হিসেব)
গবর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপ্যাল্ :	১৮২'৫
রেলপথ	১৩৬'৫
চা-কফি-চিনি ইত্যাদি	২৪'২
ট্রামওয়ে	৪'১
খনি	৩'৫
ব্যাঙ্ক	৩'৪
তেল	৩'২
শিল্প-বাণিজ্য	২'৫
অন্যান্য	৫'১

মোট : ৩৬'৫, অর্থাৎ ৩৬ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড

রেলপথের বিস্তারের দিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নজর দিল কেন? কারণ এই বিরাট ভারতবর্ষকে আদর্শ কৃষি-প্রধান উপনিবেশে পরিণত করার প্রয়োজন। মিস্ কেট মিচেল্ বলেছেন যে গত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রেলপথ গঠন করার ফলে ভারতবর্ষ দ্রুত বৃটেনের কৃষি-উপনিবেশে পরিণত হ'ল। রেলপথের সাহায্যে ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর এক-প্রান্ত পর্য্যন্ত বৃটিশ পণ্য বহন ক'রে নিয়ে যাওয়ার এবং ভারতীয় কাঁচামাল

প্রচুর পরিমাণে চালান দেওয়ার সুবিধা হ'ল। আর এই কাঁচামালের উৎপাদন যাতে বাড়ে তার জন্তেই তো বৃটিশ মূলধন রেলপথের পরেই চা-কফি-চিনি, খনি ও তেলে নিয়োগ করা হ'ল।[১]

প্রথম মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত এই হ'ল মোটামুটি ভারতীয় শ্রমশিল্পের প্রতি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মনোভাবের ইতিহাস। ভারতের শ্রমশিল্পের প্রসারের দিকে বৃটিশ পুঁজিপতিদের দৃষ্টি ছিল না। ভারতবর্ষকে কিভাবে শোষণ করা যায় এবং বৃটিশ শ্রমশিল্পের কল্যাণে শোষণের উপযোগী করা যায় সেইদিকেই তাদের মুনাফা লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাজার যখন চড়া ছিল এবং মুনাফার অঙ্কও মোটা ছিল তখন বৃটিশ পুঁজিপতিরা সেই চড়া বাজারের সুযোগ গ্রহণ করতে ছাড়ে নি। দেখা গেল তখন প্রতি বৎসরই বৃটিশ মূলধন বেড়েই চলেছে। ১৯০৮-১০ সালের মধ্যে ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড মূলধন ১৯২১ সালে হ'ল ২ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড, ১৯২২ সালে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু চড়ার বদলে যখন বাজার মন্দা হ'ল, অর্থনৈতিক সঙ্কট ঘনিয়ে এল তখন বৃটিশ মূলধন দ্রুত ক'মে গেল। ১৯২৪ সালেই বৃটিশ মূলধন ক'মে হ'ল ২৬ লক্ষ পাউণ্ড মাত্র, ১৯২৫ সালে হ'ল ২৪ লক্ষ পাউণ্ড, ১৯২৬ সালে ২০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৯২৭ সালে ১০ লক্ষ পাউণ্ডেরও কম। তারপর আবার 'ইম্পিরিয়াল্ প্রেফারেন্স্', 'অটোয়া চুক্তি', 'যুক্তরাজ্য-ভারতীয় বাণিজ্য চুক্তি' প্রভৃতির সুদিন এল। বৃটিশ পুঁজিপতিরা শুল্ক ও অন্যান্য বিধি-নিষেধের অন্তরালে নিজেদের একচেটিয়া বাণিজ্যের ও শোষণের সুবিধা ক'রে নিল। দেখা গেল, ১৮৯৭ থেকে ১৯১৪ সাল, এই সতের

---

১ Kate Mitchell ; Op. Cit ; Ibid.

Wadia & Merchant ; Our Economic Problem (2nd ed, July 1945) ; Chap. XXVI ; Pp. 462-471.

বছরের মধ্যে ভারতের শ্রমিকসংখ্যা ৪ লক্ষ ২১ হাজার থেকে বেড়ে ৯ লক্ষ ৫১ হাজার হয়েছিল, অর্থাৎ শ্রমিক-সংখ্যা বেড়েছিল প্রায় ৫লক্ষ ৩০ হাজার, আর ১৯২২ থেকে ১৯৩৯ সাল, এই সতের বছরের মধ্যে ভারতের শ্রমিক-সংখ্যা বাড়ল মাত্র ৩লক্ষ ৯০ হাজার, অর্থাৎ ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ১০ হাজার থেকে হ'ল ১ কোটি ৭৫ লক্ষ ১০ হাজার মাত্র। একে শিল্প-প্রগতি বলে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথমার্দ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নিদারুণ সঙ্কটের দিনেও ভারতের গুরুশিল্প ও যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠার পথে নানারকম বাধা সৃষ্টি করেছে, এমনকি ভারতরক্ষা বিধানের হাস্যকর যুক্তি দেখিয়ে তারা যন্ত্রশিল্প, মোটরশিল্প, বিমানশিল্প প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়নি। তারপর অবশ্য নাভীশ্বাস ওঠার পর যৎকিঞ্চিৎ সুযোগ তারা দিতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তারা ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ শিল্পায়নের পথে যেসব অন্তরায় সৃষ্টি ক'রে রেখেছে ও করে তা কোন হিতাকাঙ্ক্ষী গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই করা সম্ভব নয়।[১০]

টাটার কারখানার চূড়াকার চুল্লীর দিকে চেয়ে চেয়ে আমরা যদি ভাবি যে আমাদের শিল্পায়নের আশা পূর্ণ হয়েছে তাহ'লে আমরা ভীষণ ভুল করব। আমাদের দেশে যা খনিজ লোহার সম্পদ আছে তাতে আমরা কম ক'রেও আরও এক ডজন টাটার কারখানার মতো ইস্পাতের কারখানা গড়তে পারি। আমাদের ভারতবর্ষে প্রায় ৩০০ কোটি টন খনিজ লোহা আছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় চারভাগের তিনভাগ। ভারতের খনিজ লোহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাইতে অনেক ভাল, শতকরা ৬৪ ভাগই তার লোহা। অথচ এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নিদারুণ চাপের মধ্যেও আমাদের ইস্পাত তৈরীর পরিমাণ হ'ল ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টন মাত্র, পৃথিবীর মোট তৈরী ইস্পাতের শতকরা মাত্র ১ ভাগের কাছাকাছি।

---

১০ **Wadia & Merchant ; Op. Cit : Pp.278-326.**

৩৬০০ কোটি টন থেকে ৬০০০ কোটি টন আমাদের কয়লা মজুত আছে, কিন্তু আমাদের বাৎসরিক গড়্পড়তা কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ হ'ল ২ কোটি ৪২ লক্ষ টন মাত্র (১৯৩৪'-৩৮ সালের হিসেবে)। বৈদ্যুতিক শক্তির দিক দিয়ে পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ আজ সব চাইতে দুর্ব্বল দেশ। কিন্তু প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ অশ্বশক্তির সমান বারিজাত বৈদ্যুতিকশক্তি ভারতের আছে, যদিও তার মাত্র শতকরা ৩ ভাগ আমরা কাজে লাগাচ্ছি। লোহা, কয়লা ও বৈদ্যুতিক শক্তি অফুরন্ত থাকা সত্ত্বেও আজও আমরা শ্রমশিল্পের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে তার অত্যন্ত সামান্য অংশই প্রয়োগ করতে পেরেছি। কারণ কি? কারণ শিল্পায়নের কোন বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা আমাদের নেই এবং বৃটিশ পুঁজিপতিরা সেই উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় শিল্পায়নের বিরোধিতা ক'রে আসছেন। আজ তাই ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও অকালমৃত্যু। এই হ'ল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবিস্মরণীয় অবদান।

ভারত ও মধ্য এশিয়ার আদিম জাতি

সাধারণভাবে ও সংক্ষেপে আমরা ভারতের কথা বললাম। কিন্তু ভারতের আদিম জাতির কথা এখানে না বললে আলোচনার ত্রুটি হবে ব'লে আমি মনে করি। সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার সঙ্গে আমরা বৃটিশ উপনিবেশগুলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনা করছি। তুলনা অবশ্য কোনদিক থেকেই হয় না। তবু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন ও শোষণনীতির ভয়াবহ পরিণতির কথা বলতে হ'ল সমাজতন্ত্রের আদর্শ ও নীতি ফুটিয়ে তোলার জন্যে। ভারতের আদিম জাতির কথা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নয় এইজন্যে যে মধ্য এশিয়ার প্রতি তুলনার দিক

দিয়ে তাহ'লে সুবিচার করা হয় এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের পরস্পর-বিরোধী আদর্শ আরও তীব্র ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মধ্য এশিয়াকে আদিম জাতির বাসস্থান বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাজিক, উজ্‌বেক, তুর্কীদের একাংশ মধ্যযুগীয় শিক্ষায় ও সভ্যতায় দীক্ষিত হ'লেও, মধ্যযুগীয় রীতি-নীতিতে তুরস্ত হ'লেও, আমরা দেখেছি কির্‌গিজ, কাজাক, কারা-কাল্‌পাক্‌ এবং তাজিক-উজ্‌বেকদের একটা বৃহদংশ বিপ্লবের আগে পর্য্যন্ত আদিম যাযাবর জীবন যাপন করত। পশুপালন, শীকার ও চাষবাস ক'রে তারা জীবিকা নির্ব্বাহ করত। নব্য-প্রস্তর যুগের, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে আদি-প্রস্তর যুগের যাযাবর-জীবন, গ্রাম্য-সমাজ, ও অর্থনীতির সীমানা ছেড়ে তারা এক পা-ও অগ্রসর হ'তে পারেনি। আমীরের আমিরী উদাসীনতা এবং রুশ জারের নির্ম্মম শোষণ নীতির চাপে এই সব দুর্দ্ধর্ষ যাযাবর আদিম জাতি ক্রমেই ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। রুশ জারের সাম্রাজ্যবাদী নীতির সাঁড়াশী আক্রমণে ক্রমে তাদের উদ্দামতা ও সজীবতা ক্ষীণ হয়ে এল এবং মরু-প্রান্তরের স্বাধীন গোষ্ঠী জীবন থেকে তারা উৎখাত হ'ল। যারা ক্ষেতমজুর হ'য়ে জারের জন্যে তুলো চাষ করতে এল না, তারা তাদের কিবিৎকা কাঁধে ক'রে নিখোঁজ হয়ে গে পাহাড়ের গুহায়। ক্রমে দস্যুবৃত্তি ও রাহাজানি হয়ে উঠল তাদের পেশা, গোষ্ঠী জীবনের স্বাভাবিক সংঘপ্রীতি ও মাধুর্য্যের বদলে দলাদলি ও বিরোধ দেখা দিল তাদের মধ্যে। আদিম জীবনের অফুরন্ত প্রেরণার উৎস সভ্য-উৎসব, নাচগান, রূপকথা-অতিকথা সব বিকৃত হয়ে ক্রমে লোপ পেয়ে গেল। মধ্য এশিয়ার এই মুমূর্ষু আদিম জাতিগুলিকে বল্‌শেভিক বিপ্লব নবজীবন দান করেছে। সমাজতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শ তাদের ভাষা দিয়েছে, শিক্ষা দিয়েছে, তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন পুনর্গঠন ক'রে স্বাভাবিক বিকাশের অফুরন্ত সুযো দিয়েছে, তাদের

'মানুষ' করেছে। আজ আর তারা উপেক্ষিত অসভ্য আদিম জাতি নয়। আজ তারা পৃথিবীর যেকোন 'সভ্য' মানুষের সমকক্ষ এবং তথাকথিত 'সভ্য'দের চাইতে হাজারগুণ বেশী সভ্য। আজ তারা ট্রাক্-ট্র্যাক্টর-ট্রেণ চালায়, টার্বাইন্ চালায়, বড় বড় চূড়াকার চুল্লীতে আগুন জ্বালে, যন্ত্র চালায় এবং রাষ্ট্র বা গবর্ণমেণ্ট চালায়। আজ তারা বিজ্ঞানী, বৈমানিক, দুর্দ্ধর্ষ অশ্বারোহী ও পদাতিক, সুদক্ষ যন্ত্রকুশলী ও ইঞ্জিনিয়ার, প্রত্নবিদ্, ঐতিহাসিক ও অধ্যাপক, এবং বিচক্ষণ রাষ্ট্রনেতা। মাত্র বিশ বৎসরের মধ্যে প্রায় ৫০০০ বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাসের পথ অতিক্রম ক'রে আসা একমাত্র 'সমাজতন্ত্রের' দেশেই সম্ভব।

এইবার আমরা ভারতের আদিম জাতির কথা বলি। ভারতবর্ষে এই আদিম জাতির লোকসংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি, কাজাকস্তান-সহ গোটা সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার প্রায় দেড়গুণ। ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই এরা ছড়িয়ে আছে। এই গারো, নাগা, খাসিয়া, লুসাই, মুণ্ডা, ওরাঁও, খড়িয়া, হো, সাঁওতাল, কোল্, ভীল, কুকি, গণ্ড্, আগারিয়া, বাইগা, মারিয়া প্রভৃতি আদিম জাতিগুলিই ভারতের আদি অকৃত্রিম সন্তান। 'অনার্য্য', 'অসুর', 'অসভ্য', 'বর্ব্বর', 'পশু' প্রভৃতি অনেক উপাধি, অনেক বিশেষণে তারা বিভূষিত হয়েছে আজ পর্য্যন্ত। বৈদিক যুগের আর্য্য ঋষি থেকে আরম্ভ ক'রে উনবিংশ শতাব্দীর পাদ্রী সাহেবরা পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর 'সভ্যরা' তাদের এই সব অমূল্য উপাধি দিয়েছেন। কিন্তু তবু তো আমরা ভুলতে পারি না, প্রত্নবিদ্ ও ঐতিহাসিকরা অস্বীকার করতে পারেন না যে এই সব অসভ্য আদিম জাতির আরও 'অসভ্য', আরও আদিম 'পূর্ব্বপুরুষরাই' হাজার হাজার বছর ধ'রে আদিপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর যুগে এই ভারতের সভ্যতার ভিৎস্থাপন করেছে পাথর কেটে, পাথর ছিলে, নানারকমের পাথুরে হাতিয়ার দিয়ে। আমরা আজ

অস্বীকার করতে পারি না যে এই 'অসভ্যদের' পূর্ব্বপুরুষেরাই প্রাক্-বৈদিক যুগের বিরাট সিন্ধু-সভ্যতার ইমারৎ গঠন করেছিল। ভারতের লৌহযুগের সভ্যতাকেও এরাই একদিন বিশ্বসভ্যতার প্রগতির সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সে-ইতিহাসের এখানে আবৃত্তি করা অপ্রাসঙ্গিক। শ্রেণী-সভ্যতার আঁকাবাঁকা, অসমতল অগ্রগতি পৃথিবীব্যাপী মানবজাতির এক বিরাট অংশকে এইভাবে খণ্ড খণ্ড ক'রে বিচ্ছিন্ন বর্ব্বরতার দ্বীপে নির্ব্বাসিত করেছে। তাদের যেন আর এই নির্ব্বাসন দণ্ড থেকে মুক্তি নেই। সুনিশ্চিত ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাওয়া ভিন্ন যেন তাদের আর গত্যন্তর নেই। তারা যেন সব সনাতন 'অসভ্য', শাশ্বত 'বর্ব্বর'। বাস্তবিকই তাই। শ্রেণী-সভ্যতার অস্তিত্ব যতদিন থাকবে পৃথিবীতে এবং যেখানে থাকবে, ততদিন এই আদিম মানবজাতিকে সেখানে নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করতে হবে। ততদিন তাদের মুক্তি নেই। সোভিয়েট দেশে আজ সকল শ্রেণীর ও সকল স্তরের আদিম অসভ্য মানবজাতি মুক্ত, সভ্য ও আধুনিক। কারণ সোভিয়েট দেশে শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা গ'ড়ে উঠ্ছে, সাম্য ও স্বাধীনতাই হ'ল তার বনিয়াদ। পৃথিবীর অন্য কোথাও এই নূতন শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ হয়নি আজও। তাই বড় বড় সভ্যদেশের মধ্যেও আজও এই সব আদিম জাতি তথাকথিত 'সভ্যতার' বুকে উপদংশের মতো বিরাজ করছে। বর্ত্তমান শ্রেণী-সভ্যতা, ধনতান্ত্রিক সভ্যতা ও সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার অন্তর্নিহিত 'বর্ব্বরতার' প্রতিমূর্ত্তি এইসব আদিম মানবজাতি। অসাম্য, শ্রেণী-বৈষম্য ও শ্রেণী-বিরোধের ভিত্তির উপর যে-সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, বিশাল মানবজাতিকে অসভ্য, অর্দ্ধ-সভ্য ও সভ্য এইভাবে বিভক্ত না ক'রে তার তথাকথিত প্রগতিই সম্ভব নয়। শ্রেণী-সভ্যতার সর্ব্বাঙ্গীণ ও সর্ব্বজনীন প্রগতি যে অসম্ভব, পৃথিবীব্যাপী

কোটি কোটি অসভ্য, 'আদিম' মানবজাতির অস্তিত্বই তার অকাট্য প্রমাণ। সমাজতান্ত্রিক সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই এশিয়ার বুকে একদিকে সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার কোটি কোটি 'অসভ্য ও বর্ব্বরেরা' আগামীকালের এশিয়ার বিরাট বৈজ্ঞানিক সভ্যতার সৌধ গঠন করছে, আর একদিকে ভারতে, বর্ম্মায়, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে কোটি কোটি 'অসভ্য ও বর্ব্বরেরা' সভ্যতার দানবীয় শোষণে, নিষ্পেষণে ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। একদিকে আগামীকালের এশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা উদীয়মান, আর একদিকে বর্ত্তমান এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী ও অর্দ্ধ-সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতা বিলীয়মান।

ভারতের আড়াই কোটি অভিশপ্ত আদিবাসী আজ নিশ্চিত বিলুপ্তির পথে। তাদের সম্বন্ধে কিছু জানার আগ্রহ নেই আমাদের। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সম্বন্ধে যেমন নির্ম্মম, উদাসীন, আমাদের দেশের পেশাদার রাষ্ট্রনেতারা ও বিজ্ঞানীরাও তদ্রূপ। ভেরিয়ের এলুইন্ (Verrier Elwin), শরৎচন্দ্র রায় প্রমুখ কয়েকজন নৃবিজ্ঞানীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে আমরা আজ ভারতের এইসব আদিম জাতির ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় পেয়েছি। এই নৃবিজ্ঞানীরা বারম্বার আমাদের সতর্ক ক'রে দিয়েছেন যে যদি আজও আমাদের রাষ্ট্রনেতারা ও বিজ্ঞানীরা এই আদিবাসীদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন না হন তাহ'লে অদূর ভবিষ্যতেই এদের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু কে শুনবে সেই আবেদন? বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে আদিবাসীদের অঞ্চলগুলিকে 'বহির্ভূত এলাকা' ব'লে (Excluded Areas) উল্লেখ ক'রে রেখেছে এবং তাদের দায়িত্ব সম্পূর্ণ বৃটিশ গবর্ণরের উপর! ভারত গবর্ণমেণ্টের 'অরণ্য-বিভাগের' (Forest Department) কল্যাণে আজ এই আদিবাসীরা তাদের আদি বাসস্থান থেকে উৎখাত

হ'চ্ছে এবং নিজেদের চিরদিনের পেশা ছেড়ে দলে দলে এসে অরণ্যের কুলিমজুর হ'চ্ছে। আজ তারা ভিটেমাটি থেকে উৎখাত চা বাগানের কুলি, খনিমজুর অথবা অরণ্য বিভাগের দিনমজুর। আজ তাদের সামাজিক ও নৈতিক জীবনের ভিত্তি ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। বৃটিশ রাজকর্ম্মচারীরা তাদের নৈতিক অবনতির শেষ সীমায় টেনে নামিয়েছে। তাদের অর্থনৈতিক সামাজিক জীবন পুনর্গঠনের কোন পরিকল্পনা নেই। উদ্ধত ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির প্রচণ্ড আক্রমণে তারা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

ভারতের অফুরন্ত খনিজ লৌহ-সম্পদের কথা আগে বলেছি। মধ্য-প্রদেশের মাইকাল পর্ব্বতমালা ও বিলাসপুর রাজ্যে এই খনিজ লোহা প্রচুর আছে। তারই পাদদেশে 'আগারিয়া' জাতির বাস। এই আগারিয়ারাই বোধ হয় ভারতের আদিম কর্ম্মকারদের বংশধর। এলুইন্ সাহেব বলেছেন, [১১] প্রস্তর যুগ থেকে লৌহযুগে ভারতীয় সভ্যতাকে যারা উন্নীত করেছিল, আগারিয়ারা তাদেরই বংশধর কল্পনা করলে বিশেষ অপরাধ হয় না। হাঁপরের ও হাতুড়ির শব্দে আজও আগারিয়া গ্রামের ঘুম ভাঙে। আজও আগারিয়া ছেলেমেয়েরা 'লোহাসুর' ও 'কয়লাসুরকে' পূজো ক'রে প্রথমে হাঁপর টান্তে, চুল্লীতে আগুন দিতে এবং তারপরে হাতুড়ি পিট্তে শেখে। কিন্তু আগারিয়াদের এই কারিগরি, এই চুল্লী-হাঁপর-কামারশালা সবই ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। বিদেশী ও দেশী কারখানায় তৈরী সস্তা লোহার যন্ত্রপাতির সঙ্গে তাদের গ্রাম্য কামারশালা পাল্লা দিয়ে পারছে না। গর্ব্বোদ্ধত, মুনাফাপিশাচ ধনতন্ত্র আদিম গোষ্ঠী-

---

১১ Verrier Elwin : The Agaria
Verrier Elwin : The Baiga
Verrier Elwin : Maria, Murder and Suicid

অর্থনীতিকে পিষে মারছে। তার উপর আছে রাজার খাজনা, চুল্লী প্রতি খাজনা, হাঁপর প্রতি খাজনা, খনিজ লোহার খাজনা। এ ছাড়াও আছে সরকারী অরণ্য-বিভাগের ট্যাক্স, অরণ্যের কাঠ থেকে কাঠকয়লা করার জন্যে ট্যাক্স। কাঠকয়লার অভাবে কত আদিম জীবন্ত চুল্লী যে নিভে গিয়েছে তার ঠিক নেই। খাজনার চাপে কত হাতুড়ির শব্দ নীরব হয়ে গিয়েছে তার হিসেব নেই। অরণ্য বিভাগের সরকারী কর্ম্মচারীরা তাঁদের "অরণ্য-সম্পদ" রক্ষা করছেন, কাঠকয়লা নেই। আগারিয়াদের বাৎসরিক আয় ৩০৲, অথচ চুল্লী প্রতি খাজনা বছরে ১২৲ থেকে ১৬৲ পর্য্যন্ত। সুতরাং চুল্লী নিভে গেল, হাতুড়ির শব্দও থেমে গেল। তপ্ত লোহা পেটার শব্দে আগারিয়া গ্রামের ঘুম ভাঙে না আর। মুমূর্ষু আগারিয়াদের এই করুণ ও মর্ম্মান্তিক কাহিনী এলুইন্ সাহেব বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আগারিয়া অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত। তারা জানে তাদের বিরুদ্ধে বাইরের সভ্যতা, বাইরের সমাজ ষড়যন্ত্র করেছে। তারা জানে বিকটাকার চূড়াকার আধুনিক চুল্লী-দানবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের কাঠকয়লার গ্রাম্য-চুল্লী পারবে না। তারা জানে তাদের ধ্বংস অনিবার্য্য, তাদের জাতের কোন অস্তিত্বই থাকবে না। তাদের গ্রামে সেই 'আদিম পবিত্র আগুন' জ্বলবে না কোনদিন, সেই 'পবিত্র লোহার' আর চিহ্ন থাকবে না। কয়লাসুর ও লোহাসুর 'যন্ত্র-দানবের' কাছে হার মেনে তাদের গ্রাম ছেড়ে চ'লে যাবে।

কিন্তু এই আগারিয়াদের ধ্বংস কি অনিবার্য্য? আগারিয়াদের মতো কোটি কোটি তথাকথিত 'অসভ্য' মানুষের মৃত্যু কি অবশ্যম্ভাবী? ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের নিষ্পেষণে তাদের ধ্বংসই অনিবার্য্য। একমাত্র সমাজ-তন্ত্রের প্রভাবে তাদের মুক্তি ও প্রগতি সম্ভব। মধ্য এশিয়ার তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, কাজাকস্তান ও কিরগিজস্তানের ইতিহাস

এই মুক্তির ও প্রগতির ইতিহাস। মধ্য এশিয়ার কোন আদিম চুল্লীকে ধ্বংস ক'রে আধুনিক চক্রাকার চুল্লীদানব গ'ড়ে ওঠেনি। মধ্য এশিয়ার কোন আধুনিক নগর আদিম কিবিৎকা-পল্লীকে ধ্বংস করেনি। মধ্য এশিয়ার কোন আদিম কামারশালাকে আধুনিক যন্ত্র-দানব গিলে খায়নি। সেখানকার আদিম চুল্লী, আদিম কিবিৎকা-পল্লী, আদিম কামারশালা আজ বিজ্ঞানের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে আধুনিক চুল্লী, নগর ও কারখানায় পরিণত হয়েছে। তাদের বিকাশ হয়েছে, বিলুপ্তি ঘটেনি। যন্ত্র সেখানে দানব হয়ে গর্জ্জন ক'রে ওঠেনি। কাজাক, কির্‌গিজ, কারাকাল্‌পাকরা সেই গর্জ্জন শুনে আগারিয়াদের মতো সন্ত্রস্ত হয়নি। তারা শুনেছে নবযুগের মুয়াজ্জীন্‌ কলকারখানার আজান, যন্ত্রের আজান—

গোরস্তান হ'ল গুলিস্তান

"সারে জঁহাসে অচ্ছা হিন্দোস্তাঁ হমারা।
হম বুলবুলেঁ হৈঁ ইসকী, য়হ বোস্তাঁ হমারা।।"

—ইকবাল

দুনিয়ার সেরা আমাদের দেশ, আমরা এর বুলবুল, এ আমাদের গুলিস্তান। এ হ'ল কবির স্বপ্ন, মহাকবি ইকবালের কল্পনা, ভারত-বাসীরও মনের বাসনা, কিন্তু বাস্তব তা নয়। গুলিস্তান বাস্তব নয়, গোরস্তানই বাস্তব। গোটা দেশটাই আজ প্রাণহীন গোরস্তান, বুলবুলের কলকাকলি-মুখরিত গুলিস্তান নয়। শুধু আমাদের এই ভারতবর্ষ নয়, সারা দুনিয়া। মানুষ যেখানে মানুষকে শোষণ করে, শাসন করে, মানুষ যেখানে মানুষকে ঘৃণা করে, হিংসা করে, হত্যা করে, যেখানে মমতা নেই, মনুষ্যত্ব নেই, সমবেদনা নেই, সেখানে মানুষ বাস করে কি ক'রে? তবু বাস করছে মানুষ, এরই মধ্যে বাস করছে, এরই মধ্যে জন্মাচ্ছে, এরই মধ্যে ছ্যাক্‌রা গাড়ীর মতো জীবনটাকে টেনে হেঁচ্‌ড়ে নিয়ে বেঁচে থাকছে

এবং এই অশ্রুহীন, বেদনাহীন, মমতাহীন মরুভূমির মধ্যে মরছে। স্বাস্থ্য নেই, শক্তি নেই, আয়ু নেই, বল নেই, বীর্য্য নেই, কেবল 'এ্যানাটমির' পাঠ্য-পুস্তকের সচিত্র কঙ্কালমূর্ত্তির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে মানুষ। সারা দুনিয়ার নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে এই কঙ্কালের শোভাযাত্রা ও শবযাত্রা। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে তাই বিষাক্ত কীটপতঙ্গ ও বীজাণুদের উৎসব। মানুষের বাসস্থান জঙ্গলের চাইতেও জঘন্য, আদর্শ "গ্র্যাণ্ড গোরস্তান"। বুলবুল উড়ে গিয়েছে বনে। বুলবুল তো দূরের কথা, মানুষের মুখে হাসি নেই, মানুষের কণ্ঠে গান নেই। আছে শুধু ইস্পাত ও কংক্রীটের নীরেট, নির্ম্মম নগর, ঠিক দাম্ভিক পুঁজিপতির মতোই তার ঔদ্ধত্য ও হৃদয়হীনতা, আর আছে স্যাঁত্‌সেঁতে, জীর্ণশীর্ণ, কঙ্কালসার গ্রাম, শোষিতের ও নির্য্যাতিতের নগ্ন প্রতিমূর্ত্তি।

অরণ্য প্রান্তর পর্ব্বত-গুহা থেকে পাখির নীড়ের মতো লতায়-পাতায় ঘেরা কুটীরগুচ্ছ নিয়ে এক-একটি গ্রাম, গ্রাম থেকে নগর, নগর থেকে সহর মহানগরী, রাজধানী—এই হ'ল মানুষের বাসস্থানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং সভ্যতারও। যুগে যুগে মানুষের সমাজের রূপ বদলেছে এবং সেই রূপ প্রতিফলিত হয়েছে মানুষের পরিবর্ত্তনশীল বাসস্থানে। সভ্যতার যাত্রাপথে এমনি ভাবেই মানুষ গুহা ছেড়ে একদিন গ্রাম গড়েছিল এবং বর্দ্ধিষ্ণু জীবনের তাগিদে গ্রাম থেকে গড়েছিল নগর। নগরের আবির্ভাব হয়েছিল সমাজের প্রয়োজনে, মানুষের জীবনের তাগিদে। ব্রোঞ্জ ও লৌহ যুগে শ্রম-ভেদের ভিত্তির উপর যখন প্রথম নগর গ'ড়ে উঠেছিল তখন সহযোগিতা ও সংঘবদ্ধতাই ছিল তার আদর্শ। নগরে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ একত্র বসবাস করতে পারে, চলাফেরা করতে পারে, স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ কাজকর্ম্ম করতে পারে, প্রয়োজন হ'লে সহযোগিতা করতে পারে, শ্রম ও পণ্য বেচাকেনা থেকে শিক্ষা-দীক্ষা ও ভাবের আদান-

প্রদান করতে পারে, সাধারণ কামনা, সাধারণ চাহিদা সংঘবদ্ধভাবে চরিতার্থ করতে পারে এবং একডাকে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিপদের সময় আত্মরক্ষার জন্যে দাঁড়াতেও পারে। ভেদ ও বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য ও সঙ্গতি স্থাপন করা, স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্বের মধ্যে সংহতি ও সহযোগিতার ভিত্তি গ'ড়ে তোলাই ছিল নগরের লক্ষ্য। সচেতন ও সুদক্ষ কারিগরের অমর কীর্ত্তি হ'ল নগর। শ্রেণী-সমাজ ও শ্রেণী-সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নগরও ধীরে ধীরে তার লক্ষ্যচ্যুত হ'ল। একতা, সংহতি, সঙ্গতি ও সহযোগিতার প্রাথমিক লক্ষ্য ছেড়ে 'নগর' ভেদ-বৈষম্যের তীব্রতা বৃদ্ধি ক'রে সমৃদ্ধ ও উন্নত হ'ল। চারিদিকে প্রাকার তুলে গ'ড়ে উঠল সামন্তযুগের নগর। গড়বন্দী প্রাসাদ, দুর্গ, যমপুরী, নির্য্যাতনপুরী, অন্ধ-কূপ, বেগমখানা, মন্দির, মসজিদ, গির্জ্জার গম্বুজ-মিনার-চূড়া, টোল মাদ্রাসা —এই সব নিয়ে মধ্যযুগের নগরের আবির্ভাব হ'ল। তবু প্রকৃতির সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে এখনও তার যোগাযোগ রইল, গ্রামও একেবারে বিচ্ছিন্ন হ'ল না নগর থেকে। রাজকীয় উদারতা ও বাদ্‌শাহী বদান্যতার নিদর্শন স্বরূপ রইল সাধারণ স্নানাগার,সরোবর, পুষ্করিণী, বাগান, বাগিচা আর আত্মনির্ভরশীল গ্রাম। সামন্তপ্রভুর প্রতাপ প্রতিপত্তি ও ভোগ-বিলাসের 'নন্দন-কানন' হ'ল মধ্যযুগীয় নগর। তারপর এল শ্রম-শিল্পের যুগ, ইস্পাত-কয়লা-বাষ্পের যুগ, কলকারখানার যুগ। এ-যুগ তীব্র ব্যস্ততার যুগ, পণ্যময়তার যুগ, স্বাধীন প্রতিযোগিতার যুগ। 'সবার উপরে কারখানা সত্য, বস্তি সত্য'—এই হ'ল এযুগের ধ্বনি। হাজার হাজার লোক এসে ভিড় করতে লাগল কারখানায় ও বস্তিতে এবং এই কারখানা ও বস্তিই হ'ল নূতন নগরের কেন্দ্রস্থল। সামন্তযুগ এবং তার পরবর্ত্তী বণিকযুগের অবসান হ'ল। পুরাতন গিল্ডগুলি ভেঙে গেল, শ্রমিক-শ্রেণীর নিরাপত্তা ব'লে আর কিছু থাকল না। শ্রম ও পণ্য বেচাকেনার

বাজার গ'ড়ে উঠল। যন্ত্রশিল্পের উদ্বৃত্ত কাটানোর জন্যে বাজারের প্রয়োজন, কাঁচামাল সরবরাহের ঘাঁটি প্রয়োজন। সুতরাং পররাজ্য লুণ্ঠন করার জন্যে অভিযান আরম্ভ হ'ল। কয়লা, লোহা আর নূতন যান্ত্রিক শক্তি, বাষ্পীয় ইঞ্জিন, এই হ'ল এ-যুগের অর্থনৈতিক প্রাণশক্তি। এই প্রাণশক্তি নিয়ে নূতন নূতন কারখানা যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে হুড়মুড় ক'রে গজিয়ে উঠল। চিন্তা-ভাবনার সময় নেই কারও। পণ্য চাই, অর্থ চাই, মুনাফা চাই। স্টীম ইঞ্জিন্, স্টীম বয়লার, নূতন নূতন যন্ত্র, এরাই হ'ল এযুগের দেবতা, কারণ এরাই অর্থ দান করছে, মুনাফা দান করছে, পণ্য ও প্রাণ দান করছে। দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে হবে অসংখ্য। মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্যে শ্রেষ্ঠ স্থান সব দখল করতে হবে। যন্ত্র-দেবতার "মন্দির" কারখানা গ'ড়ে উঠবে নদীর তীরে তীরে। কাপড়ের কল, কেমিক্যাল্ ফ্যাক্টরী, লোহার কারখানা, সব কিছুর জন্যে আগে জল চাই, প্রচুর জল। স্টীম বয়লারের জন্যে জল প্রয়োজন, তপ্ত জিনিষকে ঠাণ্ডা করার জন্যে জল প্রয়োজন, নানা রকমের রাসয়নিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার জন্যে জল প্রয়োজন। তা ছাড়া কারখানার আবর্জ্জনা, ময়লা, উপজাত অংশ, ধাতুমল প্রভৃতি সাফ্ করার জন্যেও জল প্রয়োজন। নদী সব কাজই করতে পারে। প্রচুর জলও সরবরাহ করতে পারে, আবার কারখানার আবর্জ্জনা ময়লা ধাতুমল সব স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যেতেও পারে। অর্থাৎ নদীর জলে ট্যাঙ্ক ও নালা-নর্দ্দমা দুই হতে পারে। হ'লও তাই। মানুষের জীবনে নদীর প্রয়োজন মিটে গেল। নদীর জল বিষাক্ত হয়ে উঠল, নদীর তীরও কদর্য্য হয়ে উঠল। মিঃ ল্যুইস্ মামফোর্ডের ভাষায়, এই ভাবেই জন্ম হ'ল শিল্পযুগের কদর্য্য 'coketown'-এর। নদী হ'ল 'তরল আবর্জ্জনাস্তূপ', আর তার চারিদিকে ছাই, রাবিশ, ধাতুমল, লোহা-লক্কড়ের ছোট ছোট 'পাহাড়' ঠেলে উঠল। দৃষ্টিপথে দিগন্তরেখার

আর অস্তিত্ব রইল না। মানুষের বাসস্থানের কোন মর্য্যাদা, কোন বৈশিষ্ট্য রইল না। যেখানে-সেখানে মালিকের মর্জি ও সুবিধা অনুযায়ী কারখানা গ'ড়ে উঠল।[১] মানুষের বাসগৃহগুলি তারই মধ্যে, সেই কারখানা, শেড্ আর রেলপথের মধ্যে, ভাঙা কাচ, মরচে-পড়া লোহা, রাশি রাশি ছাই, রাবিশ, কয়লার গুড়ো ও স্লাগের উপর আগাছার মতো গজিয়ে উঠল। ময়লা-মলের দুর্গন্ধ, চিমনীর ধোঁয়া, যন্ত্রের বিকট আওয়াজ, এই হ'ল মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গী। যন্ত্রের আওয়াজ, ট্রেনের একঘেয়ে 'ঘ্যচ্যাঘ্যাচ্' শব্দ যেন দিনরাত আশপাশের লোকালয়ের লোক-গুলিকে লক্ষ্য ক'রে বলছে, "বাঁচতে হয় বাঁচো, না হয় জাহান্নমে যাও, জা-হা-ন্ন-মে যাও জা-হা-ন্ন-মে জা-হা-ন্ন-মে"! চারকোণা একটানা ব্লকের পর ব্লক্ সারিসারি গজিয়ে উঠল শ্রমিকদের বস্তিগুলি, একঘেয়ে রাস্তা, একঘেয়ে অলিগলি, মুক্ত আলো-বাতাস নেই কোথাও, এক টুক্‌রো খোলা জায়গার চিহ্ন নেই কোথাও, যেখানে শিশুরা খেলা করতে পারে, হয়রাণ হয়ে কারখানা থেকে ফিরে মজুরেরা যেখানে একটু হাঁফ ছাড়তে পারে। স্থপতির শিল্পীসুলভ কল্পনার কোন বালাই নেই। সেট্‌স্কয়ার, 'T', স্কেল্-কম্প্যাস্ নিয়ে কাগজের উপর কতকগুলো 'স্কয়ার' ও 'রেক্‌ট্যাংগল্' আঁকতে পারলেই কারখানা থেকে বাসস্থানের পরিকল্পনা সব শেষ হয়ে গেল। এই ভাবে গ'ড়ে উঠল শিল্পযুগের 'কোক্‌টাউন্', লণ্ডন গ্ল্যাসগো হাম্‌বুর্গ চিকাগো মস্কো পেট্রগ্রাদ বোম্বাই কলিকাতা। ক্ষয়রোগ, অকালমৃত্যু হ'ল এই কয়লা ও ইস্পাত নগরীর অবদান।

---

১ Lewis Mumford : The Culture of Cities : (1944 ed.) Chap III, Secs 5 & 11—Pp. 161-168, 190-198.

মামফোর্ডের বিশ্লেষণ ও বর্ণনা অত্যন্ত চমৎকার। 'কয়লানগরী' ও 'শিল্প-নগরীর' বর্ণনা এঙ্গেলস্ তাঁর "Condition of the Working Classes in England in 1844" গ্রন্থের মধ্যে অতি সুন্দরভাবে দিয়েছেন।

শিল্পযুগের কদর্য্য কয়লা নগরীর পর এল একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও মদমত্ত সাম্রাজ্যবাদের 'আত্মসর্ব্বস্ব মহানগরী', Geddes, Mumford প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীরা যাকে 'Megalo-polis' বলেছেন। মামফোর্ড বলেছেন: "From Washington to Tokyo, from Berlin to Rome, the architecture of Imperialism is a monotonous reflection of the military-bureaucratic mind. They exhibit the extravagance of the financial *arriviste*, without a touch of creative warmth:......" "ওয়াশিংটন থেকে টোকিও, বার্লিন থেকে রোম পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সাম্রাজ্যবাদী স্থাপত্যের সেই সামরিক-আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের বৈচিত্র্যহীন নিদর্শন। পর্ব্বত-প্রমাণ পুঁজি ও মুনাফার অপচয়, প্রতিভার কোন স্পর্শ নেই কোথাও"। অফুরন্ত অর্থের অপকীর্ত্তি স্বরূপ বিরাট বিরাট ইস্পাত-কংক্রীট-পাথরের ইমারৎ-অট্টালিকা, একচেটিয়া পুঁজিবাদী ও উন্মাদ সাম্রাজ্যবাদীর গগনভেদী দম্ভের মতো উত্তুঙ্গ। কংক্রীটের সীমাহীন বিকটাকার স্তম্ভশ্রেণী, বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন, বিশাল বিশাল হলঘর, অফিস, সভাগৃহ, গোরস্তানের বিরাট স্মৃতিস্তম্ভের মতো থম্‌থম্ করছে। সব যেন উদ্ধত অহমিকা, প্রচণ্ড সামরিক শক্তি, আমলাতান্ত্রিক জড়ত্ব ও সীমাহীন মুনাফার কদর্য্য আত্ম-প্রকাশ। তারপর সামরিক বর্ব্বরতার উলঙ্গ প্রতীকস্বরূপ 'Tyranno-polis'-এর আবির্ভাব, হিটলার-মুসোলিনীর রাজধানী। কিন্তু তারপর কি? তারপর কি 'Nekro-polis'—'মৃত্যু-নগরী'? মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর মধ্যে প্রাণঘাতী বীজাণুদের মহোৎসব? পারমাণবিক বোমার সাইরেন্, গণমৃত্যু ও সর্ব্বগ্রাসী ধ্বংসলীলার মহাকেন্দ্র স্বরূপ "মৃত্যু-নগরীর" আবির্ভাব? এই কি মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি ও শ্রেষ্ঠ অবদান?

সমাজতান্ত্রিক নগর-পরিকল্পনা

এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন সোভিয়েট দেশের স্থপতিরা, যাঁরা নূতন সভ্যতার উপযুক্ত নগর গ'ড়ে তুলছেন। সমাজতান্ত্রিক নগর ও গ্রাম-পরিকল্পনার উদ্দেশ্য শুধু সুন্দর সুন্দর নগর ও গ্রাম গ'ড়ে তোলা নয়, প্রকৃতির বুকের উপর মানুষের এমন একটি বাসগৃহ নির্ম্মাণ করা, এমন একটি স্বাস্থ্যকর পরিপার্শ্ব তৈরী করা, যেখানে মানুষ স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারবে, মানুষের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক বিকাশ হবে, মানুষের সংঘ ও সামাজিক জীবন সুস্থ ও সবল হয়ে উঠবে। মানুষ হবে বলবান, বীর্য্যবান, উদার ও অনুভূতি-প্রবণ। কলকারখানার জন্যে, যন্ত্রের জন্যে, উদ্বৃত্ত মুনাফার অপচয়ের জন্যে, গর্ব্বোদ্ধত পুঁজিবাদী বা স্বেচ্ছাচারী ডিক্টেটরের খেয়াল চরিতার্থতার জন্যে নগর গ'ড়ে উঠবে না। কলকারখানা, যন্ত্র, সব যেমন মানুষের জন্যেই, তেমনি নগরও গড়া হবে প্রধানতঃ মানুষের জন্যে। এই হ'ল সোভিয়েট স্থপতিদের আদর্শ, নূতন সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা, মানবিক সভ্যতার বনিয়াদ যাঁরা গড়ছেন তাঁদের আদর্শ।[২]

নূতন বাসস্থান, নূতন নগরের পরিকল্পনা তাহ'লে কি রকম হবে? মামফোর্ড বলেছেন: "What is important is to treat the

---

২ Art in the U.S.S.R : Edited by C. G. Holme : Pp 12-26 সোভিয়েট স্থাপত্যের আদর্শের কথা অধ্যাপক ডি. আর্কিন এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'স্থাপত্য' শীর্ষক প্রবন্ধের মধ্যে সুন্দর ও সহজভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সোভিয়েট নগর পরিকল্পনা ও স্থাপত্য সম্বন্ধে সবিস্তারে ওয়েব-দম্পতীর "Soviet Communism—A New Civilisation" (3rd ed—One Volume) গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে (The Remaking of Man) চতুর্থ বিভাগে আলোচনা করা হয়েছে।

geographic, economic, social, technical ..nd personal requirements on a single plane." "ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজ, টেক্‌নিক্‌ ও ব্যক্তি সকলকে এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার ক'রে, সকলের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি স্থাপন ক'রে মানুষের নূতন বাসস্থান নির্ম্মাণ করাই আসল সমস্যা।" বর্ত্তমান বাসস্থানগুলি এমনভাবে সাজিয়ে তৈরী করতে হবে যাতে বাসিন্দাদের আহার-বিহারের সুবিধা হয়, প্রচুর আলো-বাতাসের পথ মুক্ত থাকে, দেহের স্বাস্থ্য ও মনের স্ফূর্ত্তি না নষ্ট হয়, বিশ্রাম ও নিদ্রার কোন ব্যাঘাত না হয়, পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের গোপনতা বজায় থাকে, শিশুরা মনের আনন্দে সঙ্গীদের নিয়ে খেলা করতে পারে, মানুষ হতে পারে। এর সঙ্গে সামাজিক জীবনেরও সুযোগ সুবিধা থাকা দরকার। তার জন্যে খোলা জায়গা চাই যেখানে সকলে সামাজিক মানুষ হিসেবে মেলামেশা করতে পারে, সকলের মধ্যে সামাজিক হৃদ্যতা বাড়তে পারে। তার জন্যে চাই পার্ক, চাই পাঠাগার, চাই স্কুল, চাই খেলার মাঠ, থিয়েটার, সিনেমা, ক্লাব। শিশুদের জন্যে চাই নার্সারী, লালনাগার। মামফোর্ড বলেছেন, নূতন নগর ও সহর মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষানিকেতনের মতো গ'ড়ে উঠবে। স্কুল, ক্লাব, পাঠাগার, বিজ্ঞানমন্দির, সভাগৃহ, খেলার মাঠ, বিশ্রামাগার, ভোজনাগার, থিয়েটার, সিনেমা, নার্সারী এ-সব হবে এই নূতন সামাজিক ও মানবিক জীবনের ছোট ছোট শিক্ষায়তন, আর নগর ও সহর হবে বিশ্ববিদ্যালয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থাপরিষদ ও কলকারখানাও এই পরিকল্পনা থেকে বাদ যাবে না। এগুলিও সামাজিক ও সংঘবদ্ধ জীবনযাত্রার আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্র রূপে গ'ড়ে উঠবে। এই নগর-পরিকল্পনায় প্রকৃতিকে অবজ্ঞা করা হবে না, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করা হবে এবং এসব স্বীকার করেও টেক্‌নিকের কৃতিত্ব দেখাবার অফুরন্ত

সুযোগ থাকবে স্থপতির, মানুষের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বকেও বিকৃত ক'রে হত্যা করা হবে না।[৩]

এই হ'ল সমাজতান্ত্রিক নগর-পরিকল্পনার আদর্শ। আদর্শ নগর সম্বন্ধে ল্যুইস মামফোর্ড বলেছেন: "The city in its complete sense......is a geographic plexus, an economic organisation, an institutional process, a theatre of social action, and an aesthetic symbol of collective unity." "আদর্শ নগর হ'ল একটা ভৌগোলিক জাল বিশেষ, একটা অর্থনৈতিক সংগঠন, জীবন্ত প্রতিষ্ঠান, জীবন-নাট্যের রঙ্গমঞ্চ, ঐক্য ও সংহতির সৌন্দর্য্য-প্রতীক।" এই আদর্শ নগরই সোভিয়েট দেশের স্থপতিরা গ'ড়ে তুলছেন। তাঁরা আজ কদর্য্য 'কয়লা-নগরী' ও উদ্ধত 'আত্মসর্ব্বস্ব মহানগরীর' ভিত্তি চূর্ণ ক'রে দিয়েছেন। কুৎসিত কয়লা-নগরী ও উদ্ধত মহানগরীকে ধ্বংস করা আজ সোভিয়েট দেশে সম্ভব হয়েছে এই জন্যে যে কুৎসিত পুঁজিবাদী ও উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদীরা আজ সোভিয়েট সমাজ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। মামফোর্ড সাহেব তাঁর "নগর-সভ্যতার ক্রমবিকাশ" সম্বন্ধে বিরাট মূল্যবান গ্রন্থের মধ্যে চমৎকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির ও অসাধারণ বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় দিয়েও শেষ পর্য্যন্ত একথাও স্বীকার করতে ভয় পেয়েছেন যে সামাজিক বিপ্লব ভিন্ন নগর-পরিকল্পনার বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়। গ্রন্থশেষে তিনি যে ভবিষ্যতের নগর-পরিকল্পনার খসড়া দিয়েছেন তার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক নগর-পরিকল্পনার বিশেষ কোন পার্থক্য না থাকলেও, তিনি মূল সমস্যাটাই এড়িয়ে গিয়েছেন। পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস না হ'লে 'coketown', 'metro-polis', বা 'megalo-polis' কিছুই ধ্বংস হতে পারে না এবং

৩ Lewis Mumford : Op. Cit : Chap VII - Pp 402-486

সংঘ-জীবন, সহযোগিতা, মানবিকতা ও ব্যক্তিগত বি শেষত্ব নিয়ে নূতন নগর-পরিকল্পনা করাও সম্ভব নয়। বিপ্লবের পর সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়কদের সামনে নগর-পরিকল্পনার সমস্যাই তাই অন্যতম সমস্যারূপে দেখা দিয়েছিল এবং সেই সমস্যা সমাধানের জন্যে দেশের সকল শ্রেণীর বিজ্ঞানী, শিল্পী, স্থপতি ও ইঞ্জিনিয়ারদের সহযোগিতা তাঁরা আহ্বান করেছিলেন। পুরাতন সমাজের ভিৎ যখন ধ'সে পড়ল তখন সেই সমাজের সর্ব্বপ্রধান বাইরের কাঠামো 'নগর ও গ্রামের' ভিৎ অটুট রাখা অর্থহীন। কারণ বাইরের কাঠামো যদি অটুট রাখা হয় তাহ'লে তার মধ্যে মানুষের দেহ ও মন ঠিক পুরাতন ছাঁচেই গ'ড়ে উঠবে। পুরাতন ছাঁচে-গড়া বলহীন, বীর্য্যহীন মানুষ, হিংসা-লোভ-বিদ্বেষ-ভরা মানুষ, মমতাহীন মনুষ্যত্বহীন মানুষ, সমাজদ্রোহী আত্মঘাতী মানুষ, সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার নির্ম্মম শত্রু। মানুষকে নূতন ক'রে গ'ড়ে তুলতে হ'লে, মানুষকে বলবান, বীর্য্যবান ও দীর্ঘায়ু করতে হ'লে, মানুষকে নূতনভাবে শিক্ষা দিতে হ'লে, মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন আমূল পরিবর্ত্তন করতে হ'লে, সমাজের বহিরঙ্গেরও আমূল সংস্কার ও পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন। সমাজের সর্ব্বপ্রধান বহিরঙ্গ হ'ল মানুষের বাসস্থান, মানুষ যেখানে বাস করে, আহার করে, নিদ্রা যায়, চিন্তা করে, অর্থাৎ নগর ও গ্রাম। নগর-পরিকল্পনা তাই সোভিয়েট দেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যারূপে দেখা দিল।

সোভিয়েট স্থপতিরা এই সমস্যার সমাধান করলেন আশ্চর্য্যভাবে। সমাজতান্ত্রিক শিল্প-প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শত শত নূতন নগর গ'ড়ে তোলার প্রয়োজন হ'ল, পুরাতন নগরগুলিকেও সংস্কার করতে হ'ল। এই বিরাট পরিকল্পনা দ্রুত কার্য্যে পরিণত করা সহজ নয়। কিন্তু করতেই হবে, কারণ কলকারখানা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে, নগরের ও সহরের লোক-সংখ্যাও হু হু ক'রে বাড়ছে। বাসস্থানের প্রয়োজন এবং কোনরকমে

মাথা গুঁজে জীবন ধারণের মতো বাসস্থান নয়, মাথা তুলে পূর্ণ জীবন ভোগ করার মতো বাসস্থান। ১৯৩০-৩১ সালের মধ্যে তাঁরা যে নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী নগর গ'ড়ে তুললেন তাই দেখে একজন প্রত্যক্ষদর্শী বৃটিশ সমালোচক লিখলেন : "সহর, নগর ও সহরতলীর পরিকল্পনা সবই খুব চমৎকার। যাঁরা পরিকল্পনা করেছেন তাঁরা সব দিকই সুন্দরভাবে বিচার করেছেন। কারখানার শক্তি ও কাঁচামাল সরবরাহের কথা, উৎপন্ন পণ্য চালান দেওয়ার কথা, কোনটাই তাঁরা বাদ দেননি। নগর ও সহরগুলিকে এক-একটি এলাকায় অতি সুন্দরভাবে ভাগ করা হয়েছে। সব চাইতে বড় কথা হ'ল, পরিকল্পনার মধ্যে সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্য ও আমোদ-প্রমোদের সুযোগ প্রচুর আছে। গাছ ও বাগানের অভাব নেই, ভাল ভাল সিনেমা, থিয়েটার, হাসপাতাল, স্কুল সব আছে। কিন্তু সোভিয়েটের নগর-পরিকল্পনা যেমন আমাদের চাইতে অনেক ভাল ও উন্নত, তেমনি আমাদের প্রত্যেকটি বাড়ী সোভিয়েটের চাইতে অনেক ভালভাবে তৈরী। এইখানেই আসল সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ভাল জিনিষ খারাপভাবে করা ভাল, না খারাপ জিনিষ ভালভাবে করার কৃতিত্ব বেশী?" তারপর সমালোচক মিঃ উইলিয়ম-এলিস্ বলেছেন যে সোভিয়েটের সমস্যা হ'ল কোন বাড়ীতে ভাল দু'একটা জানলা লাগানো, কারও মেজে ভাল করা, কারও দরজা বড় করা ইত্যাদি। এ-সমস্যা সমাধান করা কয়েকদিনের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু তিনি বলেছেন : "What about our mistakes? Our mistakes need dynamite." "আর আমাদের ভুল? আমাদের ভুল সংশোধন করতে হ'লে ডিনামাইটের প্রয়োজন হবে।" বৃটেন বা অন্যান্য দেশের পরিকল্পনার মারাত্মক ত্রুটি ডিনামাইট দিয়ে সংস্কার করতে হবে, অর্থাৎ একেবারে ঢেলে সাজতে হবে।[৪]

৪ ওয়েব-দম্পতীর উপর্যুক্ত গ্রন্থের একই অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত।

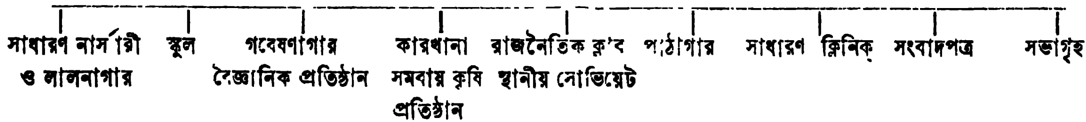
বর্দ্ধিষ্ণু লোকসংখ্যা ও কলকারখানার প্রচণ্ড তাগিদে সোভিয়েট স্থপতিরা প্রথম দিকে প্রত্যেক ঘরবাড়ীর দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেননি ঠিক, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা অনুযায়ী শত শত নূতন নগর তাঁরা গ'ড়ে তুলেছিলেন। ঘরবাড়ীর সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি পরে সম্পূর্ণ সংশোধন করা হয়েছে। এই সমাজতান্ত্রিক নগর-পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য কি? কিভাবে সোভিয়েট স্থপতিরা প্রকৃতি, অর্থনীতি, সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য রেখে নগর-পরিকল্পনা করলেন? (২৫৫ পৃষ্ঠার চার্ট দ্রষ্টব্য)

পরিকল্পনার মধ্যে লক্ষ্য করার বিষয় হ'চ্ছে এই : সামাজিক জীবন ক্রমে ক্রমে বৃহত্তম পরিধি থেকে (পার্ক অফ্ কাল্‌চার, ক্লাব, থিয়েটার ইত্যাদি) ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতর পরিধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে (স্কুল, গবেষণাগার, কারখানা, পাঠাগার ইত্যাদি)। অর্থাৎ বৃহত্তম সমাজ ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠী ও ব্যক্তির স্পর্শ চাইছে। আর ব্যক্তিগত জীবন সঙ্কীর্ণ স্বতন্ত্র গণ্ডী থেকে ধীরে ধীরে বৃহৎ ও বৃহত্তর সামাজিক জীবনের পরিধির মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে সমাজ ও মানুষের মধ্যে, ব্যেষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে সোভিয়েট স্থাপত্য সামঞ্জস্য স্থাপন করেছে। সমাজতান্ত্রিক নগর-পরিকল্পনা এইজন্যেই শুধু ঘরবাড়ী তৈরীর পরিকল্পনা নয়, নূতন সমাজ ও জীবন গঠনের পরিকল্পনা।

বিশদভাবে এই পরিকল্পনা আলোচনা করার সুযোগ নেই। এত ব্যাপক এবং ভবিষ্য মানবসমাজের বাস্তব চিত্র হিসেবে এত গুরুত্বপূর্ণ এই নগর-পরিকল্পনা যে এ-সম্বন্ধে স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ রচনা করলে হয়ত এর প্রতি সুবিচার করা হয়। তবু আমরা সংক্ষেপে এই পরিকল্পনার মূলকথা বলার চেষ্টা করেছি। আরও দু'একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ ক'রে আমরা এর ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করব। সে আলোচনা অবশ্য মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। পরিকল্পনার

বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য হ'ল : প্রত্যেকটি নগর ও গ্রাম তার নিজস্ব সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের উপরোক্ত সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও আবাসাদি নিয়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। মৌচাকের মতো সারা সোভিয়েট দেশ জুড়ে এই রকম অসংখ্য নূতন নগর ও গ্রাম গ'ড়ে উঠেছে। স্থান-বিশেষে তিন-চারিটি, পাঁচ-ছয়টি নগর নিয়ে এক-একটি "কেন্দ্রীয় মহানগরী" গ'ড়ে উঠেছে। এই কেন্দ্রীয় মহানগরীও সবদিক দিয়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। বড় বড় ক্লাব, পার্ক অফ্ কাল্চার, থিয়েটার ইত্যাদি কেন্দ্রীয় মহানগরীতেও আছে। আকার ও আসবাবের দিক দিয়ে এগুলি অনেক বড়। যেমন, একটি শ্রমিকদের ক্লাবের মধ্যে আছে স্টুডিও-থিয়েটার, জিম্নাসিয়াম্, নার্সারী, লাইব্রেরী, পাঠগৃহ, সভাগৃহ, শিক্ষাগৃহ ইত্যাদি, সবই একটা ক্লাব-বিল্ডিং-এর মধ্যে তৈরী। 'পার্ক অফ্ কাল্চার' এর চাইতেও বড়। বৃহত্তম সমাজতান্ত্রিক গঠন-পরিকল্পনার বিস্ময়কর নমুনা এই 'পার্ক অফ্ কাল্চার'। এর মধ্যে ছোট সিনেমা ও থিয়েটার হল আছে, বড় সিনেমা ও থিয়েটার হল আছে, বড় ক্লাবঘর, প্রদর্শনী-গৃহ, লাইব্রেরী, প্রেক্ষাগৃহ, খেলার ঘর, ল্যাবোরেটরী, শিক্ষানবিশীর জন্যে কারখানা, রেস্তোরাঁ, বাগান, নার্সারী ইত্যাদি সব আছে। ধনতান্ত্রিক নগর-পরিকল্পনার অন্যতম নিদর্শন যেমন গগনভেদী 'স্কাইস্ক্রেপার', সমাজ-তান্ত্রিক নগর-পরিকল্পনার অন্যতম নিদর্শন তেমনি এই সুবৃহৎ "পার্ক অফ্ কাল্চার এ্যাণ্ড রেস্ট্"। একদিকে মুনাফাপুষ্ট ব্যক্তির উত্তুঙ্গ অহমিকা পর্ব্বতশৃঙ্গের মতো আকাশ ফুঁড়ে উঠতে চাইছে, আর একদিকে সমষ্টির সংঘজীবন সমগ্র সমাজ-জীবনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হতে চাইছে। দুইয়ের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর ব্যবধান নয় কি?

আমরা এতক্ষণ নগর-পরিকল্পনার কথা বলেছি, গ্রাম বা পল্লী-পরিকল্পনার কথা বলিনি। অন্যান্য সব পরিকল্পনার মতোই সোভিয়েটের


নগর
সামাজিক জীবন
ব্যক্তিগত জীবন
পার্ক অফ কাল্চার এ্যাণ্ড রেস্ট্
ক্লাব
পারিবারিক বাসস্থান (স্বামী-স্ত্রী-পুত্র সহ)
ব্যক্তিগত বাসস্থান (সাধারণতঃ অবিবাহিতদের জন্য)
থিয়েটার
সিনেমা
নৃত্যমঞ্চ
লণ্ড্রী
পাকশালা
ক্লিনিক্
নার্সারী
এইখানে ব্যক্তিগত জীবনের গণ্ডী পার হয়ে মানুষ সামাজিক জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আসছে
সাধারণ ভোজনালয়
খেলার মাঠ
স্নানাগার
সেনাটোরিয়াম্
স্বাস্থ্যাগার
পাঠাগার
বাগান-বাগিচা
ক্লাব
বিশ্রামাগার
স্কুল
সভাগৃহ
এইখানে আরও বৃহত্তর সামাজিক গণ্ডীর মধ্যে মানুষ আসছে
সামাজিক জীবনের ভিত্তি
সাধারণ নার্সারী ও লালনাগার
স্কুল
গবেষণাগার বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান
কারখানা সমবায় কৃষি প্রতিষ্ঠান
রাজনৈতিক ক্লাব স্থানীয় সোভিয়েট
পাঠাগার
সাধারণ ক্লিনিক্
সংবাদপত্র
সভাগৃহ

নগর-পরিকল্পনাও সর্ব্বাঙ্গীণ, পল্লী বাদ দিয়ে নগর-পরিকল্পনা অর্থহীন, কারণ নগর ও পল্লীর ব্যবধান সোভিয়েট দেশে নেই। নগর-পরিকল্পনা ও পল্লী-পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য রূপায়নের (Lay-out)। কারখানা ও শিল্প-জীবনের প্রয়োজনীয়তা কেন্দ্র ক'রে নগর, সমবায় কৃষি প্রতিষ্ঠান ও যান্ত্রিক কৃষি-জীবনের চাহিদা কেন্দ্র ক'রে গ্রাম গ'ড়ে উঠেছে সোভিয়েট দেশে। জীবনের বৈজ্ঞানিক সম্পদ ও সম্ভার থেকে কেউ বঞ্চিত হয়নি। লেনিনের আদর্শ সোভিয়েট সমাজের স্বপ্ন আজ সার্থক হয়েছে। বিজ্ঞানের অফুরন্ত সম্ভার ও সম্পদ আজ নগর থেকে পল্লী পর্য্যন্ত প্রসারিত।

সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের দিকে দৃষ্টি রেখেই যে নগর-পরিকল্পনা করা হয়েছে তা নয়। জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যকেও যতদূর সম্ভব নূতন রূপ দেওয়া হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মধ্য এশিয়ার রিপাব্‌লিকগুলির কথা উল্লেখ করা যায়। বিপ্লবের পর যখন মধ্য এশিয়ায় সামন্ততন্ত্র ও আদিম গোষ্ঠীজীবনের অর্থনৈতিক ভিত্তি ভেঙে পড়ল, সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা অনুযায়ী নূতন অর্থনৈতিক ভিত্তি গঠিত হ'ল, চারিদিকে কলকারখানা ও সমবায় কৃষি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠল, তখন পুরাতন মধ্যযুগীয় নগর ও তথাকথিত 'কিশ্‌লাকের' (গ্রাম) মধ্যে মানুষের পক্ষে বসবাস করা আর সম্ভব হ'ল না। নূতন নগর-পরিকল্পনার প্রয়োজন হ'ল। এই নগর-পরিকল্পনার সময় সোভিয়েট স্থপতিরা এশিয়ার স্থাপত্যের ঐতিহাসিক ধারা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, বিশেষ ক'রে ইসলামী স্থাপত্যের ঐশ্বর্য্যের কথা তাঁরা আদৌ বিস্মৃত হননি। ইসলামী স্থাপত্যের যেসব কলাকৌশল নূতন যুগের উপযোগী হতে পারে তা তাঁরা গ্রহণ ও প্রয়োগ করেছেন। রীতিমত অধ্যয়ন ও গবেষণা ক'রে তাঁদের মধ্য এশিয়ার নূতন নগর ও গ্রাম গ'ড়ে তুলতে হয়েছে। মধ্য এশিয়ার প্রাকৃতিক পরিবেশ, জাতীয় ঐতিহ্য ও

বৈশিষ্ট্য, সবকিছু বিবেচনা ক'রে তাঁদের নগর-পরিকল্পনা করতে হয়েছে। পুরাতন যুগের বোখারা, তাস্কেন্দ, সমরকন্দ আজও আছে কিন্তু তারই পাশে গ'ড়ে উঠেছে নূতন বোখারা, সমরকন্দ, তাস্কেন্দ, আস্‌খাবাদ, স্টালিনাবাদ, লেনিনাবাদ। কোথাও আজ মধ্যযুগের নিদর্শন নেই ঠিক, থাকলেও ঐতিহাসিক স্মৃতি হিসেবে আছে, কিন্তু ইসলামী স্থাপত্যই যে রূপান্তরিত হয়েছে এই সব নগরে তা পরিষ্কার বুঝা যায়। যেমন মধ্য এশিয়ার অনেক রেল স্টেশন মসজিদের মতো ক'রে গঠন করা হয়েছে। অধিকাংশ ঘরবাড়ীর গঠনের মধ্যে ইলসামী স্থাপত্যের নূতন রূপ দেওয়া হয়েছে। মধ্য এশিয়ার যেকোন নগরে গেলে বেশ বুঝতে পারা যায় যে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক বহু পুরাতন ঐতিহাসিক কেন্দ্রেই এসেছি, যেখানে এক নূতন সমাজ, নূতন জীবন, নূতন সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ'ড়ে উঠেছে। মধ্য এশিয়ার আদিম যাযাবর জাতিগুলির বাসস্থানের সমস্যাও হেলায় সমাধান করা হয়নি। বিজ্ঞানী ও স্থপতিরা একত্রে ব'সে এই সমস্যার সমাধান করেছেন। যারা 'কিবিৎকা' নিয়ে, তাঁবু খাটিয়ে মরুপ্রান্তরে পাহাড়ে এতদিন বাস ক'রে এসেছে তাদের হঠাৎ রাতারাতি ইট-পাথর-লোহার নীরেট গৃহের মধ্যে বন্দী করলে দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে। অথচ কিবিৎকা নিয়ে, তাঁবু খাটিয়ে তাদের আর আদিম যাযাবর জীবন কাটানো চলবে না। স্থায়ীভাবে তাদের বসবাস করতে হবে, আধুনিক জীবন যাপন করতে হবে। তাদের জন্যে নূতন ধরণের বাসস্থান তৈরী করতে হ'ল, কিবিৎকা ও তাঁবুর মতো হয়ত দেখতে কিন্তু তাঁবু নয়, স্থায়ী ঘরবাড়ী, মুক্ত প্রান্তর, অনন্ত আকাশের আস্বাদ সে-ঘর থেকে পাওয়া যায়, কিন্তু তাকে আর খুশী মতো ঠেলে নিয়ে বা কাঁধে ক'রে স্থান থেকে স্থানান্তরে যাত্রা করা যায় না। বাইরের প্রাকৃতিক জীবন উপভোগের অফুরন্ত সুযোগও তাদের দেওয়া হ'ল।

এইভাবে তাদের হাত ধ'রে সস্নেহে, সযত্নে তুলে আনা হ'ল আদিম যাযাবর যুগ থেকে আধুনিক শ্রমশিল্পের বৈজ্ঞানিক যুগে, 'কিবিৎকা' থেকে এ-যুগের নগরে। আজ তারা অধিকাংশই নগরবাসী, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, টেক্‌নিসিয়ান্, শ্রমিক, বৈজ্ঞানিক। সেকালের 'কিবিৎকাও' নেই, 'কিশ্‌লাকও' নেই আর।

শ্রমশিল্পের বৈপ্লবিক প্রসারের জন্যে সোভিয়েট মধ্য এশিয়ায় আজ দ্রুতগতিতে নগর গ'ড়ে উঠছে। যান্ত্রিক কৃষির প্রসারের জন্যে মধ্য এশিয়ার পল্লী অঞ্চল দ্রুত উন্নীত হ'চ্ছে এবং নগরের দিকে এগিয়ে আসছে। একমাত্র কাজাকস্তানে ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৩-'৪৪ সালের মধ্যে ৪৪টি নূতন নগর গ'ড়ে উঠেছে। নগরের লোকসংখ্যাও দ্রুত বেড়ে চলেছে। ১৯২৬ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে তুর্কমেনিস্তানের লোকসংখ্যা ১০ লক্ষ থেকে বেড়ে হয়েছে ১২½ লক্ষ, উজ্‌বেকিস্তানের ৪৫ লক্ষ থেকে ৬২ লক্ষ, তাজিকিস্তানের ১০ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ, কাজাকস্তানের ৬০ লক্ষ থেকে ৬২½ লক্ষ, কিরগিজস্তানের ১০ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ। এই অনুপাতে নগরের লোকসংখ্যাও বাড়ছে। যেমন বাড়ছে তেমনি নগরের বাসস্থান-বৃদ্ধির পরিকল্পনাও করা হ'চ্ছে। ১৯৪৬-'৫০ সালের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার মধ্যে উজ্‌বেকিস্তানের নগরগুলিতে ৯ লক্ষ বর্গ মিটার, কাজাকস্তানের নগরে ২১ লক্ষ ৭০ হাজার বর্গ মিটার, কিরগিজস্তানের নগরে ২ লক্ষ ১৫ হাজার বর্গ মিটার, তাজিকিস্তানের নগরে ২ লক্ষ ৯১ হাজার বর্গ মিটার এবং তুর্কমেনিস্তানের নগরে ৩ লক্ষ ১০ হাজার বর্গ মিটার বাসস্থান বৃদ্ধি করা হবে ঠিক হয়েছে। তাছাড়া তাস্কেন্দে নূতন ট্রলিবাস সার্ভিস চালু করা হবে, তাস্কেন্দ ও তারমেজের ওয়াটার ওয়ার্কস্-এর জলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে, ফ্রুঞ্জ সহরে নূতন একটি ওয়াটার ওয়ার্কস্ ও ময়লার নালা তৈরী করা হবে,

ট্রলিবাস চালু করা হবে, লেনিনাবাদ ও খোড়গে নূতন জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে, স্টালিনাবাদে ট্রলিবাস চালু করা হবে, আস্‌খাবাদেও তাই করা হবে। এই বিরাট পরিকল্পনার সাফল্যের পর মধ্য এশিয়ার প্রত্যেকটি নগর আদর্শ বাসস্থান হয়ে উঠবে। ব্লক্, ব্যারাক্ বা বস্তির অস্তিত্ব আফগান সীমান্তের তাজিকিস্তান থেকে সোভিয়েটের ইউরোপীয় সীমান্ত পর্য্যন্ত কোথাও নেই। ঘরবাড়ীর সাধারণ পরিকল্পনার কথা আগেই বলেছি। শ্রমিকদের ক্লাবের যে বিবরণ দিয়েছি তাই থেকে তাদের বাসস্থানের গঠন যে-কেউ অনুমান করতে পারেন। সোভিয়েট দেশে মালিক নেই, ধনিক নেই, সুতরাং মালিক-শ্রমিকের, ধনিক-গরীবের ইমারৎ-বস্তির, প্রাসাদ-কুঁড়ের কোন কদর্য্য ব্যবধান সোভিয়েট নগরে নেই। গগনভেদী স্কাইস্ক্রেপারও নেই, আবার ফ্যাশনদুরস্ত 'ভিলা' বা 'কটেজেরও' বাহুল্য নেই। অধিকাংশ বাড়ীই তেতলা, চারতলা, পাঁচতলা, মানুষের বাসোপযোগী ক'রে গঠন করা। একমাত্র মানুষের কর্ম্মজীবনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাসস্থানের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য। তাকে বাস-বৈষম্য বলে না, বাস-স্বাতন্ত্র্য বলা যায়।

এর পাশে যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত শ্রেষ্ঠ মহানগরী বোম্বাই-কলিকাতার চিত্র আঁকা যায় তাহ'লে কি দেখতে পাই? আগে যে 'Coketown' ও 'Megalo-polis'-এর কথা বলেছি, কলিকাতা-বোম্বাইকে সেই দুই শ্রেণীর নগরীর সংমিশ্রণ বলা যায়। এই দুই মহানগরীর লোকসংখ্যা দিন দিন কিভাবে বাড়ছে?

	১৯৩১	১৯৪১	শতকরা বৃদ্ধি
কলিকাতা (হাওড়া সহ)	১,৩৮৯,০০০	২,৪৮৮,০০০	৭৯
বোম্বাই	১,১৬১,০০০	১,৪৯০,০০০	২৮

১৯৪১ সালের 'সেনসাস' অনুযায়ী সারা ভারতের মোট ২৩টি সহরের প্রত্যেকটিতে ২ লক্ষের উপর লোক বাস করত, ১৯৩১ সালে করত ১৭টি

সহরে। শতকরা ১১ জন লোক নগরে বাস করত ১৯৩১ সালে, ১৯৪১ সালের হিসেবে বেড়ে হয়েছে শতকরা ১৩ জন। লোক যখন ক্রমেই নগরমুখী হ'চ্ছে তখন আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হবে শ্রমশিল্পের প্রসারের জন্যেই নগরে লোকসংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু তা নয়। বুভুক্ষু মানুষ নগরমুখী হ'চ্ছে প্রাণের দায়ে, লঙ্গরখানার লোভে, চাকরির আশায়। অনেকেই কলিকাতা, বোম্বাই জীবনে দেখেনি কখনও। শুনেছে, মহানগরী এমনই একটি আজব স্থান যেখানে লাটসাহেব থাকে, সাহেব-মেম ঘুরে বেড়ায়, বাবুরা গাড়ী চড়ে, যেখানে চিড়িয়াখানা আছে, আর আছে অজস্র চাকরি, অফুরন্ত টাকা পথে ছড়িয়ে। পথে ছড়িয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু তারা জানে না যে তাদের জন্যে নয়, ধনিক মালিক ও ফাট্‌কা বাজারের দালালদের জন্যে, শঠ্, লম্পট ও প্রতারকদের জন্যে। তাই ভিড় হয় মহানগরীতে, আর কলকাতার লোকসংখ্যা বেড়ে হয় ২৫ লক্ষ (সহরতলী নিয়ে)। এই সংখ্যাধিক্যের ফলে দিন দিন রোগব্যাধি, মৃত্যু, বস্তি, বেকার-সমস্যা ও বাসস্থান-সমস্যা মহানগরীতে বেড়েই চলেছে!

লোকসংখ্যা বাড়ছে কিন্তু নগর-পরিকল্পনার অভাবে বাসস্থান প্রসারের কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে, ব্যারাক্ ও বস্তির বাহুল্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ মহানগরী 'মহানরকে' পরিণত হ'চ্ছে। ১৯৩১ সালে বোম্বাই নগরীর বাসস্থানের শোচনীয় দুরবস্থার কথা উল্লেখ করছি ঃ

বাসস্থানে ঘরের সংখ্যা	মোট বাসস্থানের সংখ্যা	শতকরা হিসাব	মোট বাসিন্দার সংখ্যা	মোট লোকসংখ্যার শতকরা হিসাব
১খানা ঘর	১৯৭,৫১৬	৮১	৭৯১,৭৬২	৭৪
২খানা ঘর	২৬,২৩১	১১	১৩১,৮৭২	১২
৩খানা ঘর	৭,৪১৬	৩	৪৪,৮২১	৪

১৯৪১ সালের 'সেনসাসে' বলা হয়েছে যে প্রত্যেক এক হাজার বাসগৃহে ৫,১১৬জন লোক থাকে। এরকম হিসেবে প্রকৃত বাসস্থানের অবস্থা বুঝা যায় না। তবু ১৯৩১ সালের চাইতে ১৯৪১ সালের অবস্থা যে আরও শোচনীয় হয়েছে তা স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়, কারণ ১৯৩১ সালে প্রতি এক হাজার বাসগৃহে ৪৯৬৫ জন লোক বাস করত। ক্রমেই বস্তি ও ব্যারাকের সমস্যা ভারতবর্ষে আরও বাড়ছে। সোভিয়েট মধ্য এশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক নগর-পরিকল্পনার ফলে এ-সমস্যার কোন অস্তিত্বই নেই। যদি বস্তি ও ব্যারাকের এতটুকু চিহ্ন থাকত কোথাও তাহ'লে পেশাদার সোভিয়েট-বিদ্বেষীরা এতদিনে তাকে ফলাও ক'রে প্রচার করতে কসুর করতেন না। ভারতবর্ষে বস্তি ও ব্যারাকই যে বাড়ছে শুধু তাই নয়, খোলা ফুটপাথ, রাস্তা, পার্ক, বাজার, স্টেশন সবই ক্রমে ক্রমে বাড়তি লোকের বাসস্থান হয়ে উঠছে। মাদ্রাজের সেনসাস সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট্‌ এদের সম্বন্ধে চমৎকার মন্তব্য করেছিলেন : "These persons are not all tramps by any means ; the majority, indeed, ordinary citizens in everything but the possession of a roof". "এইসব পথচারী ও পথবাসী ভবঘুরে নয়। এরা অধিকাংশই সাধারণ নাগরিক, কেবল এদের মাথা গোঁজার ঘেরা জায়গা একটু নেই এই যা।" এ-ছাড়া আগে যে বস্তির উল্লেখ করা হয়েছে তাও মানুষের বাসযোগ্য নয়। বোম্বাইয়ে একঘর-ওয়ালা বস্তিগুলির ঘরের মাপ সাধারণতঃ ১০ ফুট × ১০ ফুট থেকে ১২ ফুট × ১৫ ফুট পর্য্যন্ত।[৫] প্রত্যেক ঘরে গড়ে চারজন ক'রে লোক থাকে। প্রত্যেক লোকের ৩ ফুট × ৫ ফুট ক'রে যদি জায়গা লাগে তাহ'লে হিসাব ক'রে

৫ Wadia & Merchant : Our Economic Problem (2nd Enlarged ed, 1945) : Pp. 75-76 (Chap, V)

দেখা যায় যে চারজন লোক পাশাপাশি এই ঘরে ভালভাবে শুতে পারে না। মধ্যে মধ্যে এক-একটি ঘরে তিনচারটি পরিবারকে পর্য্যন্ত পুরে দেওয়া হয়। গুদামঘরের বস্তার মতো স্তরে স্তরে সাজানো অবস্থায় শুলে বা বসলে তিনচারটি পরিবার এরকম ঘরে থাকতে পারে। একবার শুধু কল্পনা করুন, মধ্য এশিয়ার কোন রিপাব্লিকে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট এই শ্রেণীর বস্তি ও ব্যারাক্ গঠন করেছে এবং সেখানে এইভাবে মানুষে বসবাস করছে। সোভিয়েট-বিদ্বেষীরা এবং 'Red Imperialism'-এর উৎসাহী অপপ্রচারকেরা তাহ'লে কি চমৎকার খোরাকই না পেতেন! শ্রমিকদের ক্লাব, পার্ক অফ্ কাল্চার, নার্সারী, এসবের কথা আমরা উল্লেখই করছি না। শুধু বস্তি ও ব্যারাকের অস্তিত্ব যদি থাকত, যদি কলিকাতা-বোম্বাইয়ের মতো হাজার হাজার পথচারী ও পথবাসী তাস্কেন্দ, স্টালিনাবাদের পথে পথে দেখা যেত, তাহ'লে লণ্ডন থেকে দিল্লী-বোম্বাই-কলিকাতা পর্য্যন্ত রেডিওয় ও সংবাদপত্রে "লাল সাম্রাজ্যবাদের" আর্ত্তনাদে কান ঝালাপালা হয়ে যেত। কিন্তু মজাই হ'চ্ছে এই যে 'Red Imperialism'-এর অপপ্রচারকেরা সোভিয়েট দেশ থেকে ভুলেও কখনও সাম্রাজ্যবাদের 'বাস্তব দৃষ্টান্ত' একটিও তুলে দেখান নি। দেখাবার উপায় নেই। কেবল কাল্পনিক কূটনৈতিক ক্যাল্কুলাসের ফরমুলা প্রয়োগ ক'রে নিজেদের 'প্রতিবিম্ব' তাঁরা দেখেছেন সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের মধ্যে। ট্র্যাজিডি এই যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পদানত, শোষিত, লাঞ্ছিত ও সর্ব্বস্বান্ত ভারতবাসীদের মধ্যেও একদল লোক সাম্রাজ্যবাদের এই নির্লজ্জ কুৎসা গলাধঃকরণ ক'রে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন, বিশেষ ক'রে ত্রিশঙ্কু বুদ্ধিজীবীশ্রেণী। সাম্রাজ্যবাদ কি, সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের পরিণতিই বা কি, তা নিজেদের দেশের অবস্থা বিচার ক'রেও আমরা বুঝতে চেষ্টা করি না। পৌনে দু'শ বছর গোলামি ক'রে আমরা

বুদ্ধি বিবেচনা পর্য্যন্ত বন্ধক দিয়ে দিয়েছি। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত যে-কোন দেশের গত একশতাব্দী থেকে দুই শতাব্দীর ইতিহাসের পাশে সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার গত বিশ বছরের ইতিহাস যদি তুলনা ক'রে দেখি তাহ'লেই সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ আমরা বুঝতে পারব এবং সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের আদর্শও উপলব্ধি করতে পারব।

জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা

'পার্ক অফ কাল্‌চার' বা ক্লাব যা সোভিয়েট নগরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে তার কোথাও কোন চিহ্ন নেই। আমাদের এই ভারতবর্ষের নগরে নগরে এক-রকমের "পার্ক" দেখা যায় যাকে 'কাল্‌চার' বা বিশ্রামের কেন্দ্র বললে সমগ্র জাতিকে অপমান করা হবে। সহরের যেখানে-সেখানে এক-একখণ্ড জায়গা রেলিং দিয়ে ঘেরা, তার মধ্যে কোথাও ঘাসের চাপ্‌ড়া কিছু আছে, কোথাও নেই, একেবারে টাক্ প'ড়ে গিয়েছে। এরই মধ্যে আবার খাচায় বন্দী সখের ময়না-টিয়ার মতো দু'একটা ফলফুলের ঝোপ্ ঝাড়, আর এককোণে এক কুঠ্‌রীতে বন্দী কয়েকজন উড়ে মালি এইসব 'পার্ক অফ্ কাল্‌চারের' সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট। একদিকে 'ল্যাভেটরী' এবং তার গায়ে পেন্সিল ও কাঠকয়লার আঁচড়ে আঁকা 'কাল্‌চারের' অসংখ্য 'সিম্বল'। এ-হেন পার্কে নাগরিকেরা আসেন বিশ্রাম করতে, খেলতে, স্বাস্থ্যান্বেষণে মুক্তবায়ু সেবন করতে, রাজনৈতিক সভা করতে, বারো-ইয়ারী পূজা করতে, গান শিখতে, গোপনে প্রেম করতে, বিড়ি-সিগ্রেট ও অন্যান্য নেশা-পান করা শিখতে। শিশুদের বালপ্রৌঢ় তৈরী করার জন্যে এরই মধ্যে কোথাও কোথাও আবার শিশুবিভাগ খোলা হয়েছে। এই হ'ল আমাদের দেশের 'পার্ক অফ্ কাল্‌চার', যার যথার্থ নাম হওয়া

দেশ	লোকসংখ্যা	ডাক্তার	হাসপাতালের বেডের সংখ্যা
গোল্ডকোস্ট	৩,৬১৪,০০০(১)	৬২(১) ৫১২ (নেটিভ্ সহকারী)	১২২৫(১)
উত্তর রোডেসিয়া	১,৩৭৮,০০০(১)	২০(১) ১৫০ (নেটিভ্ সহকারী)	১৮,০০০ রোগীর(১) চিকিৎসা হয় বছরে
তাজিকিস্তান	১,৪৮৫,০০০(২)	(ক)	*৭,৩০০
উজ্‌বেকিস্তান	৬,২৮২,০০০(২)	২১৮৫ (১৯৩৭)	*২৯,৬০০
কিরগিজস্তান	১,৫০০,০০০(২)	(ক)	*৭,২০০
কাজাকস্তান	৬,১৪৬,০০০(২)	(ক)	*৩৪,০০০
তুর্কমেনিস্তান	১,২৫৪,০০০(২)	১০০০(২)	*৮০০০
বৃটিশ ভারত	৩০,০০,০০,০০০ (১৯৪১)	৪৭,৪০০(১৯৪৬) (এর২/৩ হ'ল স্কুলে পাশ করা)	৭৩,০০০ (১৯৪৬)
বাংলাদেশ	৬০,৩১৪,০০০		১০,০০৫ (১৯৪৬)
সোভিয়েট ইউনিয়ন	প্রায় ২০,০০০,০০০	২০,০০০(১৯১৩) ১৩০,০০০(১৯৪১)	৭১০,০০০(১৯৪০) *৯৮৫,০০০(খ)

(ক) সঠিক সংখ্যা সংগ্রহ করতে পারিনি, (খ) এ-ছাড়াও সোভিয়েট দেশে প্রায় ৩৫০০ স্বাস্থ্যাবাস ও বিশ্রামাবাস (Rest Home) আছে। ১৯৪৬-'৫০-এর মধ্যে স্বাস্থ্যাবাসে

মাতৃসদন ও শিশুসদন	হাসপাতালে প্রসূতিদের বেড	শিশুলালনাগারে বেড-সংখ্যা	ক্লাব
?	?	?	?
?	?	?	?
(ক)	(ক)	(ক)	১৬০
১৫৫(১)	১২৫২(১৯৩৭)	২২,৭৩৭(১)	১২০০(২)
(ক)	(ক)	(ক)	৩০০(২)
(ক)	(ক)	(ক)	৪০০০ পাঠাগার ও ক্রীড়াগার আছে
(ক)	(ক)	(ক)	৬০০ পাঠাগার ও ক্রীড়াগার আছে
৩৭ (১৯৪৬)	৮২১ (১৯৪৬)		
১৯ নার্সারী (১৯১৩) ৬,৪০০০০ „ (১৯৪৪) ২০,০০০,০০ কিন্দার-গার্টেন। ১৯৪৫ সালে আরও ১০°/. নার্সারী ও ১৫°/· কিন্দারগার্টেন বৃদ্ধির ব্যবস্থা হয় যুদ্ধের মধ্যে।	৭০০০(১৯১৩) ১৪০,০০০ (১৯৪১)	৮৫৯,০০০(১৯৪০) *১,২৫১,০০০	*২৮৪,৯০

২,৫০,০০০ এবং বিশ্রামাবাস ২০০,০০০ লোকের স্থান করা হবে ঠিক হয়েছে।

(১)১৯৩৭-'৩৮, (২)১৯৩৯-'৪০, *১৯৪৬-৫০'-এর যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা, (?) উল্লেখযোগ্য নয়,

উচিত 'পার্ক অফ্ আন্-কাল্চার বা ইল্-কাল্চার'। এই হ'ল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবদান এবং সাম্রাজ্যবাদের আওতায় ও কৃপায় পরিপুষ্ট 'নেটিভ্ নগরপতিদের' কীর্ত্তি। এ-ছাড়া স্বাস্থ্যকর সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করার শক্তি সাম্রাজ্যবাদের নেই। বস্তি-ব্যারাক-ব্লক্, গণিকালয়, 'পার্ক অফ্ ইল্ কাল্চার ও আন্-কাল্চার', 'আড্ডাখানা' এই হ'ল সাম্রাজ্যবাদের শাসনাধীন প্রত্যেক দেশের নগরের ও সহরের বৈশিষ্ট্য। আর আধুনিক বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম ও আসবাবে সজ্জিত সুন্দর বাসগৃহ, বাগান-বাগিচা, পার্ক অফ্ কাল্চার, নার্সারী, ক্লাব, কিন্ডারগার্টেন, এই হ'ল সমাজতান্ত্রিক নগরের ও সহরের বৈশিষ্ট্য। তাই সাম্রাজ্যবাদী পরাধীনতা ও শোষণের ফল হ'ল অকালমৃত্যু, শিশুমৃত্যু, যক্ষ্মা, পাগলামি, দৃষ্টিহীনতা, বধিরতা, ভাষাহীনতা, কুষ্ঠ-ব্যাধি, মহামারী, কলেরা-বসন্ত, প্রসূতি-মৃত্যু, নিরক্ষরতা, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা এবং সমাজতন্ত্রের অবদান হ'ল বল, বীর্য্য, স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল পরমায়ু ও সুশিক্ষা। প্রমাণস্বরূপ আবার আমরা "সংখ্যার" রাজ্যে যাত্রা করি, তথ্যের স্তূপ ঘাঁটি। 'সংখ্যা' ও 'তথ্য-ই' রায় দিক : (২৬৪-'৬৫ পৃষ্ঠার সংখ্যাতালিকা দ্রষ্টব্য) (ক)

দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত মানবসমাজের ছবি দেখতে পাই আমরা এই সংখ্যাসূচীতে। গোল্ডকোস্ট, উত্তর রোডেসিয়া, ভারতবর্ষ ও বাংলা দেশ সাম্রাজ্যবাদের তৈরী 'মানবসমাজ' আর তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান উজবেকিস্তান, কিরগিজস্তান, কাজাকস্তান হ'ল সমাজতন্ত্রবাদের তৈরী

(ক)সদ্যো প্রকাশিত ভোর্ কমিটির রিপোর্ট (১৯৪৬) থেকে ভারতীয় প্রদেশগুলির তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্ত্তমানে সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার রিপাবলিকগুলির ডাক্তারের ন্যূনতম সংখ্যা প্রতি ১০০০ জনে একজন হবে। বর্ত্তমানের কথা বাদ দিয়েও বলা যায়, আজ থেকে ৬।৭ বৎসর আগে সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার প্রত্যেকটি প্রজাতন্ত্রে জনসংখ্যানুপাতে ডাক্তারের সংখ্যা যা ছিল তা ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের বর্ত্তমান সংখ্যার চাইতেও গড়ে প্রায় তিনগুণ বেশী।

'মানবসমাজ'। প্রথমটিকে 'মানবসমাজ' বলা যায় না, মানবেতর অথবা মানবসদৃশ জীবের সমাজ বলা যায়। দ্বিতীয়টিকে বলা যায় আদর্শ মানবসমাজ যা ভবিষ্যতে গ'ড়ে উঠবে। সেই সমাজকেই মানবসমাজ বলা যায় যে-সমাজ মানুষকে পঙ্গু করে না, জরাগ্রস্ত করে না, মানুষের মঙ্গলের পথ প্রশস্ত করে, মানুষকে রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত করে। আফ্রিকায় ও ভারতীয় সমাজে এর কোনটারই ব্যবস্থা নেই। প্রথমতঃ মানুষকে সুখী ও স্বাস্থ্যবান করার ব্যবস্থা তো নেই-ই, স্বাস্থ্যহানি হ'লে, ব্যাধিগ্রস্ত হ'লে, শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করারও সুবন্দোবস্ত নেই। প্রথম ব্যবস্থাকেই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্য-পরিকল্পনা বলে। রোগব্যাধির চিকিৎসার (cure) ব্যবস্থার চাইতে রোগব্যাধির কারণ কদর্য্য পরিবেশ, পুষ্টিকর খাদ্যাভাব, বিষাক্ত ও দূষিত বাসস্থান, এইগুলি দূর ক'রে সমাজে ব্যাধির প্রবেশপথ বন্ধ ক'রে দেওয়া (prevention) উচিত। সোভিয়েট দেশের স্বাস্থ্য-পরিকল্পনার এই হ'ল ভিত্তি। সেখানে ডাক্তারদের ব্যক্তিগত চিকিৎসা ও রোজগারই প্রধান নয়। ডাক্তারেরা কারখানা, ইউনিয়ন, কৃষিপ্রতিষ্ঠান, স্কুল প্রভৃতির অধীনে কাজ করেন, সেখানকার খাদ্যব্যবস্থা, বাসস্থান, পরিবেশ সব তদারক করেন, নিয়মিতভাবে সকলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন এবং ব্যাধির আবির্ভাবের আগেই তাকে দূর থেকে বিদায় ক'রে দেন। 'Prevention' তাঁদের লক্ষ্য, 'cure' নয়। অন্যান্য দেশে ঠিক এর উল্টো ব্যবস্থা, আমাদের দেশে তো কথাই নেই। সোভিয়েট দেশে সমাজ ও মানুষই প্রধান লক্ষ্য ব'লে সেখানে বিশ্রামাবাস, স্বাস্থ্যাবাস, ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ-কেন্দ্র, রাষ্ট্র ও ইউনিয়ন চালিত কিচেন, ক্লিনিক, ক্লাব, নার্সারী, কিন্ডারগার্টেন ইত্যাদির ব্যবস্থা। এ-সবের কোন অস্তিত্ব নেই আমাদের দেশে।

আমাদের সমাজব্যবস্থা কুৎসিত, পরিবেশ কুৎসিত ব'লে আমাদের দেশে প্রতিষেধক ব্যাধিতে লোক মরে বেশী। ১৯৩৯ সালে ভারতবর্ষে ৬,১৬৫,২৩৪ লোকের মৃত্যু হয়, তার মধ্যে ১৪,১১,৬১৪ জন মরে ম্যালেরিয়ায়, ৪৮,১০৩ জন মরে বসন্ত রোগে, ৯৭,৫৬৬ জন মরে কলেরায় এবং আমাশয় ও উদরাময়ে মরে ২৬০,৩০০ জন। এ ছাড়া যক্ষ্মারোগ তো এদেশে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো সকলকে ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে।ক এ-দেশের মা-শিশুরা রক্তাল্পতার জন্যে বিখ্যাত। অথচ এই শ্রেণীর প্রত্যেকটি ব্যাধি প্রতিরোধ করা যায়, মানুষের সমাজে তাদের প্রভাব বৃদ্ধির কোন কারণ নেই। মধ্য এশিয়ায় মাত্র বিশ ত্রিশ বছর আগেও তাজিক-উজবেক-কিরগিজ-কাজাক-তুর্কমেনদের মধ্যে কুষ্ঠ, ম্যালেরিয়া, আমাশয়, যক্ষ্মা বসন্ত প্রভৃতি ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ছিল (তৃতীয় অধ্যায় "বাদ্‌শাহী বেহেশত" দ্রষ্টব্য)। আজ এ সব রোগের চিহ্ন নেই বললেই হয়, ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ বসন্ত একেবারে অন্তর্দ্ধান করেছে, যক্ষাও দ্রুত পলায়মান। কারণ কি? কারণ সেখানে যে নূতন সমাজ গ'ড়ে উঠেছে তার প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে আগেকার অপরিচ্ছন্ন কদর্য্য পরিবেশের কোন সম্পর্ক নেই। আজ সেখানকার মানুষের বাসস্থানের ত্রি-সীমানায় কোন ব্যাধির বীজাণু

ক ভোর্ কমিটি বলেন, বৃটিশ ভারতে যক্ষ্মারোগে প্রতি বৎসরে গড়ে ৪৫৬, ৬৪৭ থেকে ৮১৮, ৯৩৪ জন লোক মরে। ভারতের কয়েকটি সহরে যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর হার :
(প্রতি ১ লক্ষ লোকের হিসাব)

কাণপুর	৪৩২
লক্ষ্ণৌ	৪১৯
মাদ্রাজ	২৯০
কলিকাতা	২৩০
বোম্বাই	১৪০

আসতে পারেনা। আজ সেখানকার মানুষ প্রচুর আহার পায়, পুষ্টি-কর খাদ্য পায়, আলোবাতাস পায়, বিজ্ঞানীর সেবা ও বিশ্রাম পায়। আমরা এসব কিছু পাই না তাই যেসব ব্যাধির যন্ত্রণা আমাদের ভোগ না করলেও চলে, যেসব ব্যাধিতে আমাদের অকালমৃত্যু না হওয়াই উচিত, সেই সব ব্যাধির প্রকোপই আমাদের সমাজে খুব বেশী। এ সমাজে স্বাস্থ্য-গঠন ও স্বাস্থ্য-সৃষ্টির কোন ব্যবস্থাই থাকতে পারে না। গঠন ও সৃষ্টি এ-সমাজের কোন ক্ষেত্রেরই বৈশিষ্ট্য নয়, ধ্বংস ও মৃত্যুই এর বৈশিষ্ট্য।

গঠন ও সৃষ্টির কথা বাদ দিলেও দেখা যায় সংস্কার ও সংশোধনের ব্যবস্থা আমাদের সমাজে যা আছে তা অতি সামান্য। ব্যাধির চিকিৎসা ও রোগীর শুশ্রূষার ব্যবস্থা যা আছে আমাদের দেশে তা না থাকলেও বোধ হয় তেমন ক্ষতি হ'ত না। এখানে আরও পরিষ্কার ক'রে এই ব্যবস্থার বিচার করা যাক :

হাসপাতালের বেডের সংখ্যা

(মোট জনসংখ্যার অনুপাতে গড়পড়তা হিসাব)

তাজিকিস্তান	১।২০৩ ১/২ জন*
উজবেকিস্তান	১।২১২ ১/৪ জন*
কিরগিজস্তান	১।২০৮ ১/৩ জন*
কাজাকস্তান	১।১৮০ ১/৪ জন*
তুর্কমেনিস্তান	১।১৫৬ ১/৩ জন*

বাংলাদেশ	১।৫৫৩০	(১৯৩৬)
আসাম	১।৮৭২৯	( )
বিহার	১।৬০৩১	(„)
বোম্বাই	১।২৬১৩	(„)
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১।৬১৪০	(„)
দিল্লী	১।৬৬৪	(„)
মাদ্রাজ	১।৩৩৩৯	(„)
উড়িষ্যা	১।৬২৯৮	(„)
পাঞ্জাব	১।২৩০৯	(„)
যুক্তপ্রদেশ	১।৪৫০০	(„)

*১৯৪৬–'৫০–এর যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার হিসাব।

ডাক্তারের সংখ্যা

(মোট জনসংখ্যার অনুপাতে গড়্‌পড়্‌তা হিসাব)

(১৯৪৬)

বাংলাদেশ	১।৪৯১৩	তুর্কমেনিস্তান	১।২৬০৭ (১৯৩৭), ১।১২৫৪ (১৯৩৯)
আসাম	১।৭৫০৯	উজ্‌বেকিস্তান	১।২৮৭৫ (১৯৩৭), (ক্)
বিহার	১।১১,১৭১	গোল্ড কোস্ট্	১।৫৮,২৯০
মাদ্রাজ	১।৬১৪৫	উত্তর রোডেসিয়া	১।৬৮,৯০০
উড়িষ্যা	১।১৩,১৪৫	বৃটিশ ভারত	১।৬৩০০ (১৯৪৬)
পাঞ্জাব	১।৪৪৯৪	সোভিয়েট ইউনিয়ন	১।১৩০০
যুক্তপ্রদেশ	১।১৩,৫৮৬		(১।৪৫০ যদি ভারতবর্ষের মতো স্কুলপাশ ডাক্তারদের সমকক্ষ 'সহকারী'দের ধরা হয়)

এই সংখ্যাতালিকার উপর মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন।[৬] কিন্তু এইখানেই শেষ নয়, আরও আছে। সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও কুশাসনের বীভৎস কাহিনীর শেষ নেই। আর কোনখান থেকে নয়, একেবারে সোজা সরকারী কর্ম্মচারীদের মুখ থেকে অথবা সরকারী রিপোর্ট থেকে আরও জ্ঞাতব্য বিষয় সঙ্কলন ক'রে দিচ্ছি। তথাকথিত "রুশ সাম্রাজ্য-

---

৬ Leonard Barnes : Soviet Light on the Colonies : Chap VIII ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সংখ্যাগুলি ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত ভোর্ কমিটির রিপোর্ট থেকে গৃহীত।

(ক) সঠিক সংখ্যার অভাব ব'লে দেওয়া হ'ল না। তবে দু বছরে তুর্কমেনিস্তানের প্রগতি দেখেই বুঝা যায় অন্যান্য প্রজাতন্ত্রেও ডাক্তারের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। ১৯৪৬-১৯৫০-এর পরিকল্পনায় আরও বাড়বে।

বাদের" কুৎসা প্রচারে আমাদের দেশে যাঁরা সোৎসাহে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সমস্বরে সুর মিলিয়ে দেন, তাঁরা প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদের বীভৎস স্বরূপ একবার উপলব্ধি করুন : ৭

ভারতবর্ষ : "ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ। বসন্ত টাইফয়েড ম্যালেরিয়া প্রভৃতি প্রতিষেধক ব্যাধি প্রায়ই মহামারীরূপে দেখা দেয়। যক্ষ্মার দৌরাত্ম্য ক্রমেই বাড়ছে। ব্যাধি প্রতিরোধ করার শক্তি জনসাধারণের অত্যন্ত কম। পুষ্টিকর খাদ্যাভাব এবং তজ্জনিত রোগ খুব বেশী। ...ভারতের শতকরা ৮০ জন লোক গ্রামে থাকে, কিন্তু তাদের আধুনিক পদ্ধতিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। আজও গ্রামবাসীরা অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ও চিকিৎসকের (অর্থাৎ দাই, ওঝা, পুরোহিত, মোল্লা, হাকিম, কবিরাজ ইত্যাদি —বি,) পক্ষপাতী।" ডাঃ জে. বি. গ্র্যাণ্ট্, ডাইরেক্টর—'অল্ ইণ্ডিয়া ইন্‌স্টিটিউট্ অফ্ হাইজিন্ এ্যাণ্ড পাবলিক হেল্‌থ'।

বৃটিশ হণ্ডুরাস্ : (আফ্রিকা) "অধিকাংশ লোকের চিকিৎসার ব্যবস্থা (৫৫,০০০ লোক) নেই, অর্থাভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিধি পালন করাও অসম্ভব। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ভীষণ, খাদ্যাভাবে রক্তাল্পতাও খুব সাধারণ ব্যাধি।"

—সরকারী রিপোর্ট

৭ Jurgen Kuczynski : A Short History of Labour Conditions in the British Empire, 1800 to the Present Day (2nd ed. 1945). Pp. 165-177

জান্‌জিবার : (আফ্রিকা) "এখানকার লোক এত দরিদ্র যে অনেকে
(২৩৫,০০০ লোক) ভাল ক'রে খেতেই পায় না। গ্রামবাসীদের সঙ্গে নগরবাসীদের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। শিশুদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। না খেয়ে, আধপেটা খেয়ে তারা স্কুলে যায়। অভুক্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিয়ে লাভ কি ?" —সরকারী রিপোর্ট

বার্বাডস্ : (আফ্রিকা) "অধিকাংশ কৃষাণ পরিবার অনাহারেই থাকে।
(১৮৮,০০০ লোক) এত বড় পরিবার এবং তার তুলনায় এত কম আয় তাদের যে তা দিয়ে খাওয়া চলে না। খাদ্যাভাবে শিশুরা এত দুর্ব্বল ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে যে লেখাপড়া শেখার শক্তি তাদের আর থাকে না।"

—সরকারী রিপোর্ট

সিংহল : "সাধারণের মধ্যে খাদ্যাভাব খুব বেশী। দৃষ্টিহীনতা সিংহলের
(৫৬ লক্ষ লোক) সাধারণ ব্যাধি। প্রায় ১৪৭টি অন্ধ শিশুর ইতিহাস থেকে আমরা দেখেছি তার মধ্যে শতকরা ৬৬ জন পুষ্টিকর খাদ্যাভাব-জনিত কারণে অন্ধ।"

—সরকারী রিপোর্ট

উত্তর রোডেসিয়া : "অধিকাংশ স্থানে খাদ্যাভাব এত বেশী যে এখানে
(১৪ লক্ষ লোক) চিরন্তন দুর্ভিক্ষ বিরাজ করছে বললেও ভুল হয় না। মাতৃসদন বা শিশুসদন ব'লে কোন কিছুর অস্তিত্ব এখানে নেই বললেও চলে।" —সরকারী রিপোর্ট

জামাইকা : "কমিটির বিশ্বাস জামাইকার অধিকাংশ লোকেরই স্বাস্থ্য-
(১১ লক্ষ লোক) হানির কারণ পুষ্টিকর খাদ্যাভাব। মজুরদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।" —সরকারী রিপোর্ট

টাঙ্গানিকা : "মধ্যে মধ্যে কয়েক বৎসর ব্যাপী দুর্ভিক্ষ হয়, আর (৫০ লক্ষ লোক) কয়েকমাস ব্যাপী দুর্ভিক্ষ তো প্রায়ই হয়ে থাকে।"

—সরকারী রিপোর্ট

গোল্ড কোস্ট্ : "উপকূলবর্ত্তী সল্ট-পণ্ড নগরে শতকরা প্রায় ৭০ জন (৩৬ লক্ষ লোক) লোক যক্ষ্মায় ভুগ্‌ছে।" —সরকারী রিপোর্ট

বেকুয়ানাল্যাণ্ড : "সাধারণ স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ। সোনার খনির (২৬০,০০০ লোক) মজুরদের মধ্যে শতকরা ৩৭ জন কাজের অনুপযুক্ত।"

—সরকারী রিপোর্ট

কুজিনস্কি (J. Kuczynski) বলেছেন: "বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের 'কালা আদ্‌মিরা' অভুক্ত, অর্দ্ধভুক্ত ও পুষ্টিকর খাদ্যাভাবগ্রস্ত। অনাহারে ও পুষ্টিকর খাদ্যাভাবের জন্যে তারা নানারকম ব্যাধিতে ভোগে এবং তাদের প্রতিরোধ শক্তিও নষ্ট হয়ে যায়। অপুষ্টির কারণ সর্ব্বসাধারণের নিদারুণ দারিদ্র্য এবং শিক্ষার অভাবও বটে।"[৮] বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের (dependencies, protectorates, colonies, mandated territories etc, ভারতবর্ষ, বর্ম্মা, মালয় বাদ দিয়ে) লোকসংখ্যা কত?

আফ্রিকা	৪ কোটি ৮০ লক্ষ
আমেরিকা	২৫ লক্ষ
এশিয়া	১ কোটি ৪০ লক্ষ
অবশিষ্ট	৭½ লক্ষ

অর্থাৎ বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে মোট প্রায় ৬৫০,০০,০০০ লোক বাস করে। এর সঙ্গে ভারতবর্ষ, বর্ম্মা ও মালয়ের লোকসংখ্যা যদি যোগ করা যায় তাহ'লে প্রায় ৫০ কোটির কাছাকাছি লোক হয়। সমগ্র

৮ Jurgen Kuczynski : Op. Cit : Pp 177

সোভিয়েট ইউনিয়নের লোকসংখ্যার প্রায় আড়াইগুণ বেশী লোক বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। সমগ্র পৃথিবীর প্রায় ২০৬ কোটি লোকসংখ্যার চারভাগের একভাগ। অর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর জনসাধারণের দুঃখকষ্ট, দারিদ্র্য, অকালমৃত্যু, অর্দ্ধ-বর্ব্বরতা ও নিরক্ষতার জন্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দায়ী।

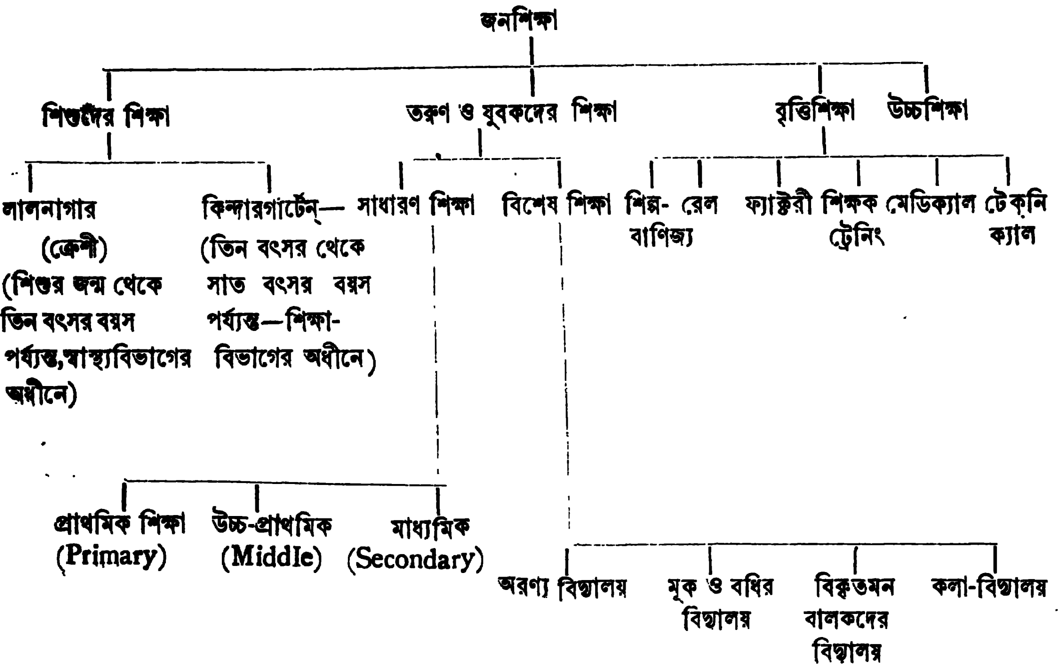
সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের ফলে মানবসমাজ ধীরে ধীরে দুর্গতি ও অবনতির কোন্ স্তরে নেমে আসতে পারে তার প্রমাণ বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ভারতবর্ষ। তথাকথিত 'অসভ্য' ও 'বর্ব্বরদের' সেই আদিম অসভ্য অনুন্নত সমাজ এর চাইতে আরও অনেক উন্নত ছিল। মানবগোষ্ঠীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আহার বিহার ও স্বাধীনতার দিক দিয়ে বিচার করলে আমরা আদিম অসভ্য গোষ্ঠীসমাজ ও যাযাবর সমাজকে সাম্রাজ্যবাদী মানবসমাজ থেকে নৈতিক দিক থেকে অনুন্নত বলতে পারি না। সে-সমাজে যেমন শিক্ষার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক মানুষের মধ্যে প্রবেশ করেনি, সাম্রাজ্যবাদী মানবসমাজেও তেমনি জনশিক্ষার কোন চিহ্ন নেই। বরং আদিম 'অসভ্য' সমাজে পরাধীনতা ছিল না, দারিদ্র্য ছিল না, দুর্ভিক্ষ (মানুষের সৃষ্টি) ছিল না, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্যই হ'ল এইগুলি।

'মানবসমাজ' কতদূর উন্নত বিচার করতে হ'লে একমাত্র 'জনকল্যাণের' দিক থেকে বিচার করতে হবে। জনকল্যাণের প্রথম কথা—ভাল স্বাস্থ্যকর বাসস্থান ও পরিবেশ, যেখানে প্রকৃতির খেয়ালী আক্রমণ ও উপদ্রব থেকে মানুষ আশ্রয় পাবে। দ্বিতীয় কথা—প্রয়োজনীয় ও পুষ্টিকর খাদ্যের সংস্থান। তৃতীয় কথা—রোগব্যাধি-মুক্তি ও দীর্ঘ পরমায়ু। এর কোনটার অভাবই সাম্রাজ্যবাদ পূরণ করতে পারেনি, বরং আরও তীব্রতর করেছে। সাম্রাজ্যবাদের অধীনে কোটি কোটি লোক ধ্বংসের পথযাত্রী।

এর প্রত্যেকটাই সমাজতন্ত্রবাদ পূরণ করেছে। সমাজতন্ত্রবাদই মানবসমাজে আবার স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, প্রাচুর্য্য ও পরমায়ু দান করেছে। গত প্রায় দুই শতাব্দীতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীন ৫০ কোটি লোকের চরম দুর্গতি ও অবনতির সঙ্গে গত বিশ বছরে সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের পথে মধ্য এশিয়ার মাত্র দেড় কোটি লোকের এবং গোটা সোভিয়েট দেশের প্রায় বিশ কোটি লোকের সর্ব্বাঙ্গীণ সামাজিক প্রগতির তুলনা করলে এ-সম্বন্ধে কারও মনে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

এইবার আমরা জনসাধারণের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কথা বলব। শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে সোভিয়েট দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। আমরা দেখেছি সোভিয়েট দেশে যেমন মানুষের বাসস্থান, নগর ও গ্রাম সব মানুষেরই কল্যাণের জন্যে, মানুষের জীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্যে গ'ড়ে উঠেছে, শিল্প-বাণিজ্য বা কাঁচামালের জন্যে নয়, সেই রকম সোভিয়েট দেশের স্কুল, কলেজ, ইন্স্টিটিউট্, বিশ্ববিদ্যালয় সব, শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোয় মানুষের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব, বুদ্ধি ও প্রতিভা ফুটিয়ে তোলার জন্যে গ'ড়ে উঠেছে, মানুষকে আবৃত্তি-যন্ত্র ও আমলাতন্ত্রের অফিসার বা কেরানী করার জন্যে নয়, মানুষকে অকর্ম্মণ্য ও একদেশদর্শী করার জন্যে নয়। মানুষকে কেন্দ্র ও চরম লক্ষ্য ক'রে সোভিয়েট দেশে তাই শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়েছে (২৭৬ পৃষ্ঠার চার্ট দ্রষ্টব্য)।

এই যে শিক্ষা-পরিকল্পনা এহ'ল মানবজীবনের সামগ্রিক পরিকল্পনা। জন্মের পর শিশুরা 'লালনাগারে' যায়। লালনাগারগুলি রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবিভাগের তত্ত্বাবধানে থাকে। লালনাগারে তিন বৎসর পর্য্যন্ত থাকার পর তারা যায় 'কিন্দারগার্টেনে'; সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সেখানে থাকে। কিন্দারগার্টেনগুলি রাষ্ট্রীয় শিক্ষা-বিভাগের অধীনে। কিন্দারগার্টেন থেকে



জনশিক্ষা
শিশুদের শিক্ষা
তরুণ ও যুবকদের শিক্ষা
বৃত্তিশিক্ষা
উচ্চশিক্ষা
লালনাগার (ক্রেশী) (শিশুর জন্ম থেকে তিন বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, স্বাস্থ্যবিভাগের অধীনে)
কিন্দারগার্টেন্— (তিন বৎসর থেকে সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত—শিক্ষা-বিভাগের অধীনে)
সাধারণ শিক্ষা
বিশেষ শিক্ষা
শিল্প-বাণিজ্য
রেল
ফ্যাক্টরী
শিক্ষক ট্রেনিং
মেডিক্যাল
টেক্‌নিক্যাল
প্রাথমিক শিক্ষা (Primary)
উচ্চ-প্রাথমিক (Middle)
মাধ্যমিক (Secondary)
অরণ্য বিদ্যালয়
মূক ও বধির বিদ্যালয়
বিকৃতমন বালকদের বিদ্যালয়
কলা-বিদ্যালয়

যায় 'প্রাথমিক' বিদ্যালয়ে সাত বৎসর বয়সে, তারপর যায় 'উচ্চ-প্রাথমিক স্কুলে'। সেখান থেকে যায় 'মাধ্যমিক স্কুলে'। এই তিনশ্রেণীর স্কুলের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ আছে। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হবার পর ছাত্ররা উচ্চশিক্ষা, বিশেষ শিক্ষা ও বৃত্তিশিক্ষার জন্যে অন্যান্য শিক্ষায়তনে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়। জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে, বিজ্ঞান-ইতিহাস-সাহিত্য শিল্পকলা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাতে প্রত্যেকের সাধারণ শিক্ষা ও জ্ঞান হয় সেইভাবেই স্কুলের পাঠ্যবিষয় ঠিক করা হয়ে থাকে। সোভিয়েট দেশের মাধ্যমিক স্কুলের পাঠ্য-বিষয়ের তালিকা দেখলে আমরা অবাক হয়ে যাব; ভাষা ও সাহিত্য, গণিতবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান, দেহতত্ত্ব ও শরীরতত্ত্ব), ক্রমবিকাশতত্ত্ব, ভূবিজ্ঞান, খনিজবিদ্যা, শাসনতন্ত্র, ইতিহাস (প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ), জাতীয় ইতিহাস, ভূগোল, বিদেশীভাষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, কলাবিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যা, রণবিদ্যা, এতগুলি বিষয় সম্বন্ধে মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হয় যা আমাদের দেশের, এমন কি অন্যান্য দেশের উচ্চশিক্ষিতরাও কল্পনা করতে পারে না। পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে সোভিয়েট শিক্ষার আদর্শ উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। মানবসমাজ ও সভ্যতা, বর্ত্তমান সমাজ, বিজ্ঞান ও সভ্যতা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ শিক্ষা দেওয়াই সোভিয়েট বিদ্যালয়ের আদর্শ। এ-ছাড়া কলাবিদ্যা, বিজ্ঞান, কারিগরি ও অন্যান্য যে-কোন বিষয়ে "বিশেষ" শিক্ষা দেওয়ার জন্যে শতশত শিক্ষায়তন আছে সোভিয়েট দেশে। যেদিকে ও যেবিষয়ে যার প্রতিভার স্বাভাবিক ঝোঁক সেইদিকে ও সেই বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করার অফুরন্ত সুযোগ তার আছে। সমাজজীবন ও শিক্ষা একসূত্রে গ্রথিত। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি তার ভিত্তি।

সোভিয়েট দেশের সর্ব্বতোমুখীন্ বিরাট বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-পরিকল্পনার

এইটুকু মুখবন্ধের এখানে প্রয়োজন হ'ল এইজন্তে যে শিক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সোভিয়েটের তুলনা করার সময় আমাদের এই মৌলিক পার্থক্যের কথা সব সময় স্মরণ রাখতে হবে। সোভিয়েট দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে অন্য কোন দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার তুলনা করা চলে না, ভারতবর্ষের অথবা বৃটিশ আফ্রিকার তো চলেই না। শিক্ষার গুণগত বা মৌলিক পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রয়োজনই নেই। 'শিক্ষা' বলতে, ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের কল্যাণে, এখানে আমাদের 'লিখতে-পড়তে জানা' বুঝতে হবে, আর 'সাধারণ সংস্কৃতি' বলতে বুঝতে হবে সংবাদপত্র, লাইব্রেরী, সিনেমা, থিয়েটার ইত্যাদির প্রচার-প্রচলন। এর বেশী বুঝলে চলবে না, আলোচনা বন্ধ করতে হবে। সিনেমা-থিয়েটার-সংবাদপত্র ইত্যাদি যদি একদেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যবসা হয়, অর্থাৎ সংস্কৃতির অর্থ যদি 'বাণিজ্য ও মুনাফা' হয় এবং সোভিয়েট দেশে যদি এগুলি রাষ্ট্র ও শিক্ষাবিভাগের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহ'লে এই দুই শ্রেণীর সংস্কৃতির মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য দেখা দেয় তার কথা এখানে আমরা কল্পনা করেই সন্তুষ্ট থাকব। 'সংখ্যা' দিয়ে তো আর 'গুণের' বিচার করা যায় না? তবে নীরেট 'সংখ্যার' মধ্যে 'গুণ' প্রতিফলিত হয় বৈকি!

সোভিয়েট মধ্য এশিয়া ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে। সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতির তুলনা করলে বলতে হয়, মধ্য এশিয়ার প্রগতি 'বৈমানিক' প্রগতি আর বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রগতি 'শম্বুক' বা শামুকের প্রগতি। দ্বিতীয় 'প্রগতি'-কে সমাজবিজ্ঞানীরা 'অধোগতিই' বলবেন। তবু এই 'প্রগতির' বিচার করা যাক :[১]

---

১ Leonard Barnes : Op. Cit : Ibid

লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যা (শতকরা হিসাব)

	১৯১৩-'১৪	১৯২৬	১৯৩৬	১৯৪০-'৪১
তুর্কমেনিস্তান —	০'৭	১২'১	৬৭	৭৬'৫
তাজিকিস্তান —	১	৩'৭	৭২	
উজ্‌বেকিস্তান —	প্রায় ১	১০'৬	৭০	
কাজাকস্তান —	×	×	৭৬	
কিরগিজ্‌স্তান —	২	×	৭০	

স্কুল, লাইব্রেরী, সিনেমা, থিয়েটার (১৯৩৯-'৪০)

	সিনেমা	থিয়েটার	লাইব্রেরী	স্কুল
তুর্কমেনিস্তান	২০৬(১৯৩৬)	৩৭	৭০০ল ৬০০র-র	১৪০০ প্রাঃ, ৪ উঃ, ৩৩ টেঃ
তাজিকিস্তান	৬৮(১৯৩৬)		৪২৫ল	৪৭০০ প্রাঃ, ৪০ উঃ, ২৪ টেঃ
উজ্‌বেকিস্তান	৭০০	৪০	৩০০০ (ল+র-র)	১,৩০০,০০০ স্কুলের ছাত্র ২১৯০০০ টেঃ স্কুলের ছাত্র ২৭উঃ,১০০ টেঃ
কাজাকস্তান	৮০০	৪০	২০০০ল ৪০০০র-র	১০,০০০,০০ ছাত্র সংখ্যা ২০উঃ,১০০ টেঃ
কিরগিজস্তান	২৫০	১৭	১৩৫০ (ল+র-র)	৩০০,০০০ ছাত্র সংখ্যা ২০০০ প্রাঃ, ৫ উঃ, ২৮ টেঃ

[*প্রাঃ=প্রাইমারী, উঃ=উচ্চশিক্ষালয়, টেঃ=টেক্‌নিকাল স্কুল, ল=লাইব্রেরী, র-র=রিডিং রুম।]

এই সংখ্যাগুলি বিচার করার সময় মনে রাখতে হবে যে আমীর খাঁদের আমলে সিনেমা থিয়েটারের কোন অস্তিত্ব ছিল না, আর স্কুল বলতে মাদ্রাসাই বুঝাত, যেখানে 'মোল্লা-মৌলবী' তৈরী হ'ত। ধর্ম্মশিক্ষা (তাও কাজ চলার মতো) ছাড়া অন্য কোন শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। 'কোরআন-শরীফে' আল্লাহ্ নাকি বৈজ্ঞানিক শিক্ষা 'হারাম' ব'লে বর্জ্জন করতে উপদেশ দিয়েছেন। অন্য কোন শিক্ষার উপায়ও ছিল না, কারণ অধিকাংশ জাতির কোন "বর্ণমালাই" (alphabet) ছিল না, যে ভাষা শিক্ষার বাহন হবে, অর্থাৎ 'লৈখিক ভাষা' তার কোন অস্তিত্বই ছিল না। মধ্যএশিয়ার অধিকাংশ জাতির 'বর্ণমালা' তৈরী করতে হয়েছে নূতন ক'রে। নূতন বর্ণমালার সাহায্যে লেখ্য ভাষা, সাহিত্য ও পাঠ্য-পুস্তক সব রচনা করতে হয়েছে। জনসাধারণের মন থেকে মোল্লা-মৌলবীদের বিষ ঝেড়ে ফেলতে হয়েছে ধীরে ধীরে। অনেকের মনে হ'তে পারে, তাহ'লে কি সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট 'ধর্ম্মশিক্ষা' বন্ধ ক'রে দিয়েছে? তা দেয়নি। আগেও বলেছি, আবার বলছি, 'ধর্ম্ম' ও 'ধর্ম্মশিক্ষা' সোভিয়েট দেশে 'ব্যক্তিগত' ব্যাপার। সোভিয়েট রাষ্ট্র কোন 'ধর্ম্মকেই' সমর্থন করে না। 'ধর্ম্ম' সম্বন্ধে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষ। ধর্ম্মশিক্ষার দায়িত্ব তাই ব্যক্তিগত, সোভিয়েট রাষ্ট্রের নয়। যার ইচ্ছা ধর্ম্মশিক্ষা গ্রহণও করতে পারে, বর্জ্জনও করতে পারে। যার ইচ্ছা ধর্ম্ম-প্রচারও করতে পারে, আবার ধর্ম্ম-বিরোধী প্রচারও করতে পারে। সুতরাং ধর্ম্মশিক্ষার দায়িত্ব সোভিয়েট রাষ্ট্রের নেই। অন্যান্য যাবতীয় শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

অন্যান্য শিক্ষার পথে বাধা অনেক। 'বর্ণমালা' ও 'লেখ্য ভাষার' বাধা, মোল্লা-মৌলবীদের কুশিক্ষা ও জনশিক্ষা-বিরোধী অপপ্রচারের বাধা এবং আরও অনেক পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা অতিক্রম ক'রে তাজিক-তুর্কি-কিরগিজ-

কাজাক-উজ্‌বেকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। সবই করতে হয়েছে গত বিশ বছরের মধ্যে। তার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৯৩৯-'৪০ সালের মধ্যে প্রত্যেক প্রজাতন্ত্রে গড়ে প্রায় ৭৫ জন শিক্ষালাভ করেছে। এই মহাযুদ্ধের মধ্যেও মধ্যএশিয়ার শিক্ষা থেমে থাকেনি। প্রত্যেক প্রজাতন্ত্রে যুদ্ধকালীন শিক্ষার সঠিক সংখ্যা ও তথ্য আজও এদেশে দুর্ল্লভ ব'লে এখানে উদ্ধৃত করতে পারলাম না। গড় পড়্‌তা হিসাবে আজ মধ্য এশিয়ার প্রত্যেক প্রজাতন্ত্রে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮০ থেকে ৮৫ জন লেখাপড়া জানে। এই হিসাব থেকে যদি "লালনাগারের" শিশুদের এবং অতি-বৃদ্ধ ও অথর্ব্বদের বাদ দেওয়া যায় তাহ'লে দেখা যাবে মধ্য এশিয়ার প্রায় প্রত্যেক লোক লেখাপড়া জানে অর্থাৎ নিজেদের ভাষায় লিখতে পারে, সংবাদপত্র ও বই পড়তে পারে।

এসব দেশে আমীর খাঁদের আমলে সংবাদপত্রের নামই শোনেনি কেউ, জারের আমলেও প্রায় তাই। রুশ ভাষায় দু-একখানি যে সংবাদপত্র প্রকাশিত হ'ত তা রুশ কর্ম্মচারী ও শাসকদের জন্যে। আর আজ ?[১০]

সংবাদপত্র (১৯৩৯-'৪০)

	সকল ভাষায়	জাতীয় ভাষায়
তাজিকিস্তান	... ৭০	প্রায় ৬০
উজ্‌বেকিস্তান	... ?	২২১ (১৯৩৬)
কিরগিজস্তান	... ৫০	৩৬
তুর্কমেনিস্তান	... ৬০	?
কাজাকস্তান	... ৩৫০	১৭০

---

১০ Leonard Barnes : Op. Cit : Ibid
আফ্রিকার সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক তথ্যের জন্য Lord Hailey-র "African Survey" অত্যন্ত মূল্যবান। Dr. Rita Hinden-এর "Plan for Africa"-ও দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা কাজাকস্তানের প্রায় দশগুণ বেশী, কিন্তু বাংলাদেশে সংবাদপত্রের সংখ্যা কত ? কলিকাতা ছাড়া মফঃস্বল সহর থেকে বোধ হয় খান দুই, আর কলিকাতা থেকে উল্লেখযোগ্য ১২খানা সংবাদপত্র বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়, আর ৭খানা হয় ইংরেজীতে। কাজাকস্তানে হয় ৩৫০ খানা, তার মধ্যে ১৭০ খানা কাজাক ভাষায়। এই আকাশ-পাতাল পার্থক্যের কারণ কি ? প্রথম কারণ বাংলাদেশে শতকরা ১৫ জন (১৯৪১) লিখতে-পড়তে জানে আর কাজাকস্তানে জানে শতকরা ৭৬ জন (১৯৩৯)। দ্বিতীয় কারণ হ'ল, বাংলাদেশের সংবাদপত্র শিক্ষা বা সংস্কৃতির বাহন নয়, সত্য ও তথ্যের প্রচারক নয়। বাংলার অধিকাংশ সংবাদপত্র কুৎসিত মিথ্যা ও অপপ্রচারের বাহন, কুশিক্ষার বাহন। বাংলার সংবাদপত্র ব্যক্তির ব্যবসা। ব্যক্তির মুনাফা ও পুঁজির পাহাড় তৈরী করার জন্যেই সংবাদপত্র প্রকাশ করা হয়, শিক্ষা বা সংস্কৃতির প্রসারের জন্যে নয়। কাজাকস্তানের সংবাদপত্র রাষ্ট্রের ও জনসাধারণের, কৃষি-প্রতিষ্ঠানের, কারখানার ও ট্রেড ইউনিয়নের। পার্থক্য এই কারণে।

এইবার শতাব্দীব্যাপী 'সুশাসনের' ফলে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের শিক্ষার প্রগতি কতদূর হয়েছে দেখা যাক।

গোল্ড কোস্ট (১৯৩৮)

স্কুল-বয়সী ছাত্র-সংখ্যা ৬০০,০০০

স্কুল-যাত্রী ছাত্র সংখ্যা ৯০,০০০—প্রাথমিক

১,০০০—মাধ্যমিক

স্কুল-যাত্রী ছাত্রদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা শতকরা ২৫ জন।

স্কুল-বয়সী প্রতি ৭ জনের মধ্যে ১ জন স্কুলে যায়।

উত্তরাঞ্চলে ২০০,০০০ স্কুল-বয়সী বালক-বালিকার মধ্যে মাত্র ১০০০ স্কুলযাত্রী।

উত্তর রোডেসিয়া (১৯৩৮)

স্কুল-বয়সী বালক-বালিকার সংখ্যা ২৫০,০০০
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা ৫০০০
লেখাপড়া-জানা শতকরা ২ জন

বৃটিশ ট্রপিকাল আফ্রিকায় মোট প্রায় ৪ কোটি লোক বাস করে। এই চার কোটি লোকের শিক্ষার জন্যে মোট ৬০টি মাধ্যমিক স্কুল আছে, বিশ্ববিদ্যালয় একটিও নেই। যারা স্কুলে যায় তাদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন 'প্রথম শ্রেণীর' (Standard I) বেশী অগ্রসর হয় না, শতকরা ১ জনেরও কম 'ষষ্ঠ শ্রেণী' পর্য্যন্ত এগিয়ে যায়।

থিয়েটার, সিনেমা, সংবাদপত্র, রেডিও? লর্ড হেলী বলেছেন, এসব পদার্থ বৃটিশ ট্রপিকাল্ আফ্রিকায় 'scarcely exist', বা কদাচিৎ দেখা যায়। অধিকাংশ আফ্রিকাবাসীর কাছে এসব বিজাতীয় তাজ্জব ব্যাপার। দেশী রঙ্গমঞ্চ ব'লে কিছু নেই। কিন্তু 'বাইবেল' প্রায় ২৪০টি ভাষায় অনূদিত হয়ে এ-দেশে প্রচারিত হ'চ্ছে, যদিও অধিকাংশ জাতির লেখ্য-ভাষায় পাঠ্য-পুস্তক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থের শোচনীয় অভাব। লাইব্রেরীও আফ্রিকায় প্রায় দুর্ল্লভ বলা চলে। আফ্রিকার প্রাচীনতম বৃটিশ উপনিবেশ গাম্বিয়ায় (Gambia) একটিও কলেজ, ক্লাব বা ইন্স্টিটিউট্ নেই যেখানে কোন পাঠাগার আছে। বইয়ের দোকানও একটিও নেই, সুতরাং কিনে পড়ারও উপায় নেই। নাইগেরিয়ায় (Nigeria)প্রায় ২কোটি লোক বাস করে,তাদের জন্যে মাত্র ১০টি গ্রন্থাগার আছে। গোল্ড কোস্টে কোন সাধারণ গ্রন্থাগার নেই, চারটি কলেজের মাত্র গ্রন্থাগার আছে যা উল্লেখ করা চলে। আফ্রিকার 'পশ্চিম উপকুল' খুঁজে বেড়ালে গোটা ১২ প্রতিষ্ঠান নজরে পড়বে যা 'গ্রন্থাগার' নামের সম্মান পেলেও পেতে পারে। অথচ এখানকার লোকসংখ্যা ২ কোটি

৬০ লক্ষ হবে প্রায়। সংবাদপত্র সম্বন্ধে লর্ড হেলী বলেছেন, সরকারী সংবাদপত্র ১টি প্রকাশিত হয় উত্তর রোডেসিয়ায়, ২টি টাঙ্গানিকায়, ১টি কেনিয়ায় (কিছুদিন আগে এই একটিও নাকি 'অর্থাভাবে' বন্ধ হয়ে গিয়েছে)। পূর্ব্ব ও মধ্য আফ্রিকার কয়েকটি পত্রিকা পাদ্‌রীরা পরিচালনা করেন। পশ্চিম আফ্রিকায় কয়েকটি আফ্রিকাবাসীর পত্রিকা আছে, কিন্তু ইংরেজী ভাষায়। এককথায় বলা যায়, বৃটিশ আফ্রিকায় দেশী ভাষায় কোন "স্বাধীন" পত্রিকা নেই। "স্বাধীন" কথার অর্থ এখানে—আফ্রিকাবাসীর দ্বারা প্রকাশিত, আফ্রিকাবাসীর মধ্যে প্রচারিত এবং বৃটিশ প্রভুদের কর্ত্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত।

সকলেই জানেন 'সুসভ্য' বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষকে শাসন করছেন প্রায় পৌনে দু'শ বৎসর। সাম্রাজ্যবাদীদের "সুশাসনে" আমরা নাকি প্রায় অর্দ্ধ-বর্ব্বর অবস্থা থেকে "সভ্যতার" স্তরে পৌঁছেচি। চার্চ্চিলরা প্রায়ই এ-কথা ব'লে থাকেন। দেখা যাক, কোন্ স্তরে পৌঁছেচি :

ভারতবর্ষ

(লেখাপড়া-জানা লোকসংখ্যা)

	শতকরা
১৮৮১	৪·৬
১৯২১	৭·১
১৯৩১	৮
১৯৪১	১১

এটা হ'ল ভারতের মোট জনসংখ্যার গড়্‌পড়্‌তা শতকরা হিসাব। ভারতবর্ষে নানা সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। কোন-কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে 'শিক্ষিতের' (লিখতে-পড়তে-জানা লোক) সংখ্যা অনেক বেশী। সুতরাং 'সাম্প্রদায়িক' হিসাব ছাড়া গড়পড়্‌তা হিসাবে জনসাধারণের

শিক্ষার অবস্থা ঠিক বোধগম্য হবে না। ১৯৪১ সালের 'সেন্সাসের' সম্পূর্ণ রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয়নি। 'সাম্প্রদায়িক' হিসাব ১৯৩১ সালের "সেন্সাস থেকেই দিচ্ছি : (শতকরা হিসাবে)

সম্প্রদায়	মোট শিক্ষিতের সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
পার্সী	৭৯'১	৮৪'৫	৭'৪
ইহুদী	৪১'৬	৪৮'৮	৩৩'৮
জৈন	৩৫'৩	৫৮'২	১০'৬
খৃষ্টান্	২৭'৯	৩৫'২	২০'৩
শিখ	৯'১	১৩'৮	২'৯
হিন্দু	৮'৪	১৪'৪	২'১
মুসলমান	৬'৪	১০'৭	১'৫

১৯৩১ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে শতকরা মাত্র ৩ জন 'শিক্ষিতের' সংখ্যা বেড়েছে। ১৯৪১ সালের "সাম্প্রদায়িক" হিসেব না পাওয়া গেলেও ক্ষতি নেই, কারণ শতকরা ৩ জনকে যদি উপরোক্ত ৭টি সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়া হয়, তাহ'লে পূর্ব্বোদ্ধৃত সংখ্যাতালিকার বিশেষ কিছুই বদলাতে হবে না। ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় "হিন্দু", এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির মধ্যে "মুসলমানেরাই" সর্ব্বপ্রধান। ১৯৪১ সালের শতকরা ৩ জন বৃদ্ধি ধ'রেও 'শিক্ষিত' হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৯ জন এবং শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৭ জনের বেশী হয়না। অর্থাৎ ১৯৪১ সালে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের গড়পড়তা "শিক্ষিতের" সংখ্যা শতকরা প্রায় ৮ জন হয়। এইভাবে আমরা 'সাম্রাজ্যবাদী সুশাসনের' "অর্দ্ধ-বর্ব্বর" অবস্থা থেকে আধুনিক "সভ্যতার" স্তরে উন্নীত হচ্ছি।

গোল্ডকোস্টের শিক্ষা-বিভাগের পরিচালক ১৯৩৮ সালে তাঁর রিপোর্টে মন্তব্য করেছিলেন : "এ-দেশে যেভাবে শিক্ষার প্রসার হ'চ্ছে তাতে মনে

হয় বর্ত্তমান শতাব্দীর শেষদিকে স্কুল-বয়সীদেব সকলে স্কুলেব শিক্ষাটুকু হয়ত পাবে"। চমৎকার মন্তব্য! ভারতবর্ষে ১৯২১ থেকে ১৯৩১ সালেব মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা প্রায় ১জন, আর ১৯৩১ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে শতকরা ৩জন, অর্থাৎ প্রতি দশ বছরে গড়পড়তা শতকরা ২জন ক'বে বেড়েছে। এই হাবে ভাবতবর্ষে শতকবা ৮০জন শিক্ষিত হ'তে, অর্থাৎ সোভিয়েট মধ্যএশিয়াব বর্ত্তমান স্তবে পৌছতে আরও প্রায় ৩৫০ বৎসর লাগবে। কিন্তু আবও ৩৫০ বৎসব সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের অস্তিত্ব থাকলে শিক্ষার্থীর অস্তিত্ব আদৌ থাকবে কিনা সন্দেহ আছে।

ভারতবর্ষ

	(১৯০১)	(১৯১১)	(১৯২১)	(১৯৩১)
উন্মাদ	৬৬,০২৫	৮১,০০৬	৮৮,৩০৫	১২০,৩০৪
বোবা-কালা	১৫৩,১৬৮	১৯৯,৮৯১	১৮৯,৬৪৪	২৩৯,৮৯৫
অন্ধ	৩৫৪,১০৪	৪৪৩,৬৫৩	৪৭৯,৬৩৭	৬০১,৩৭০
কুষ্ঠরোগী	৯৭,৩৪০	১০৯,০০৪	১০২,৫১৩	১৪৭,৯১১
	৬৭০,৬৩৭		৮৬০,০৯৯	১১০৯,৪৮০

প্রগতি কোন দিকে?

	লোকসংখ্যা	শিক্ষিতের সংখ্যা	উন্মাদ, বোবা-কালা, অন্ধ ও কুষ্ঠবোগীর সংখ্যা
১৯২১	৩১ কোটি ৮০ লক্ষ	২ কোটি ২২ লক্ষ ৬০ হাজার	৮ লক্ষ ৬০ হাজার ৯৯
১৯৩১	৩৩ কোটি ৮০ লক্ষ	২ কোটি ৫৪ লক্ষ ৪০ হাজার	১১ লক্ষ্য ৯ হাজার ৪৮০

দশবছরের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৩২ লক্ষ, বোবা-কালা-অন্ধ-কুষ্ঠ-উন্মাদের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৩লক্ষ, আর লোকসংখ্যা ২ কোটি। দুর্ভিক্ষ, প্লেগ, মহামারী, যক্ষ্মা প্রভৃতির মৃত্যুসংখ্যা যোগ করলে, জীবিত ব্যক্তির সংখ্যা যা দাঁড়াবে তার সঙ্গে উপর্যুক্ত হারে বর্দ্ধিত (১০ বছরে ৩ লক্ষ) বোবা-কালা-অন্ধ-কুষ্ঠ-উন্মাদের সংখ্যা বিয়োগ করলে সুস্থ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৫০ বৎসরে কত হবে? আর যতই হ'ক না কেন, দেখা যাচ্ছে গড়ে প্রতি 'বছরে' যত লোক 'শিক্ষিত' হ'চ্ছে প্রতি 'দশ বছরে' প্রায় ঐ একই সংখ্যক লোক বোবা হ'চ্ছে, কালা হ'চ্ছে, কুষ্ঠগ্রস্ত হ'চ্ছে, অন্ধ হ'চ্ছে উন্মাদ হ'চ্ছে। 'সাম্রাজ্যবাদ' কি ও কাকে বলে এইবার বোধ হয় উপলব্ধি করা সহজ হবে।

নারীমুক্তি

মানবসমাজের দু'টো দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি—মানুষের বাসস্থান স্বাস্থ্য ও পরিবেশ এবং মানুষের শিক্ষাদীক্ষা ও সাধারণ সংস্কৃতি। সমাজের আর একটি দিক আছে মানবসমাজের প্রায় অর্দ্ধেক জুড়ে, অর্থাৎ 'নারীজাতিকে' নিয়ে। মানবকল্যাণ ও সামাজিক প্রগতির কোন প্রচেষ্টা, কোন পরিকল্পনাই সফল হ'তে পারে না নারীজাতির মুক্তি প্রগতি কল্যাণ ভিন্ন। আমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্যে সংগ্রাম করি, কিন্তু পুরুষজাতির প্রায় সমান নারীজাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের ন্যায্য অধিকার ও স্বাধীনতার কথা চিন্তাও করি না। অর্দ্ধেক "মানুষকে" বাদ দিয়ে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ প্রগতি এবং মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতালাভ কি ক'রে সম্ভব?

আজ নয়, প্রায় ৮০ বছর আগে প্রথম ইণ্টারন্যাশনালের জেনেভা কংগ্রেসে (১৮৬৬) কার্ল মার্কস্ বলেছিলেন নারীজাতির পূর্ণ মুক্তি ভিন্ন ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম কখনও সফল

হতে পারে না। পৃথিবীর নির্য্যাতিত ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যে 'নারীজাতি' অন্যতম। মাতৃপ্রধান সমাজের বিলুপ্তির পর থেকে শ্রেণীসমাজে যেদিন থেকে পিতৃপ্রধান সমাজের আবির্ভাব হয়েছে, সেইদিন থেকে 'নারীজাতি' পুরুষের 'ক্রীতদাসে' পরিণত হয়েছে। সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে দেখা যায় শ্রেণীর (Class) আবির্ভাব, ব্যক্তিগত সম্পত্তির (Private Property) আবির্ভাব এবং নারীর দাসত্বের স্থচনা সমসাময়িক। সেই প্রাগৈতিহাসিক নব্যপ্রস্তর যুগ থেকে (প্রায় ১০ হাজার বছর) নারীজাতির দাসত্বের স্থচনা হয়েছে, এবং আজ পর্য্যন্ত সেই দাসত্ব ঘোচেনি। যে-শ্রেণীসমাজ নারীকে 'ক্রীতদাসে' পরিণত করেছিল একদিন সেই শ্রেণী-সমাজ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শোষণ-ব্যবস্থার অবলুপ্তি ভিন্ন নারীজাতির মুক্তি সম্ভব নয়। নারীর ভাগ্য আজ তাই অবিচ্ছেদ্যভাবে শোষিত ও নির্য্যাতিত শ্রেণীর বা শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত এবং শ্রমিক-শ্রেণীর সংগ্রামও নারীর মুক্তি ভিন্ন সার্থক নয়।

এ-কথা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মহানেতা লেনিন এবং সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ 'গঠনশিল্পী ও স্থপতি স্টালিন সর্ব্বান্তঃকরণে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরা জানতেন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা এবং তথাকথিত ব্যক্তি-স্বাধীনতা পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভিন্ন অর্থহীন ও অবান্তর। তাই বিপ্লবের পর তাঁরা পুঁজিপতি জমিদারশ্রেণী ও অবস্থাপন্ন কুলাকশ্রেণীকে ধীরে ধীরে উচ্ছেদ ক'রে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি সব জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত ক'রে যেমন বৃহত্তম মানবগোষ্ঠী শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর মুক্তির পথ পরিষ্কার ক'রে দিলেন তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে 'নারীজাতি' কারও "ব্যক্তিগত সম্পত্তি" নয়, কারও ক্রীতদাস নয়, প্রত্যেক পুরুষ ও স্বাধীন নাগরিকের মতো তারাও সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। বিপ্লবজাত সোভিয়েট রাষ্ট্র নারীর

মর্য্যাদা, স্বাতন্ত্র্য, স্বার্থ ও স্বাধীনতা রক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবে। জাতিভেদ ও বর্ণভেদ, জাতিবিদ্বেষ ও বর্ণ-বিদ্বেষ যেমন সোভিয়েট সমাজে অন্যায় অপরাধ, তেমনি স্ত্রীজাতিকে নির্য্যাতন করা বা ভোগবিলাসের পণ্যে পরিণত করাও নির্ম্মমভাবে দণ্ডনীয়। জীবন ও সমাজের সর্ব্বক্ষেত্রে পুরুষ ও স্ত্রীর সমানাধিকার সোভিয়েট রাষ্ট্রের অবশ্যপালনীয় 'আইনে' পরিণত করা হ'ল। কিন্তু 'আইন' পাশ করেই সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতারা চুপ ক'রে রইলেন না। তাঁরা জানেন,সমাজের বাস্তব অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হ'লে সমস্ত 'আইন-ই' অর্থহীন। নারীকে সেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। নারীজাতি মাতৃজাতি। পুরুষ ও নারীর জৈবিক পার্থক্য অস্বীকার করা মূর্খতা। এই জৈবিক পার্থক্যের জন্যে নারীর কতকগুলি স্বাভাবিক অসুবিধা ও অন্তরায় আছে। নারীকে গর্ভধারণ করতে হবে, শিশুপালন করতে হবে। তার জন্যে অর্থ ও অবসর প্রয়োজন। এই জন্যে তাকে পুরুষের উপর নির্ভর করতে হয় এবং ধীরে ধীরে পরিবারের অন্তঃপুরে বন্দী হতে হয়। প্রথমে এই দায়িত্ব থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া প্রয়োজন। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করলেন, অন্তঃসত্ত্বা নারীর ও প্রসূতির চিকিৎসা, সেবাশুশ্রূষা, তদারক, পুষ্টিকর খাদ্য, বিশ্রামের ব্যবস্থা ও আর্থিক সাহায্য করার দায়িত্ব সোভিয়েট রাষ্ট্রের। শিশুপালনের দায়িত্বও রাষ্ট্রের। এ-ছাড়া ব্যক্তিগত 'দায়িত্ব', আর্থিক ও নৈতিক,যা থাকবে তা পুরুষ ও স্ত্রীর 'আইনতঃ' সমান। সোভিয়েট দেশে অসংখ্য কলকারখানা, যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠান, নগরে নগরে হাজার হাজার মাতৃ-সদন, শিশুসদন, লালনাগার, কিন্ডারগার্টেন, প্রসূতি-ক্লিনিক্, পরামর্শ-কেন্দ্র, দুগ্ধ-সরবরাহ কেন্দ্র, সাধারণ কিচেন প্রভৃতি গ'ড়ে উঠল নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রে। লেনিন বললেন : "আমরাই নারীর প্রকৃত স্বাধীনতার পরিকল্পনা করেছি। দৈনন্দিন পারিবারিক জীবনের একঘেয়েমি

ও অবসাদ থেকে আমরাই নারীকে মুক্তি দিয়েছি। তার ফলেই নারী প্রকৃত স্বাধীনতা পেয়েছে এবং তার প্রতিভার স্বাভাবিক বিকাশের পথ সুগম হয়েছে। ঘরের চাইতে আরও ভালভাবে আমরা শিশুকে লালনপালন করার ব্যবস্থা করেছি। নারীশ্রমিকদের কল্যাণের জন্যে, নিরাপত্তার জন্যে পৃথিবীর মধ্যে আমরাই সবচাইতে উন্নত বৈজ্ঞানিক বিধি-ব্যবস্থা করেছি। বেকার ও অনাশ্রিতা নারীর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে আমরাই চেষ্টা করছি।" লেনিনের কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। সোভিয়েট দেশে এই পরিকল্পনা কতদূর সার্থক হয়েছে তার পরিচয় আমরা আগে দিয়েছি। মাতৃসদন, শিশুসদন, লালনাগার, কিন্দারগার্টেন ইত্যাদির প্রসারের কথাও আমরা বলেছি। সমাজের এই বৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্যেই আজ নারী-স্বাধীনতা ও নারী-প্রগতি সোভিয়েট-দেশে বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে। আর সমাজের এই বৈপ্লবিক রূপান্তর হয়নি ব'লেই ইউরোপীয় সমাজের তথাকথিত 'নারী-স্বাধীনতা' ও 'নারী-প্রগতি' প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

নারী-স্বাধীনতা ও নারী-প্রগতির ক্ষেত্রেও এশিয়া আজ ইউরোপকে অনেক পিছনে ফেলে অগ্রসর হয়েছে। সোভিয়েট মধ্য এশিয়া তার জ্বলন্ত প্রমাণ। মুসলমান-প্রধান মধ্য এশিয়ার নারী এতদিন ছিল হারেমের বিলাসিতার পণ্য-বিশেষ, আমীর-খাঁ ও বে-দের ভোগের সম্পত্তি। 'ইচ-কারীর' (অন্তঃপুর) বাইরে কোন বৃহত্তর জগতের অস্তিত্ব আছে ব'লে তারা জানত না। মুক্ত আকাশের সৌন্দর্য্যও তারা জীবনে কোনদিন 'চাচ্‌বান' ও 'পারাঞ্জার' ভিতর দিয়ে উপভোগ করেনি। মোল্লারা 'কোরআন' হাতে ক'রে সব সময় পাহারা দিতেন। 'ইচকারী' ও 'পারাঞ্জাই' মুসলমান নারীর জীবনের সর্ব্বস্ব, মোল্লাদের মতে। আজ মোল্লারা উধাও। 'কোরআনের' মোল্লা-কৃত অপব্যাখ্যা শুনতে আজ উজ্‌বেক-তাজিক-কিরগিজ-কাজাক-তুর্কী নারী রাজী নয়। আজ তারা 'ইচ্‌কারীর' বাঁধ

ভেঙে বাইরের মুক্ত দুনিয়ায় পা দিয়েছে। আজ তারা পারাঞ্জা ছিঁড়ে ফেলে পৃথিবীর দিকে চোখ মেলে চেয়েছে। আজ তারা জীবনের সর্ব্ব-ক্ষেত্রে পুরুষের সহকর্ম্মী। আজ মোল্লার মতে 'শিক্ষা' ও 'জ্ঞান' তাদের কাছে 'হারাম' নয়। আজ তারা শিক্ষয়িত্রী, বিজ্ঞানী, বৈমানিক, ডাক্তার নার্স, ইঞ্জিনিয়ার, রাষ্ট্রনেত্রী এবং আদর্শ মাতৃজাতি।[১১]

ভারতীয় নারী? নারীশিক্ষার জন্যে ভারতবর্ষে মাত্র ১৩০০ মাধ্যমিক স্কুল আছে, তার মধ্যে ২০০ মাত্র গবর্ণমেণ্ট স্কুল। মোট ৩২৫টি কলেজের মধ্যে উচ্চশিক্ষার জন্যে মাত্র ৪৫টি মেয়েদের কলেজ আছে ভারতবর্ষে। ১৯৩১ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৮থেকে ১১জন পর্য্যন্ত বেড়েছে কিন্তু শিক্ষিতা মেয়েদের সংখ্যা শতকরা ২ জন রয়েছে। তার মধ্যে আবার হিন্দু মেয়েদের মধ্যে শতকরা প্রায় ২'৫ এবং মুসলমান মেয়েদের মধ্যে শতকরা প্রায় ২ জন শিক্ষিতা (লিখতে-পড়তে জানে)। ভারতবর্ষে প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রসংখ্যা মাত্র ৮৬ লক্ষ আর ছাত্রীসংখ্যা ২৮ লক্ষ। সব প্রদেশ মিলিয়ে ছেলেদের জন্যে আছে মাত্র ১৬১ ০০০ প্রাইমারী স্কুল এবং মেয়েদের জন্যে ২৬ ০০০ স্কুল। এই হ'ল আমাদের দেশের মেয়েদের শিক্ষার অবস্থা। অন্যান্য ক্ষেত্রেও মেয়েদের অবস্থা সেই রকম শোচনীয়। ভারতবর্ষে প্রায় ২৫২, ০০০ মেয়ে কারখানায় কাজ করে কিন্তু একমাত্র 'ফার্স্ট এড্' ছাড়া তাদের স্বাস্থ্যরক্ষার আর দ্বিতীয় কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নেই বলা চলে। ভাল বাসস্থান, পুষ্টিকর খাদ্য, দুধ প্রভৃতির কোন ব্যবস্থা নেই।[১২] ক্লিনিক, স্বাস্থ্যাবাস, মাতৃসদন, লালনাগার যা সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার প্রত্যেক রিপাবলিকে আজ শতশত

---

১১ Fannina Halle : Women in the Soviet East.

১২ Lakshmi N. Menon : The Position of Women (Oxf. Pamphlets on Indian Affairs)

হাজার হাজার গ'ড়ে উঠেছে, ভারতবর্ষে তার অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। এইসব কারণে ভারতবর্ষে আজও প্রতি বৎসরে প্রায় ২০০,০০০ প্রসূতি-বিয়োগ হয়, অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ২২জন। এই প্রসূতিদের অধিকাংশেরই বয়স ১৫ থেকে ২০ বৎসরের মধ্যে। ১৫—২০ বৎসর বয়স্কা প্রতি ১০০০ জন প্রসূতির মধ্যে প্রায় ১০০জন, অর্থাৎ শতকরা ১০ জনের প্রসবকালে মৃত্যু হয়। এ-ছাড়া হিন্দু মেয়েদের 'শাস্ত্র' আছে, 'স্মৃতি-সংহিতা' আছে এবং মুসলমান মেয়েদের 'কোরআন্' আছে 'বোর্‌কা' আছে। শাস্ত্র ও কোরআন, পর্দ্দা ও বোর্‌কার সঙ্গে আছে 'যক্ষ্মা'। ভোর্ কমিটি বলেছেন যে পর্দ্দাপ্রথার জন্যে যক্ষ্মারোগের প্রভাব এইসব সমাজে খুব বেশী। পাঞ্জাবের "উইমেনস্ ক্রীশ্চান্ মেডিক্যাল কলেজের" 'যক্ষ্মা ও এক্স-রে' বিভাগের ডাইরেক্টর ডাঃ রোজ্‌রিস্তে মুসলমান মেয়েদের 'বোর্‌কার' সঙ্গে 'যক্ষ্মার' সম্বন্ধ বিচার ক'রে বলেছেন ("Tuberculosis in the Zenana"): "অল্প বয়স থেকে বোর্‌কা পরার জন্যে ১০ থেকে ১৪ বৎসর বয়স্কা মুসলমান মেয়েদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৪৪'৪৬ জন যক্ষ্মারোগে মারা যায় (অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধেক মরে আর অর্দ্ধেকের ক'জন যক্ষ্মাবীজাণু মুক্ত ?—বি)। সমবয়স্কা হিন্দু মেয়েদের মধ্যে যক্ষ্মা-রোগে মৃত্যুর সংখ্যা শতকরা ১৮'৮১ জন। আর প্রসূতির মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধিই হ'ল পর্দ্দা ও বোর্‌কার চরম পরিণতি।"[১৩]

এই হ'ল ভারতের নারী স্বাধীনতার স্বরূপ। সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার লক্ষ লক্ষ উজ্‌বেক-তাজিক-কাজাক-কিরগিজ-তুর্কী নারী ভারতের মুসলমান মেয়েদের বোর্‌কার কথা এবং হিন্দু মেয়েদের পর্দ্দাপ্রথার কথা, বাল্যবিবাহের (সর্দ্দা আইন সত্ত্বেও) কথা শুনলে তাদের বিশ বছর আগেকার ইতিহাস স্মরণ ক'রে ভয়ে শিউরে উঠবে। ভাববে যে তাদের

১৩ ভোর কমিটির রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃত।

ভারতীয় মা-বোনেরা আজও সেই মধ্যযুগের নরককুণ্ডে বাস করছে। ভারতবর্ষে আজ রামমোহন-বিদ্যাসাগরের আদর্শের এই মর্ম্মান্তিক পরিণতি হয়েছে। সকলেই জানেন প্রস্তাবিত "রাও বিল" সম্পর্কে যখন জনমত যাচাই করা হচ্ছিল তখন তথাকথিত উচ্চশিক্ষিতা ও উচ্চবংশীয়া মেয়েরাই তার কি প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিলেন। পণ্ডিত ও মনীষী পুরুষরা রাও বিলের বিরোধিতা করার জন্যে শাস্ত্র ঘেঁটে হয়রাণ হয়ে গিয়েছেন। অক্ষম, যৌনব্যাধিগ্রস্ত, পুরুষত্বহীন স্বামীর সঙ্গে বিবাহবন্ধন বিচ্ছেদের অধিকার, ব্যক্তিগত ও পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার ভারতীয় হিন্দুনারীর আজও নেই। 'রাও বিলে' এই প্রাথমিক ন্যায্য অধিকার মেয়েদের দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভারতের একশ্রেণীর শিক্ষিত পুরুষ ও নারী যেরকম উগ্রভাবে বিদ্রোহ করেছিলেন তা দেখলে পৃথিবীর যেকোন দেশের সভ্য নর-নারী লজ্জায় মাথা হেট করবে, সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার নর-নারীরা তো করবেই। এমনকি আমাদের দেশের আদিম অসভ্য আদিবাসীদের মধ্যেও অনেকে হয়ত লজ্জিত হবে। রাও বিলের বিরোধিতার অর্থ হ'ল আজও ভারতীয় সমাজে পুরোহিত ও মোল্লারা সর্ব্বাধিনায়ক (মুসলমান মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার ও বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার থাকলেও তাদের সামাজিক স্বাধীনতা নেই)। যতদিন এই পুরোহিত ও মোল্লারা সর্ব্বাধিনায়ক থাকবেন, যতদিন নারীর দৈনন্দিন ও অর্থনৈতিক জীবনের দায়িত্ব, নারীমঙ্গল ও শিশুকল্যাণের দায়িত্ব, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ব'লে স্বীকৃত না হবে, ততদিন ভারতীয় নারীর তথাকথিত স্বাধীনতা ও প্রগতির স্বপ্ন মরীচিকা মাত্র। ততদিন বোম্বাই-কলিকাতা মহানগরীতে যতই "প্রগতিশীলাদের" পদধ্বনি শোনা যাক না কেন, বোখারা-সমরকন্দ-তাস্কেন্দ থেকে তাঁরা অনেক যুগ পিছনে প'ড়ে থাকবেন।

মাত্র বিশ বৎসরের মধ্যে সোভিয়েট মধ্য এশিয়া বাদ্‌শাহী ও সাম্রাজ্য-বাদী গোরস্তান থেকে সমাজতান্ত্রিক 'গুলিস্তানে' রূপান্তরিত হয়েছে। নূতন যুগের মানুষ, নূতন যুগের সমাজ ও পরিবেশ সেখানে গ'ড়ে উঠেছে। সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার ফলে ২০০ বছরের কাজ ২০ বছরে সুসম্পন্ন হয়েছে। মাতৃজাতির মুক্তি, মানবশিশুর কল্যাণ, মানুষের স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল পরমায়ু ও সুন্দর বাসস্থান এই নিয়ে হ'ল সোভিয়েট মধ্য এশিয়া, তাজিকিস্তান-উজ্‌বেকিস্তান-কিরগিজস্তান - তুর্কীস্তান-কাজাকস্তান — সোভিয়েট গুলিস্তান—

আর প্রায় দু'শ বৎসরের মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও কুশাসনের ফলে আফ্রিকা, এশিয়ার একাংশ ও ভারতবর্ষ অশিক্ষা-কুশিক্ষা নিয়ে, যক্ষ্মা-কুষ্ঠরোগী-অন্ধ-বোবা-কালা-উন্মাদ, নিয়ে, দুর্ভিক্ষ-মহামারী-প্লেগ নিয়ে, কদর্য্য ব্যারাক্-বস্তি নিয়ে, মাতৃমৃত্যু-শিশুমৃত্যু নিয়ে গোরস্তানে পরিণত হয়েছে—সাম্রাজ্যবাদী গোরস্তান।

লোককলা ও বিজ্ঞান

সোভিয়েট মধ্যএশিয়ার যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির কথা আমরা বলেছি তা সম্ভব হয়েছে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার জন্যে। সামাজিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সর্ব্বাঙ্গীণ ও ব্যাপক প্রয়োগকেই এককথায় 'সোশ্যালিজম' বা 'কমিউনিজম' বলা চলে। বিজ্ঞানের এই ব্যাপক প্রয়োগ সোভিয়েট সমাজের সর্ব্বক্ষেত্রে করা হয়েছে বলেই জ সেখানে প্রাচুর্য্য ও সাম্যের ভিত্তিতে এমন একটি সমাজ গ'ড়ে উঠছে পৃথিবীর অন্য কোথাও যা গ'ড়ে ওঠেনি। গ'ড়ে ওঠা সম্ভবও নয়, কারণ ধনতান্ত্রিক সমাজে মানবকল্যাণ নয়, প্রাচুর্য্য নয়, মুনাফালোভীর দাসত্ব করাই হ'ল বিজ্ঞানের আদর্শ। পারমাণবিক শক্তির (Atomic Energy) ধ্বংসাত্মক রূপ দেখে মার্কিন পুঁজিপতিদের বীভৎস উল্লাস ও ঔদ্ধত্য তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু এই পারমাণবিক শক্তির মুক্তিকে সোভিয়েট দেশ কিভাবে অভিনন্দন জানিয়েছে? রুবিনস্টাইন বলেছেন: "পারমাণবিক শক্তি ভবিষ্যতের এক বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে।

অদূর ভবিষ্যতেই সেই সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হবে। কিন্তু অন্য দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা, যাঁরা এই পারমাণবিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, তাঁরা আজ এই বিরাট শক্তির সামাজিক সদ্ব্যবহারে প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করছেন। কারণ এই শক্তির ব্যাপক প্রয়োগ সামাজিক ক্ষেত্রে সম্ভব হ'লে তাঁদের ব্যক্তিগত মুনাফা ও মূলধনের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। এইভাবে এ-যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও টেক্‌নিক একচেটিয়া পুঁজিবাদের কবলে বন্দী হয়ে আছে। সোভিয়েট দেশে পুঁজিবাদ নেই, মূলধন ও মুনাফা-পুষ্ট সমাজের বিরোধ নেই। তাই আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে শ্রমশিল্প ও যানবাহনের ক্ষেত্রে যাতে এই যুগান্তকারী শক্তির প্রয়োগ করা যায় তার জন্যে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা ব্যাপক প্রচেষ্টার পরিকল্পনা করেছেন।"

ধনতান্ত্রিক দেশে বিজ্ঞান হ'ল মূলধন ও মুনাফার ক্রীতদাস, বিজ্ঞানী হলেন পুঁজিপতির অনুগ্রহজীবী। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী সেখানে সামাজিক কল্যাণের আদর্শ-চ্যুত। সমাজ ও মানুষের জীবন থেকে বিজ্ঞান বিচ্ছিন্ন। বিজ্ঞানী ল্যাবোরেটরীতে বন্দী, মারণাস্ত্রকে আরও মারাত্মক করার 'মহৎ' কাজে লিপ্ত। ধনতান্ত্রিক সমাজে তাই নগর থেকে গ্রাম বিচ্ছিন্ন, ল্যাবোরেটরী থেকে বাইরের সমাজ বিচ্ছিন্ন, কলকারখানা থেকে শ্রমজীবীরা বিচ্ছিন্ন, স্কাইস্ক্রেপারের পাশে বস্তি-ব্যারাক্ বিচ্ছিন্ন, স্ট্রীম্‌লাইনড্ মোটরের পাশে ছ্যাক্‌রা গাড়ী বিচ্ছিন্ন। ধনতান্ত্রিক দেশে তাই সৃষ্টির অভাব, জীবনের অভাব এবং ধ্বংস ও মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব। পুনর্গঠনের ব্যাপক পরিকল্পনার অভাব হ'লেও সেখানে পুনর্ধ্বংসের বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার অভাব হয় না। প্রাচুর্য্য ও দারিদ্র্য, বিলাস ও দুর্ভিক্ষ, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও মহামারী, বিজ্ঞান ও কুসংস্কার, ল্যাবোরেটরী ও গির্জ্জা, ঔষধি-বিজ্ঞান ও জাদুবিদ্যা ধনতান্ত্রিক দেশে সমান বেগে এগিয়ে

চলে। সমাজতন্ত্রের দেশে এই বিরোধ নেই। তাই সোভিয়েট সমাজে মানুষের জীবন থেকে বিজ্ঞান বিচ্ছিন্ন নয়, ল্যাবোরেটরী, কলকারখানা ও ফসলক্ষেত্রের যোগাযোগ সেখানে গভীর। নগর ও গ্রামের ব্যবধান, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, কুসংস্কার ও জাদুবিদ্যা সব তাই সোভিয়েট সমাজে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আদিম ও মধ্যযুগের মধ্যএশিয়া, বোখারা-সমরকন্দ-তাস্কেন্দ আজ তাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের শীর্ষস্থানে পৌঁছেচে।

বিজ্ঞানে ইসলামের দান

সোভিয়েট মধ্যএশিয়ায় বিজ্ঞানের বৈপ্লবিক উন্নতির কথা বলার আগে বিজ্ঞানে ইসলামের দানের কথা বলতে হয়। কারণ বোখারা-সমরকন্দের আমীর ও মোল্লা-মৌলবীরা ইসলামের এই গৌরবময় ইতিহাসের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন। গ্রীক সভ্যতা ও গ্রীক বিজ্ঞানের অবনতির পর একদিন যখন ইউরোপে জ্ঞানের শেষ রশ্মিটুকু পর্য্যন্ত নিভে আসছিল, তখন আরবীয় বিজ্ঞানীরাই আবার সেই বিজ্ঞান ও জ্ঞানের আলোকবর্ত্তিকা জ্বেলে মানবসভ্যতার প্রায়ান্ধকার পথ আলোকিত করেছিলেন। তাঁদের অবদান সভ্যতার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। একদিকে প্রায়-লুপ্ত গ্রীক বিজ্ঞান এবং আর একদিকে ভারতের প্রাচীন হিন্দু-বিজ্ঞানের সম্ভার আহরণ ক'রে, তাকে আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ ক'রে আরবীয় বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের যে উন্নতি-সাধন করেছিলেন, পরবর্ত্তীকালের মোল্লা-মৌলবীরা তাকে অস্বীকার করলেও, ইসলাম-বিরোধী বললেও, ইতিহাস অস্বীকার করবে না কোনদিন। শাস্ত্রকার, পণ্ডিত-পুরোহিত ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রাধান্যের যুগে যেমন প্রাচীন হিন্দুবিজ্ঞানের গৌরবময় যুগের অবসান হ তেমনি আমিরী ও

বাদ্শাহী স্বেচ্ছাচারিতার যুগে, মোল্লা-মৌলবী-কাজী-গাজীর প্রাধান্যের যুগে প্রাচীন আরবীয় বিজ্ঞানের গৌরবময় ঐতিহ্যও একেবারে অবলুপ্ত হ'ল। ইতিহাসের কি অদ্ভুত বিচার ও গতি! হিন্দু-মুসলান আজ 'শাস্ত্র' ও 'কোরআন্'-সর্ব্বস্ব অশিক্ষিত, কুসংস্কারগ্রস্ত, আত্মঘাতী জাতিতে পরিণত হয়েছে। আজ এশিয়ার হিন্দু-মুসলমানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুরু ইউরোপ। সোভিয়েট মধ্যএশিয়ার তাজিক-তুর্কী, উজ্‌বেক-কাজাক-কিরগিজ বিজ্ঞানীরা আজ ইসলামের এই অস্তমিত গৌরব ফিরিয়ে আনছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ প্রাচীন এশিয়ার মর্য্যাদা আজ তারাই পুনরুদ্ধার করছে। আগামীকালের এশিয়া সোভিয়েট মধ্যএশিয়ার এ-ঋণ কোনদিন পরিশোধ করতে পারবে না।

খলিফা অল্-মনসুর বগ্‌দাদ নগরী স্থাপন করেন প্রায় ৭৬২ খৃষ্টাব্দে। তার আগে মুসলমানদের বিজয় অভিযানের ইতিহাস, ইউরোপ থেকে এশিয়া পর্য্যন্ত বিশাল ইসলাম-সাম্রাজ্য স্থাপনের ইতিহাস। সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করার সুযোগ তখনও হয়নি। মদিনা থেকে দমস্কস্, দমস্কস্ থেকে বগ্‌দাদে যখন রাজধানী স্থানান্তরিত হ'ল তখন খলিফারা সাম্রাজ্য গঠন ছেড়ে সমাজ ও সংস্কৃতির দিকে নজর দিলেন। নূতন নগর গঠন করার জন্যে তাঁরা যেমন বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার আনলেন, তেমনি দেশ-বিদেশের বিদ্যার্থীদেরও নিয়ে এলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান-প্রদানের জন্যে। টাইগ্রিস্ নদীর তীরে বগ্‌দাদ নগরী, সুতরাং ভারতবর্ষ ও চীনের সঙ্গে সমুদ্রপথে যোগাযোগ রক্ষা করাও সহজ হ'ল। একদিকে বিরাট বাণিজ্যকেন্দ্র, আর একদিকে প্রাচ্যের নূতন এক সংস্কৃতি-কেন্দ্র হয়ে উঠল বগ্‌দাদ নগরী। অধ্যাপক জাখাউ (Sachau) এইজন্যেই বলেছেন: "আরবীয় সাহিত্যের জন্মভূমি দমস্কস্ নয়, বগ্‌দাদ। আব্বাস-বংশীয় খলিফাদের প্রচেষ্টায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় আরবীয় সাহিত্য পুষ্টিলাভ

করে। ৭৫০ থেকে ৮৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আরবীয় সাহিত্যের মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়। বিদেশী সাহিত্যের সাহায্য নিয়ে নানাদিকে বিরাট সাহিত্য গ'ড়ে ওঠে। গ্রীস পারস্য ও ভারতবর্ষ আরবীয় মনের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করতে যথেষ্ট সহায়তা করে।" ·

ভারতবর্ষের দান হুটি ভিন্ন পথে বগ্‌দাদে এসে পৌঁছায়। এই পথ হু'টির একটি হ'চ্ছে সোজা সংস্কৃত থেকে আরবী ভাষায় অনুবাদের পথ, আর একটি হ'চ্ছে ভারত থেকে ইরানের মধ্য দিয়ে আরবে পৌঁছবার পথ। অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে পারসী এবং পারসী থেকে আরবী ভাষাতেও অনেক গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। অধ্যাপক জাখাউ বলেন, ভারতের অনেক লোককথা (যেমন করটক-দমনক ইত্যাদি) এবং বিখ্যাত হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্র, সম্ভবত "চরক," এইভাবে আরবী সাহিত্যে প্রবেশলাভ করেছে। শুধু হু'টি বিভিন্ন পথ নয়, হুটি বিভিন্ন সময়েও ভারতের সঙ্গে বগ্‌দাদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। সিন্ধু প্রদেশ খলিফা মনসুরের (৭৫৩-৭৭৪ খৃঃ অঃ) শাসনাধীন ছিল। এখান থেকে বগ্‌দাদে যে সব প্রতিনিধি আসতেন তাঁদের সঙ্গে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও থাকতেন। এই পণ্ডিতরা হুখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আরব দেশে নিয়ে আসেন। একখানি ব্রহ্মগুপ্ত প্রণীত 'সিন্দ্‌ হিন্দ্', আর একখানি 'আরকান্দ্'। এই পণ্ডিতদের সাহায্যেই অল্‌-ফজরী এবং সম্ভবত ইয়াকুব-বিন্‌ তারিকও গ্রন্থ হু'খানির অনুবাদ করেন। আরবীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তি রচনা করে এই গ্রন্থ হু'খানি। টলেমির কাছ থেকে শিক্ষা পাবার অনেক আগেই আরবীয়রা ব্রহ্মগুপ্তের কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন। হারুন্‌ অল্‌-রশীদের রাজত্বকালেও (৭৭৬-৮০৮ খৃঃ অঃ) অনেক হিন্দু পণ্ডিত ও শিক্ষক বগ্‌দাদে এসেছিলেন। এই সময় বগ্‌দাদ থেকে মুসলমান ছাত্ররা ভারতবর্ষে আসতেন চিকিৎসাশাস্ত্র ও

ভেষজবিজ্ঞান পাঠ করতে। ভারতীয়দের নানা কাজে নিযুক্ত ক'রে বগ্‌দাদে নিয়ে আসতেন। সাধারণত আরবী দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির প্রধান চিকিৎসকের কর্তব্যভার তাঁদের উপর দেওয়া হ'ত। প্রাচীন হিন্দুদের ঔষধিবিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্রের প্রামাণিক গ্রন্থগুলি মূল সংস্কৃত থেকে এই পণ্ডিতদের সাহায্যেই আরবীতে অনূদিত হয়েছে। হারুন অল্-রশীদ্ এসব গ্রন্থ ছাড়াও হিপোক্রেতিস্, আরিস্ততল্, গ্যালেন প্রমুখ প্রাচীন মনীষীদের গ্রন্থও অনুবাদ করার আদেশ দেন। হারুনের পরে খলিফা অল্-মামুন বিদেশী গ্রন্থ অনুবাদ করার জন্যে একটি 'কলেজ' স্থাপন করেন এবং অনেক সিরীয় অনুবাদক নিয়ে আসেন। এইভাবে আরবীয় বিজ্ঞান-সাহিত্যের ভিত্তি রচিত হয় এবং আরবীয় বিজ্ঞানীরা অনেক নূতন অবদানে তাকে সমৃদ্ধ করেন। আরবীয় গণিতবিজ্ঞানী অল্-খোয়ারিজিমির 'অল্-জবর উ-এল্ মুকাবালা' বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ। 'অল্-জবর' কথা থেকেই বীজগণিতের নাম 'এ্যালজাব্রা' হয়েছে। বণিক ও নাবিক আরবীয়রা প্রধানত গণিতবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানেই মনোনিবেশ করেন। থবিত্, অল্-বত্তানি প্রমুখ আরবীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দান অসামান্য।[১]

'আল্‌কেমি' ও প্রাচীন রসায়নবিদ্যাতেও আরবীয় বিজ্ঞানীদের দান উল্লেখযোগ্য। আরবীয় আল্‌কেমিস্টদের মধ্যে জবির ইব্‌ন-হৈয়ান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হারুনের রাজত্বকালে জবিরের প্রতিষ্ঠা হয়। ক্রাউদার বলেছেন, জবির ভস্মীকরণ (calcination) ঊর্দ্ধপাতন (sublimation)

---

১ J. G. Crowther : The Social Relations of Science

G. Sarton : Introduction to the History of Science Vols. I & II (১৩০০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ইতিহাস দুই খণ্ডে আছে)।

W. C. Dampier : A Shorter History of Science.

অধঃপাতন (distillation) প্রভৃতি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং প্রক্রিয়াগুলির ব্যাখ্যা ক'রে গিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে। লৌহ, ইস্পাত ও অন্যান্য ধাতুর নানারকম ব্যবহার সম্বন্ধেও তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। ক্রাউদার বলেছেন, রসায়নবিদ্যায় পরীক্ষামূলক গবেষণার গুরুত্ব সম্বন্ধে জবির যেরকম সচেতন ছিলেন তাই থেকেই বুঝা যায় প্রকৃত বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর স্থান কত উঁচুতে ছিল। জবির বলেছেন যে প্রত্যক্ষ পরীক্ষা ও গবেষণাই হ'ল রসায়নের প্রাণ। জবীরের পর রাজীর নাম উল্লেখযোগ্য। রাজী 'ধাতুবিদ্যা' (Metallurgy) সম্বন্ধে যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। ধাতু গলিয়ে, পিটিয়ে নরম করার জন্যে যেসব যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় রাজী তার একটা তালিকা পর্য্যন্ত তৈরী ক'রে দিয়েছেন। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও মনে হয় আরবীয় আল্‌কেমিস্ট ও রসায়নবিদদের সঙ্গে প্রাচীন হিন্দু বিজ্ঞানীদের যোগাযোগ ঘটেছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রে ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করের কথা ক্রাউদার সাহেব উল্লেখ করেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় 'আল্‌কেমি' ও 'রসায়নশাস্ত্র' প্রসঙ্গে নাগার্জ্জুন, বরাহমিহির প্রমুখ বিজ্ঞানীদের নাম উল্লেখ করেননি। জবির ইব্‌ন-হৈয়ান জন্মগ্রহণ করেন ৭২১ খৃঃ অব্দে এবং রাজী ৮৬৬ খৃঃ অব্দে। ভারতবিদ্‌রা নাগার্জ্জুনের কাল প্রায় ১৫০ খৃঃ অব্দ এবং বরাহমিহিরের ৫৮৭ খৃঃ অব্দ নির্ণয় করেছে। নাগার্জ্জুনের 'রসরত্নাকর' গ্রন্থে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও ধাতুবিদ্যার কলাকৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।[২] বরাহমিহিরের 'বৃহৎ সংহিতার' মধ্যে 'বজ্রলেপ' (Cements strong as the thunderbolt), 'যন্ত্রবিদ' (Experts in Machinery), 'রাগগন্ধযুক্তিবিদ্‌' (Experts in the Composition of Dyes and Cosmetics) প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়।

২ **P. C. Roy : A History of Hindu Chemistry (Vol. II 2nd ed, 1925) : Chap I**

'শিলাদীরণ' বা কিভাবে শক্ত শিলা দীর্ণ করতে হয়, 'শস্ত্রপান' বা কিভাবে ইস্পাত শক্ত করতে হয়, 'খড়্গালক্ষণম্' বা কিভাবে লোহার অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করতে হয়, 'বজ্রলেপ' বা মজবুত সিমেণ্ট তৈরী করতে হয় কি ক'রে, 'বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ' প্রভৃতি নানাবিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা আছে বরাহমিহিরের 'বৃহৎ সংহিতায়'। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রাচীন হিন্দুবিজ্ঞানের এই সব অবদান সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।[৩] প্রাচীন ভারতের 'রসার্ণব' গ্রন্থে দোলাযন্ত্র, গর্ভযন্ত্র, হংসপাক যন্ত্র প্রভৃতির কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই বলা হয়েছে : "রস, উপরস, ধাতু, এক খণ্ড বস্ত্র, একজোড়া হাপর, লৌহ-যন্ত্রাদি, পাথরের খল ও পেষণযন্ত্র, একটি কোষ্ঠিযন্ত্র, একটি বাঁকা নল... কিছু গোময়, কাঠ, নানাপ্রকার মাটির তৈরী পাত্র ও যন্ত্র, একজোড়া সাঁড়াশী, নানাধরণের লোহা, তুলাদণ্ড ও ছোট বড় ওজন, বাঁশের নল, লোহার নল, চর্ব্বি, অম্ল, লবণ, ক্ষার, বিষ—এই সব পদার্থ প্রথমে সংগ্রহ করবে, তারপর রাসায়নিক প্রক্রিয়া আরম্ভ করবে।"

প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানকে আরবীয় পণ্ডিতেরা যেমন পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন, তেমনি প্রাচীন হিন্দু বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে আরবীয় বিজ্ঞান-সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করার সুযোগ তাঁরা পেয়েছিলেন। শুধু বিজ্ঞানে নয়, ইতিহাসে, ইসলামী ধর্ম্মতত্ত্বে, দর্শনে, সুকুমার সাহিত্যে আরবীয়দের দান অমর হয়ে আছে। আরবী সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান হ'ল "অল্ফ্ লয়্লহ্ ওঅ লয়্লহ্" অর্থাৎ 'একাধিক সহস্র রজনী' যাকে ইংরেজীতে 'The Arabian Nights' এবং বাংলায় 'আরব্য রজনী' বা 'আরব্য উপন্যাস' বলা হয়। হিন্দুদের 'রামায়ণ মহাভারত', খৃষ্টানদের 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট', হোমেরের 'ইলিয়াদ ও ওদুস্সেইআ (অডিসি)' প্রভৃতি পৃথিবীর

---

৩ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'A History of Hindu Chemistry' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল লিখিত 'Addenda' দ্রষ্টব্য (২৮৫ পৃঃ–২৯০ পৃঃ)

কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের মধ্যে 'অল্‌ফ্‌ লয়্‌লহ্‌' (আরব্য রজনী) নিঃসংশয়ে স্থান পেতে পারে। মুহম্মদ সমস্ত আরব দেশকে এক অখণ্ড রাষ্ট্রে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারীরা সিরিয়া, পারস্য, মিসর ও মধ্য এশিয়ার কিয়দংশ (বর্ত্তমানে সোভিয়েট মধ্য এশিয়া) এবং ভারতের সিন্ধু প্রদেশ জয় করেন, ওদিকে উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, মাণ্টা ও সিসিলি দ্বীপে আরব অধিকার বিস্তৃত হয়। আরবজাতির এই আশা আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন, নানাজাতির বিচিত্র জীবন-প্রবাহ, কথা-কাহিনী-রূপকথা, সব যেন সাগর সঙ্গমে মিলিত হয়েছে 'আরব্য রজনীতে'। প্রাচীন আরবদের ভাষা ও রচনাভঙ্গী, ইরানের নিজস্ব রোমাণ্টিক আখ্যান, মধ্যযুগের ভারতের 'বৃহৎকথা', 'কথাসরিৎসাগর', হিতোপদেশ-পঞ্চতন্ত্রের কথা, হারূন্‌-অল্‌ রশীদ প্রমুখ আব্বাস-বংশীয় খলিফাদের রাজত্বকালের নানাকথা, কাইরো ও দমস্কস্‌ নগরীতে ফাতিমী, অয়্যূবী ও মম্‌লুক বংশীয় সুলতানদের কথা, বহু ঐতিহাসিক, অর্দ্ধ-ঐতিহাসিক কাহিনী, সামাজিক ও পারিবারিক উপাখ্যান, আরব মুসলমান মনীষীদের মনীষা ও পাণ্ডিত্য, দিগ্বিজয়ী আরব বণিক ও নাবিকদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, দেশ-বিদেশের কাহিনী, গ্রীক, সিরীয় ও মিসরীয় জগতের নানা গাল গল্প, ক্রুসেডের যুগের ইউরোপীয়দের কাছ থেকে পাওয়া আখ্যান-বস্তু, শত সহস্র ধারায় ৫ : ৮০০ বছর ধ'রে প্রবাহিত হয়ে এসে আরবদের মরু-চিত্তে এক বিরাট মহাসমুদ্রের কল্লোল সৃষ্টি করেছিল। সাহিত্যের সেই মহাসমুদ্র হ'ল 'অল্‌ফ্‌-লয়্‌লহ্‌'।[৪]

বিজ্ঞানে ও সাহিত্যে আরবীয়দের এই অবদান মানবসংস্কৃতির ভাণ্ডারে অক্ষয় হয়ে থাকবে। কিন্তু এই বিশাল আরবীয় সংস্কৃতিরও সঙ্কট ঘনিয়ে

৪ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়: বৈদেশিকী: 'আরব্য-রজনী' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—পৃঃ ১৭৬

এল একদিন। যে কারণে গ্রীক সভ্যতা, গ্রীক সাহিত্য ও বিজ্ঞানের শোচনীয় অবনতি ঘটেছিল, সেই কারণেই ইসলামী সভ্যতা, ইসলামী সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সঙ্কট দেখা দিল। 'দাসত্ব' (Slavery) যে-সমাজ ও সভ্যতার ভিত্তি, তার জীবনীশক্তি একদিন নিঃশেষিত হবেই। গ্রীক সভ্যতার হয়েছিল, ইসলামী সভ্যতারও হয়েছে। দাসত্বের বিষে জর্জ্জরিত ইসলামী সংস্কৃতি একদিন অন্তঃসারশূন্য হয়ে এল। প্রায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ব্বর মোঙ্গোল জাতির আক্রমণে সমরকন্দ থেকে বগ্‌দাদ পর্য্যন্ত বিজিত ও বিধ্বস্ত হ'ল, তাতার তৈমুর দিল্লীর মস্‌নদ পর্য্যন্ত ধূলায় গুড়িয়ে দিলেন। অন্তঃসারশূন্য ইসলামী রাজ্যের বিরাট সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সৌধ টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙে পড়ল। শুধু গ্রীক বা ইসলামী সংস্কৃতির নয়, প্রাচীন হিন্দু-সংস্কৃতিরও অবনতির কারণ হ'ল এই 'দাসত্ব'। বর্ণবৈষম্য, জাতিভেদ ও দাসত্বের বিষে প্রাচীন হিন্দু-সংস্কৃতিও ধীরে ধীরে অন্তঃসারশূন্য কঙ্কালে পরিণত হ'ল। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর "হিন্দু রসায়নী বিদ্যার ইতিহাসের" মধ্যে বলেছেন যে বৌদ্ধ-পরবর্ত্তী যুগে যখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করল তখন অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটল। যাজক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে মনু প্রভৃতি পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারেরা নূতন নূতন বিধিনিষেধের নাগপাশে সমগ্র সমাজকে বেঁধে ফেললেন। হতভাগ্য হিন্দু জাতির ক্ষুরধার বুদ্ধি ও অপরিমিত মনীষা বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত হয়ে কুসংস্কারের গোলকধাঁধায় অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করল। কেউ কেউ উগ্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বশতঃ বলেন যে মুসলমান আধিপত্যই প্রাচীন হিন্দু-সংস্কৃতির অবনতির কারণ। এর উত্তরে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর "নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি" নামক গ্রন্থে বলেছেন :[৫] "মুসলমানদিগের আর্য্যাবর্ত্ত জয়ের অনেক পূর্ব্ব

৫ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় : "নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি" (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত)।

হইতেই হিন্দুদিগের এই অনুসন্ধিৎসা বৃত্তির হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। আর তাহাই যদি হইত, (অর্থাৎ মুসলমানদের জন্যেই যদি হিন্দুসংস্কৃতি সঙ্কটাপন্ন হ'ত—বি) তবে পূর্ব্বোক্ত সমুদয় বিদ্যার আলোচনা (প্রাচীন হিন্দুদের আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, গণিত-রসায়ন ইত্যাদি—বি) দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় গ্রহণ করিত। কারণ তথায় মুসলমান আধিপত্য কখনও স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মুসলমানদিগের শাসনকালে বাঙ্গলাদেশে, বিশেষতঃ নবদ্বীপ ও বিক্রমপুরে হিন্দুশাস্ত্রের যথেষ্ট চর্চ্চা ছিল। এই উভয় স্থানই নবাবের রাজধানার সন্নিকট ছিল। স্থূলভাবে বলিতে গেলে, উপনিষদ রচনাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রৌঢ়াবস্থা পর্য্যন্ত সময় মধ্যে হিন্দুর মস্তিষ্কচালনা বা মানসিক চিন্তার দ্বারা যাহা কিছু গৌরব করিবার বিষয় তাহা সাধিত হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ এই সময়কে অর্থাৎ খৃষ্টজন্মের ৬০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ৭০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, ভারতের জ্ঞানোন্নতি ও স্বাধীন চিন্তার যুগ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।"

প্রাচীন ইসলামী সভ্যতা যেমন বর্ব্বর মোঙ্গোলদের আক্রমণে অবলুপ্ত হয়নি, প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতাও তেমনি মুসলমানদের আক্রমণে বিলুপ্ত হয়নি। তার চাইতেও বৃহত্তর ও গভীরতর কারণে দুই সভ্যতাই অন্তঃসারশূন্য হয়েছে, দুর্ব্বল হয়েছে, এবং তারপর প্রচণ্ড শক্তির আঘাতে ভেঙে পড়েছে। সেই কারণটি হ'ল অর্থনৈতিক কারণ, সামাজিক কারণ। দাস-প্রভুর সমাজ-ব্যবস্থা ধীরে ধীরে দু'টি বিরাট সভ্যতার জীবনীশক্তি শুষে নিয়েছে। প্রথম যুগের রাজন্য ও খলিফাদের গঠনের উদ্যম-উদ্যোগ, প্রতাপ প্রতিপত্তি ও উদারতার যখন অবসান হয়েছে, ধীরে ধীরে যখন আমলা-অমাত্য, মোল্লা-পুরোহিতদের প্রভাব বেড়েছে, তখন থেকেই দাসত্ব ও শ্রেণী-বৈষম্যের পূর্ণ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে।

হিন্দু ও ইসলামী সংস্কৃতির অবনতিরও সূচনা হয়েছে সেই সময় থেকে। সাধারণ ব্যাপক দৃষ্টি দিয়ে মানবসভ্যতার বিচার করলে দেখা যায়, প্রাচীন সিন্ধু-সুমের-মিসরীয় সভ্যতা, প্রাচীন গ্রীক-রোমক সভ্যতা, প্রাচীন হিন্দু ও ইসলামী সভ্যতার অধঃপতন হয়েছে একই কারণে। দাস-প্রভুর শ্রেণী-বিভক্ত সমাজব্যবস্থাই সেই কারণ।

সোভিয়েট মধ্য এশিয়ায় ইসলামীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ও রূপান্তর

সুশ্রুতের মতে শল্যশাস্ত্রের (Surgery) শিক্ষার্থীর পক্ষে শব-ব্যবচ্ছেদ অবশ্যকর্ত্তব্য ব'লে নির্দ্ধারিত হ'লেও মনু ব্যবস্থা করলেন যে শব স্পর্শ করলেই ব্রাহ্মণ অশুচি হবেন। বাগ্‌ভটের অল্পকাল পরেই শল্যশাস্ত্র ও শারীরস্থান (Anatomy) ক্রমশ নিন্দনীয় ব'লে গণ্য হতে আরম্ভ করে এবং শেষ পর্য্যন্ত দুটি বিজ্ঞানই হিন্দুদের পক্ষে লুপ্ত বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায়। হারূন অল্-রশীদ হিপোক্রেতিস্ ও গ্যালেন অনুবাদ করার আদেশ দেন। হিন্দুদের 'চরক' আরবীতে অনূদিত হয়। রাজী, ইবন্ অল্-খতিব, আবু মন্‌সুর চিকিৎসাশাস্ত্র ও ঔষধিবিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। কিন্তু ইসলামীয় সংস্কৃতির গৌরবময় যুগ অস্ত গেল। মোল্লা-মৌলবীরা শব-ব্যবচ্ছেদ, শব স্পর্শ প্রভৃতি নিন্দনীয়, নিষিদ্ধ, এমন কি দণ্ডনীয় ব'লে ঘোষণা করলেন। মধ্য এশিয়ায় আরবীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য লুপ্ত হয়ে গেল। দুর্দ্ধর্ষ মোঙ্গোল-তাতারদের অধীনে আবার এল অন্ধকার যুগ। তারপর বোখারা-খিবা-কোকন্দের আমীরখাঁদের অধীনে সেই অন্ধকার যুগ আরও গাঢ়তর হ'ল। বিজ্ঞান-চর্চ্চা তো দূরের কথা, লেখাপড়া করা, ধর্ম্মশাস্ত্র নিয়ে তর্ক বা আলোচনা করা পর্য্যন্ত নিষেধ 'কোরআন-শরীফে'—মধ্য এশিয়ার মোল্লারা বললেন। রোগব্যাধি,

জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন, গণিতবিজ্ঞান, সবকিছুরই সর্ব্বময় কর্তা হলেন মোল্লারা। মোল্লারাই রসায়নবিদ, মোল্লারাই গণিতবিজ্ঞানী, ক্ষমতা সম্বন্ধে সবজান্তা আল্লার 'রসুল'। মোল্লাদের অসাধারণ ক্ষমতা সম্বন্ধে কারও প্রশ্ন করার অধিকার নেই, তাহ'লে আমীরের আদেশে 'শূলে' চড়তে হবে, অথবা অন্ধকূপে বন্দী হয়ে মরতে হবে। বোখারা সমরকন্দে আমীর-মোল্লার রাজত্বকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা এইভাবে অবলুপ্ত হয়েছে। বোখারার মাদ্রাসা মোল্লাদের তীর্থস্থান হয়েছে ঠিকই, কিন্তু প্রাচীন ইসলামীয় সংস্কৃতির বিরাট ঐতিহ্য বহন ক'রে অগ্রসর হতে পারেনি বোখারা। মধ্য এশিয়ায় আমীর-খাঁ, মোল্লা-মৌলবীদের আধিপত্যের যুগ আর নেই। দাস-প্রভু, ধনী-নির্ধনের ব্যবধানও নেই সমাজে। আজ আর লেখাপড়া শিক্ষা মধ্য এশিয়ার মুসলমানদের কাছে নিষিদ্ধ নয়। আজ সেখানকার শতকরা প্রায় ৮০ জন মুসলমান নারী-পুরুষ লেখাপড়া জানে, তারা 'কোরআনের' অর্থ নিজেরাই বোঝে, কোন্‌টা গ্রাহ্য, কোন্‌টা অগ্রাহ্য, কোন্‌টা 'হালাল', কোন্‌টা 'হারাম', তা আর অর্দ্ধ-শিক্ষিত মোল্লাদের ব্যাখ্যা ক'রে দিতে হয় না। আজ তাই প্রাচীন বোখারার পাশে 'নবীন বোখারা', প্রাচীন সমরকন্দের পাশে 'নবীন সমরকন্দ', এশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশ্ববিদ্যালয়রূপে গ'ড়ে উঠেছে। প্রাচীন ইসলামীয় সংস্কৃতি তার লুপ্ত ঐশ্বর্য্য ও গৌরব নিয়ে পুনরুজ্জীবিত হ'চ্ছে, রূপান্তরিত হ'চ্ছে নূতন বোখারা-সমরকন্দে, নূতন তাস্কেন্দ স্টালিনাবাদে।

বিপ্লবের পর সোভিয়েট জাতিবিদ্ (Ethnologist) ও ভাষাবিদ্‌দের (Philologist) সর্ব্বপ্রথম ডাক পড়ল মধ্যএশিয়ায়। যেদেশের অধিকাংশ জাতির লেখ্যভাষা নেই, সেদেশে জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ কি ক'রে সম্ভব? জনশিক্ষাও সম্ভব নয়। তাই জাতিবিদ্ ও ভাষাবিদ্‌রা প্রথমে মধ্য এশিয়ার ভাষা ও বর্ণমালার দিকে মনোনিবেশ করলেন।

তারপর মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন জাতির ইতিহাস প্রণয়ন করার তাগিদ এল। 'রাজমালা' বা 'আমীরনামা' নয়, প্রকৃত জনসাধারণের ইতিহাস (Peoples History) রচনা করা প্রয়োজন। তা না হ'লে মধ্য এশিয়ার ছেলেমেয়েরা দেশের ইতিহাস, নিজেদের জাতীয় ইতিহাস শিখবে কোথা থেকে? জাতিবিদ্, ভাষাবিদ্ ও প্রাচ্যবিদ্‌রা (Orientalists) সমবেত হয়ে এই দুরূহ সমস্যার সমাধান করলেন। তাজিক-উজ্‌বেক কাজাক-কিরগিজ-তুর্কীদের লুপ্তপ্রায় জাতীয় সাহিত্য ও শিল্পকলা, লোক-সাহিত্য, লোককথা, গাথা, লোককলা তাঁরা অসীম ধৈর্য্য ধ'রে সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলেন। তারপর সেই সব সংগৃহীত উপকরণ থেকে গবেষণা ক'রে মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন জাতির গণ-ইতিহাস রচনা করলেন। এই গবেষণার প্রধান কেন্দ্র ছিল প্রথমে মস্কো ও লেনিনগ্রাদে। শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ্, প্রত্নবিদ্, প্রাচ্যবিদ্, জাতিবিদ্, ঐতিহাসিক ও কলাবিদ্‌রা মস্কো ও লেনিনগ্রাদে মধ্যএশিয়ার জাতীয় ইতিহাস রচনার জন্যে গবেষণায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই জনশিক্ষার প্রসার এবং নূতন স্বাধীন জীবনের প্রভাবের ফলে তাজিক-উজ্‌বেক-কিরগিজ-কাজাক-তুর্কীদের মধ্যে যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তি জাগল, জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে চেতনা ও জ্ঞানের বিকাশ হ'ল এবং গবেষক ও বিশেষজ্ঞেরও অভাব হ'ল না। জাতীয় ভাষা ও ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণার কেন্দ্র মধ্য এশিয়াতেই স্থানান্তরিত হ'ল। তাস্কেন্দের বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৮) এই প্রসঙ্গে সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। উজ্‌বেকিস্তানে "সেন্‌ট্রাল এশিয়ান্ জিওগ্রাফিক্ সোসাইটি", সমরকন্দে "উজ্‌বেক রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্" প্রতিষ্ঠিত হ'ল, শুধু ভৌগোলিক বিষয় নিয়ে চর্চ্চা করার জন্যে নয়, প্রত্নবিদ্যা, ভাষা, জাতিবিদ্যা, ইতিহাস প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা করার জন্যে। তুর্কমেনিয়ায় 'ইন্‌স্টিটিউট্ অফ্ তুর্কমেন্ কাল্‌চার',

তাজিকিস্তানে 'সোসাইটি ফর্ দি স্টাডি অফ্ তাজিকিস্তান,' "স্টালিনাবাদ টিচার্স ইন্‌স্টিটিউট্" প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠল মধ্য এশিয়ার জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় ইতিহাস ও জাতীয় ভাষা সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্যে। এ-ছাড়াও গবেষণার সুবিধার জন্যে সর্ব্বত্র জাতীয় সংস্কৃতির 'মিউজিয়ম্' গ'ড়ে উঠল।

এই প্রসঙ্গে তাস্কেন্দের "আলি শের রাষ্ট্রীয় পাঠাগারের" কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। আমাদের দেশের 'কালিদাসের' মতো 'আলি শের' উজ্‌বেকদের সেকালের (পঞ্চদশ শতাব্দীর) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়তম জাতীয় কবি। এঁরই নামে তাস্কেন্দে আজ শুধু সোভিয়েট প্রাচ্যের বৃহত্তম পাঠাগার নয়, বোধ হয় এশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যামন্দির গ'ড়ে উঠেছে। "আলি শের্ পাঠাগারে" এখন প্রায় ১৪০টি ভাষায় ১,৫০০,০০০ গ্রন্থ আছে। মধ্য এশিয়া ও তার পার্শ্ববর্ত্তী দেশগুলি সম্বন্ধে গ্রন্থের সংখ্যাই বেশী। পাঠাগারের "তুর্কীস্তান বিভাগে" প্রায় ৬০০ দুষ্প্রাপ্য তুর্কী গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়েছে। ৭০,০০০ আরবী, পারসী ও তুর্কী পাণ্ডুলিপি আছে যা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এই পাঠাগার থেকে উজ্‌বেকিস্তানের জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে, মধ্য এশিয়া সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান গবেষণা করা হয়েছে; উজ্‌বেক ভাষায় অনেক দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি অনুবাদ করা হয়েছে এবং তিনখণ্ডে পাণ্ডুলিপির ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। এ-ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থাবলীর পৃথক ক্যাটালগ কয়েকখণ্ডে প্রকাশ করা হয়েছে পাঠক ও গবেষকদের সুবিধার জন্যে। এশিয়ার ইতিহাস, এশিয়ার বিভিন্ন জাতির ইতিহাস, ইসলামীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করতে হ'লে সমগ্র এশিয়ার বিদ্যোৎসাহীদের, মুসলমান পণ্ডিতদের অদূর ভবিষ্যতে যে একদিন তাস্কেন্দের 'আলি শের পাঠাগারের" সাহায্য নিতে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

জাতিবিদ্যা, ভাষাবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, প্রত্নবিদ্যা, প্রাচ্যবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মধ্য এশিয়ার বৈজ্ঞানিক প্রগতি সীমাবদ্ধ থাকেনি। বৃহত্তর জীবনে ও সমাজে মধ্য এশিয়ার দ্রুত বৈজ্ঞানিক প্রগতি বাস্তবিকই কল্পনা করা যায় না। শিল্পায়ন ও যান্ত্রিক সমবায় কৃষিপ্রথা প্রবর্ত্তনের সময় ভূবিজ্ঞানী-দের আহ্বান করা হ'ল মধ্যএশিয়ার মরুপ্রান্তরের গর্ভে, গিরিশ্রেণীব গুহা-কন্দরে, শিলাগাত্রে কতরকমের খনিজ, মণিরত্ন আছে, উদ্ভিদ্ আছে, অনুসন্ধান করার জন্যে। সমরকন্দে, তাস্কেন্দে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠল। নবীন উজবেক তাজিক তুর্কী বিজ্ঞানীরা এই কাজে অসীম আগ্রহে অগ্রসর হলেন। মধ্যএশিয়াব বিপাবলিকগুলিতে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রসারেব ফলে যখন নূতন বিজ্ঞানীর অভাব দুব হয়ে গেল, তাজিক-উজবেক-কাজাক-কিবগিজ তুর্কীদের মধ্যে যখন প্রতিভাবান বিজ্ঞানীব সংখ্যা বেড়ে গেল, তখন সোভিযট ইউনিযনেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান "একাডেমী অফ সায়েন্সের" শাখাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হ'ল উজ্‌বেকিস্থান, তুর্কমেনিস্তান ও তাজিকিস্তানে।

উজ্‌বেকিস্তানের বিজ্ঞানমন্দির সোভিযেট মধ্যএশিয়াব বৃহত্তম বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান। তাস্কেন্দে অবস্থিত এই বিজ্ঞানমন্দিরের অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক বিভাগ আছে—যেমন ভূবিজ্ঞান বিভাগ, উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, রসায়ন, শক্তি-বিজ্ঞান (Energetics—কয়লা, জল প্রভৃতি থেকে বৈদ্যুতিকশক্তি সঞ্চার সম্বন্ধে গবেষণা-বিভাগ), প্রাণীবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতবিজ্ঞান বিভাগ, টেক্‌নিকাল ও অর্থনৈতিক গবেষণা বিভাগ, মানমন্দির, ল্যাবোরেটরী ও ভূকম্পন নির্ণয় কেন্দ্র, ভাষা সাহিত্য ও ইতিহাস বিভাগ, নিজস্ব গ্রন্থাগার, ছাপাখানা ও পুস্তক-প্রকাশ বিভাগ। উজ্‌বেকিস্তানের অর্থনৈতিক,

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতির জন্যে হাজার হাজার বিজ্ঞানীরা এখানে গবেষণা করেন। তাঁদের মধ্যে উজ্‌বেক বিজ্ঞানীদের দান অতুলনীয়। কৃষির উন্নতি, শিল্পোৎপাদনের উন্নতি এবং বিদ্যুতিক শক্তির প্রসারের জন্যে তাঁরা যুদ্ধের মধ্যেও নানা বিষয়ে অনেক মূল্যবান গবেষণা করেছেন। শুধু উজ্‌বেকিস্তান নয়, সমগ্র সোভিয়েট দেশ এই গবেষণার জন্যে উপকৃত হয়েছে। উজবেক বিজ্ঞানীরা লোহা, রাং ও সোনার অনেক নূতন খনি আবিষ্কার করেছেন এবং ভেষজ বিজ্ঞানীরা অনেক নূতন উদ্ভিদের সন্ধান পেয়েছেন। ১৯৪২-৪৩ সালে উজ্‌বেক বিজ্ঞানী সৈয়দ হোজা, ফজিল ও মহম্মদ্ জল থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারের পদ্ধতি সম্বন্ধে যে সব মূল্যবান গবেষণা ও পরীক্ষা করেছেন তার ফলে উজ্‌বেকিস্তানের ও অন্যান্য রিপাবলিকের বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়াও এই যুদ্ধের মধ্যে ১৯৪১ সালে উজ্‌বেক ভাষাবিদ্‌রা কয়েকজন মিলে উজ্‌বেক ভাষার একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ প্রণয়ন ক'রে উজ্‌বেক সাহিত্যের দীর্ঘদিনের অভাব পূরণ করেছেন। যুদ্ধের মধ্যে উজ্‌বেক ভাষা সম্বন্ধে তরুণ ভাষাবিদ্ করিম, আরাকুজা, ইয়াকুব ও ইনগামের দানও উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উজ্‌বেকিস্তানের শাখা বিজ্ঞান-মন্দিরের মূল্যবান অবদানের পু র স্বরূপ আজ এই প্রতিষ্ঠানকে একটি "স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বিজ্ঞানমন্দিরের" মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে।

আস্‌খাবাদে তুর্কমেনিস্তানের শাখা বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠিত। এই শাখা প্রতিষ্ঠানের তিনটি প্রধান বিভাগ আছে, উদ্ভিদ্ ও কৃষিবিজ্ঞান বিভাগ, ভূতত্ত্ববিভাগ, ভাষা, ইতিহাস ও সাহিত্য বিভাগ। এই তিনটি বিভাগ ছাড়াও দুটি বৃহৎ 'মিউজিয়ম' আছে এই শাখাপ্রতিষ্ঠানের অধীনে—একটি হ'ল লোকগাথা ও লোককলার [illegible]য় মিউজিয়ম্, আর

একটি হ'ল 'বিপ্লবের মিউজিয়ম' (Museum of Revolution), অর্থাৎ বিপ্লবের ও তুর্কমেনিয়ার জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কিত তথ্যাবলীর মিউজিয়ম। এই বিজ্ঞানমন্দিরের সংলগ্ন একটি রসায়ন, প্রাণীবিজ্ঞান ও কৃষিবিজ্ঞানের গবেষণাগার আছে, একটি বোটানিকাল্ গার্ডেন্ আছে, একটি পশুপালন কেন্দ্র আছে। কারাকুম মরুভূমির বিখ্যাত রেপতেক্ মরু স্টেশন্ এবং ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত তাসা-উলার মৎস্যবিদ্যাকেন্দ্রও (Ichthyological) এই শাখা বিজ্ঞানমন্দিরের অধীন। এইসব নানা বিভাগ ও শাখাকেন্দ্রের গবেগণা ও কাজকর্ম্ম আস্খাবাদের বিজ্ঞানমন্দির থেকে সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই যুদ্ধের মধ্যেও তুর্কী বিজ্ঞানীদের দান অন্যদের তুলনায় অল্প নয়। নানাবিধ ভেষজ ও খনিজ আবিষ্কার ক'রে, প্রতিষেধক ব্যাধি সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে তাঁরা বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছেন যুদ্ধের মধ্যে। ভাষাবিজ্ঞানে তুর্কী বিজ্ঞানীদের দান বোধ হয় সব চাইতে উল্লেখযোগ্য। তুর্কী ভাষার কয়েকখানি ব্যাকরণ ও অভিধান তাঁরা এই যুদ্ধের মধ্যেই রচনা করেছেন। ১৯৪৩-৪৪ সালে 'একাডেমী' থেকে তুর্কমেনিয়ার ইতিহাস প্রণয়নের বিরাট পরিকল্পনা করা হয়েছে। দুই খণ্ডে এই ইতিহাস (Outline of the History of the Turkmenians and Turkmenia) সমাপ্ত হবে।

তাজিকিস্তানের শাখা-বিজ্ঞানমন্দির স্টালিনাবাদে প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য শাখার মতো এই বিজ্ঞানমন্দিরেরও নানা বিভাগ আছে। তাজিকিস্তানে কয়লা ও পীটের কয়েকটি নূতন খনি, তৈল-কেন্দ্র, রাংটংস্টেন্ ও মলিবডেনামের সন্ধান ভূবিজ্ঞান-বিভাগের গবেষণার ফলে সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে। উদ্ভিদ্বিজ্ঞানীরা নানারকম মূল্যবান উদ্ভিদের সন্ধান পেয়েছেন। তাজিক উদ্ভিদ্বিজ্ঞানীরা পামিরে পশুপালন ও

কৃষির উন্নতি সম্পর্কিত গবেষণায় সম্প্রতি বেশী মনোনিবেশ করেছেন। ১৯৪২-৪৩ সালে স্টালিনাবাদের প্রাণীবিজ্ঞান-বিভাগ থেকে পামিরে বিজ্ঞানীদের অভিযানের আয়োজন করা হয়। এই অভিযানের ফলে পামিরে পশুপালন প্রথার উন্নতিকল্পে গবেষণার সুবিধা হয়েছে। তাজিক পতঙ্গবিদ্‌রা নানারকম বিষাক্ত ও অপকারী কীটপতঙ্গ ধ্বংস করার জন্যে অনেক মূল্যবান গবেষণা করেছেন। সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাজিক বিজ্ঞানীদের দান উপেক্ষণীয় নয়। তাজিক ভাষার ব্যাকরণ, তাজিকদের জাতীয় ইতিহাস ইতিমধ্যেই অনেক রচিত হয়েছে। সম্প্রতি দুইখণ্ড তাজিক জাতির একখানি বৃহৎ ইতিহাস (History of the Tadjiks and Tadjikisthan) লেখার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের বিশেষত্ব এবং বৈজ্ঞানিক প্রগতির ধারা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যাবে, সোভিয়েট সমাজে বিজ্ঞানের লক্ষ্য কি এবং তার প্রসার ও প্রভাবই বা কতখানি। বৈজ্ঞানিক সংগঠনের মধ্যেই বিজ্ঞানের আদর্শ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। মানুষের সমগ্র জীবন ও সমাজকে ভিত্তি ক'রে বিজ্ঞানমন্দির, গবেষণাগার ও অসংখ্য বৈজ্ঞানিক বিভাগ গ'ড়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের বিস্তৃত ক্ষেত্রের মধ্যে মানুষের জীবনের নানাদিক, সমাজের বিভিন্ন দিকের সুন্দর বিকাশ হ'চ্ছে। জীবন ও সমাজের কোন নিভৃত কোণও বিজ্ঞান-বহির্ভূত নয়। ভাষা, সাহিত্য, লোকগাথা, লোককলা, ইতিহাস, প্রত্নবিদ্যা, প্রাচ্যবিদ্যা, জাতিবিদ্যা থেকে আরম্ভ ক'রে ভূবিদ্যা, রসায়নীবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা সবই "বিজ্ঞানের" অন্তর্ভুক্ত। শতসহস্র ধারায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা তাদের বিস্ময় অভিজ্ঞতা ও

গবেষণালব্ধ তত্ত্ব ও তথ্য-সম্ভার নিয়ে যেন এক বিশাল মানব-বিজ্ঞানের (Science of Humanity) মহাসমুদ্রে মিলিত হতে চলেছে। মানবসংস্কৃতির ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক ধারার এমন সুন্দর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আর কোন দেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

সাহিত্য ও লোককলা

মধ্য এশিয়ার যুগ-সঞ্চিত সাহিত্য-সম্ভার কোন দেশের তুলনায় কম সমৃদ্ধ নয়। তাজিকদের সাহিত্যিক ইতিহাস মহাকবি ফিরদৌসী, সাদী, হাফিজ, ওমর-খৈয়ম্ থেকে সুরু হয়েছে বললেও ভুল হয় না। উজবেকরা পঞ্চদশ শতাব্দীর মহাকবি আলি শের্-এর কাব্য আজও তাদের শ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্পদ ব'লে গর্ব্ব করে। আজও আলিশের্-এর লোকপ্রিয়তা এতটুকু ম্লান হয়নি। তুর্কীদের লোককথা ও লোকগাথার ঐশ্বর্য্যেই মুখ্‌তুম্-কুলি, জেলেলি প্রমুখ কবিরা সমৃদ্ধ হয়েছেন। কাজাক ও কিরগিজদের সাহিত্যের বিকাশ উপযুক্ত লেখ্য ভাষার অভাবে হয়নি। কিন্তু যে-সাহিত্যের জন্ম লেখ্য ভাষারও আগে, লোকগাথা, লোককথা, লোকনৃত্য প্রভৃতি, তার সম্পদ মধ্য এশিয়ার প্রত্যেক জাতির অফুরন্ত। ভাব ও অনুভূতি আজ তার যোগ্য বাহন পেয়েছে, ভাষা পেয়েছে, পরিদৃশ্যমান প্রতীক পেয়েছে জীবন্ত অক্ষরের মধ্যে। আজ মধ্যযুগের স্যাঁতসেঁতে রোমান্স ও আমীর খাঁদের আনন্দ-দায়ক কাব্য-রচনার পালা শেষ হয়েছে। কবিদের আর শাহ্‌বাদ্‌শাহ্-আমীরের সভায় বন্দী হয়ে থাকতে হয় না এবং 'শাহ্‌নামার' মধ্যে ভয়ে ভয়ে কলাকৌশলে পরাধীনতার জন্যে বিলাপও করতে হয় না। আজ মধ্যএশিয়ার সোভিয়েট সমাজে বাহির মুক্ত, অন্তরও মুক্ত, অন্তর-বাহির এক। জীবনের ছন্দান্বিত প্রগতির সঙ্গে তাই

সেখানে আজ কাব্যের স্ফূর্ত্তি, সাহিত্য ও শিল্পকলার বিকাশ। লোকসাহিত্য ও লোককলা পুনর্জ্জীবন লাভ ক'রে নূতন ছন্দে নূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করছে।

মধ্যএশিয়ার মাঠে মাঠে, মরু-প্রান্তরে, পাহাড়ের কোলে আজ তাজিক-উজবেক্-কাজাকরা গান গেয়ে উঠ্‌ছে। কলকারখানার ভোঁ, চলন্ত ট্র্যাক্টব ও ট্রেনের শব্দ, যন্ত্রের গর্জ্জন, বিমানের আকাশপথে গুঞ্জনধ্বনি, নগবের কলরব, সব মিলে নবজীবনের যে ঐকতান রচনা করেছে, এ-গান আজ সেই সুরে, সেই তানে রচনা করছে কবি। আজ [illegible] ছন্দে [illegible]লীলাক্রমে নৃত্য করছে মরুপ্রান্তরবাসীরা। পুবাতন দিনেব সেই আত্মবিলাপ, সেই প্রাণঘাতী অবসাদ ও ক্লান্তির গাথা আজ আব শুনতে পাওয়া যায় না। অন্ধ তুর্কী কবি আজ গান গেয়ে উঠ্‌ছে :

"আমি যা দেখি আব শুনি তাব গান গাই
(আজ) অন্ধ চোখে নয়া-দুনিযা দেখতে পাই।"

আজ তাজিক কবি সুখালি গাইছে :

"তুমি দেখবে, নতুন বধূব মতো সুন্দর নগর
শুন্‌বে বধূব গান।
তবে শোন! ঐ
প্রপেলারের গুন্‌গুন্
মোটবের মৃদু গর্জ্জন,
ধূলি-ধোয়াব মেঘ ছিন্ন ক'বে
লৌহপথে চলন্ত ট্রেনের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি।"

বোখাবার বিখ্যাত কবি আইন্-ইর ভাই সিবাজ্‌উদ্দীনের মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল ১৯১৮ সালে বিপ্লবী কাফেরদের দলভুক্ত হবার অপরাধে।

বিক্ষুব্ধ আইন্-ইর মন সেদিন 'আল্লার সুবিচারের' বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করেছিল। আল্লার কাছে কাতর আবেদন ক'রে কবি সেদিন বলেছিলেন :

"হে আল্লা! চূর্ণ করো রাজপ্রাসাদ,
আমীর খাঁর উদ্ধত তাজ।
হে আল্লা! নতজানু করো গোলামের পায়ে
বুজ্‌দিল্ ঐ দুশ্‌মন সব খাঁদের॥"

বুজ্‌দিল্ ঐ দুশ্‌মন্ সব খাঁরা আজ বিল্‌কুল্ সাফ্ হয়ে গিয়েছেন। রাজপ্রাসাদ ভেঙে পড়েছে আমীরের উদ্ধত তাজের উপর। আজও কবি আইন্-ই বেঁচে আছেন। আইন্-ই শুধু কবি নন, তিনি একজন পণ্ডিত এবং ঔপন্যাসিকও। বোখারার অধিবাসী ব'লে এবং 'বোখারা আগে তাজিক-উজ্‌বেক উভয়েরই ছিল ব'লে, আইন্-ই আজ তাজিক-উজ্‌বেক সকলেরই প্রিয় সাহিত্যিক। আইন্-ই তাজিক ভাষায় লেখেন। মধ্যএশিয়ায় গদ্য-সাহিত্য ও উপন্যাসের প্রবর্ত্তক বললে তাঁকে ভুল হয় না। 'কাব্য-ই' ছিল এতদিন মধ্যএশিয়ার সাহিত্য-সম্পদ। মধ্যযুগের আমিরী জীবনের বিলাসের কোলে, স্বাভাবিক ও সরল জীবনের নিভৃত নিকুঞ্জে বোখারার সভাকবিরা 'গুলাব-বুল্‌বুল্ পিয়ালা-সাকীর' গুলবাহার রোমান্টিক কাব্য রচনা করেছেন এতদিন। মধ্যএশিয়ার গণতান্ত্রিক মুক্তি-আন্দোলনের মধ্যে জীবনের প্রসার ও পরিধি যখন বেড়ে গেল, নানা আবেগ আকাঙ্ক্ষা-বাসনা-কামনা-আদর্শের ঘাত-প্রতিঘাতে বর্দ্ধিষ্ণু সমাজতন্ত্রের পুনর্গঠনের যুগে জীবনের নানা রকম জটিলতা ও সমস্যা যখন দেখা দিল, তখন জন্ম হ'ল গদ্য সাহিত্যের ও উপন্যাসের। আইন্-ই এই গদ্য সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা। গুল্‌বাহার কাব্য-রচনা ছেড়ে আইন্-ই নূতন জীবনের

কাব্য রচনা করলেন, নূতন সমাজের নানা সমস্যা নিয়ে উপন্যাস রচনা করলেন এবং ইতিহাস ও সমালোচনা-সাহিত্য লিখে জাতীয় সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করলেন। প্রবীণ আইন্-ইর সঙ্গে তরুণ তাজিক কবিও গেয়ে উঠ্‌লেন :

"জয়ধ্বনি শুন্‌তে কি পাও ?
তাজিকিস্তান্ ?
উৎসব সুরু আজ থেকে তোর
তাজিকিস্তান্!...
ওরে উদ্দাম, ওরে পাহাড়ী
তরুণ তাজিকিস্তান্।"

তাজিক লেখকদের মধ্যে হাশেম, হাজিজি, রেবাই যথেষ্ট লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছেন, আর সাদরুদ্দীন আইন্-ই তো তাজিকদের 'তাজ'। তুর্কমেনিস্তানের গল্পলেখক ও নাট্যকার কার্ব্বাদ্, কবি আমান্, নোশের আলি, জান্ মুতাখ্, সৈয়দ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। উজ্‌বেকিস্তানের কবি ও শিল্পী গফুর গোলাম, হামিদ আলিমজান্, আইবেক্ ও সেখ্ জাদীর লোকপ্রিয়তা আজ মধ্য এশিয়ার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। আমীরের রাজত্বকালে গফুর গোলাম শৈশবে সংবাদপত্র বিক্রী করেছেন, মুচির কাছে জুতো সেলাই শিখেছেন, তামাকের কারখানায় কাজ করেছেন, আফিমের আড্ডায় নোক্‌রিও করেছেন। বিপ্লবের পর সোভিয়েট আমলে গফুর গোলাম লেখাপড়া শিখেছেন, স্কুলের শিক্ষক হয়েছেন, সাংবাদিকতা করেছেন এবং আজ তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয়েছে কাব্যের মধ্যে। সেকালের গফুর গোলাম তাই একালের শ্রেষ্ঠ কবি। উজ্‌বেক কাব্যের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যের ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে গফুর গোলাম এ-যুগের কাব্যে নূতন ভাব ও নূতন রূপ দান করেছেন।

শুধু উজবেকিস্তানের নয়, সমগ্র মধ্য এশিয়ার তরুণ কবিদের পথপ্রদর্শক গফুর গোলাম। তাস্কেন্দের পুরানো সহরে গফুর গোলাম আজও থাকেন। তাস্কেন্দের লক্ষ লক্ষ লোক গফুরকে পরমাত্মীয়ের মতো ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। কবির সম্মান, শিল্পীর মর্য্যাদা দিতে উজ্‌বেকরা জানে। গফুরের গৃহের ঠিকানা জানে না কেউ, জানার দরকার নেই কারও, কারণ গফুরের গৃহ উজ্‌বেকদের তীর্থস্থানের মতো। তাস্কেন্দের পুরানো সহরে যেকোন পথচারীকে বললেই সে আদর ক'রে গফুরের গৃহে দর্শনপ্রার্থীকে নিয়ে যাবে। সকলেই জানে গফুর বৃদ্ধ, তবু কি অশান্ত, কি দুর্দ্দান্ত গফুরের আবেগ, পাহাড়ী ঝর্ণার মতো। কি গভীর গফুরের অনুভূতি! কি সুন্দর তার প্রকাশ-ভঙ্গী, তার ঋজুতা, তার বলিষ্ঠতা, তার সুষমা। দাসীবাঁদী, বেগম, হারেম, বোর্‌কা—এসব বৃদ্ধ গফুর ঘৃণা করে।

"তুমি মাতা, শাশ্বত মানবতার,
(এ) মর্ত্ত্য-জীবনের তুমি অনন্ত অঙ্গীকার।"

এই হ'ল গফুরের 'আদর্শ নারী', সোভিয়েট মধ্য এশিয়ারও।

মধ্য এশিয়ার প্রবীণ-নবীন শিল্পী-কবিরা এইভাবে আজ নূতন জীবনের, মুক্তির ও সাম্যের বন্দনা গাইছেন তাঁদের শিল্পে-কাব্যে। আজ তাঁদের শিল্পে ও কাব্যে জড়তা নেই, অবসাদ নেই, ভাগ্যহতের বিলাপ নেই। ব্যেষ্টি ও সমষ্টির মুক্তির আনন্দে আজ তাঁদের শিল্প-সাহিত্য অনুরণিত, নূতন জীবনের জোয়ারের কলরবে ও জটিলতায় মুখরিত। সমাজ-গঠনের কোদালি-হাতুড়ির তালে নর্ত্তকীরা নৃত্য করছে, কবির কাব্য ঝঙ্কৃত হয়ে উঠছে। খাল-কাটা, নগর-গড়া, কারখানা-গড়ার কাজে যন্ত্রবিদ্ ও শ্রমিকদের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রী, নর্ত্তকী ও অভিনেতারাও সহযোগিতা করছেন। বিরাট নির্ম্মাণযজ্ঞে, সৃষ্টির মহোৎসবে সকলের মহামিলন একান্ত প্রয়োজন।

নিভৃত মিনার থেকে কবি ও শিল্পীরা আজ তাই মাটিতে নেমে এসে মাটির মানুষের জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করেছেন।

সেই জীবনের যখন চরম সঙ্কট ঘনিয়ে এল এই মহাযুদ্ধে, ফ্যাশিষ্টদের দানবীয় ধ্বংসলীলায় যখন বিশ্বমানবের জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হয়ে উঠল, তখন তাজিক-উজবেক-কাজাক-কিরগিজ কবি ও শিল্পীরা চুপ ক'রে থাকেন নি। চিত্রে, কাব্যে, নাটকে, সঙ্গীতে তাঁরা সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, নির্য্যাতিত ও আত্মীয়-স্বজনহীনদের সান্ত্বনা দিয়েছেন, বীর সেনাদের প্রেরণা দিয়েছেন অফুরন্ত। শুধু কবি-শিল্পীরা নন, মোল্লা-মৌলবীরাও এগিয়ে এসেছিলেন সোভিয়েট ভূমির জীবন-মরণ সংগ্রামে। মোল্লা-মৌলবীরা আজও আছেন মধ্য এশিয়ায়, কিন্তু তাঁরা সেকালের অর্দ্ধশিক্ষিত মোল্লাদের মতো ধর্ম্মান্ধ নন, বিবেকহীন মনুষ্যত্বহীন নন। তাঁরা আজ স্বচক্ষে দেখছেন, ইসলামের মানবতার আদর্শ, ইসলামের সাম্যের ও মৈত্রীর আদর্শ সোভিয়েট দেশের সমাজতন্ত্রের মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। তাই সোভিয়েট দেশের জীবন-মরণ সঙ্কটের দিনে তাঁরা বোখারা-সমরকন্দের মসজিদের মিনার থেকে কোরআন্ শরীফ হাতে ক'রে গম্ভীর সুরে আরবী ভাষায় আবৃত্তি করলেন :

"কোতেবা আলায়্ কুমোল্-কেতা-লো অহুঅ কোর্হোল্লাকোম্,
অ আছা—আন্ তাক্‌রাহু শায়্ আঁও্ অহুঅ খায়রোল্লাকুম্,
অ আছা—আন্ তোহেব্‌বু শায়্ আঁও্ অহুঅ শার্রোল্লাকুম্।"

(ছুরা—বাক্‌রাহ্, ১০ম রুকু-৭ম আয়ত)

"হে মুসলমানগণ! তোমাদের প্রতি জেহাদ (ধর্ম্মযুদ্ধ) ফর্‌জ্ (অবশ্য পালনীয়) করা হয়েছে। এ তোমাদের ভাল না-লাগা বিচিত্র নয়। কোন কিছু তোমাদের ভাল ব'লে বোধ না হ'তে পারে, অথচ তাই তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর, আবার যা তোমাদের

ভাল ব'লে বোধ হয় তা তোমাদের অকল্যাণকর হওয়াও বিচিত্র নয়।"

তাঁরা বললেন, 'কোরআন শরীফের' ধর্ম্মদ্রোহিতা ও ধর্ম্মযুদ্ধ সংক্রান্ত আয়ত ব্যাখ্যা ক'রে: "হে মুসলমানগণ! যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হয়, আল্লার নির্দ্দেশে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো! কিন্তু হুশিয়ার! সীমা লঙ্ঘন করোনা, আল্লা অন্যায় যুদ্ধ ভালবাসেন না। ন্যায়যুদ্ধে যেখানে শত্রুকে পাবে সেখানে তাকে সংহার করো, যেখান থেকে তোমাদের নির্ব্বাসিত করেছে সেখান থেকে তাদের নির্ব্বাসিত করো।"

মনে পড়ে বিপ্লবের আগের কথা, বিপ্লবের সময় ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধের কথা। আমীর-অমাত্যদের অত্যাচার ও বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে মধ্য এশিয়ার জনগণের ন্যায়বিদ্রোহ ও ন্যায়যুদ্ধকে সেকালের মোল্লা-মৌলবীরা অন্যায় যুদ্ধ বলেছেন এবং এই একই 'আয়ত' কোরআন্ থেকে ঘন ঘন আবৃত্তি ক'রে তাদের বিভ্রান্ত ও ধ্বংস করার চেষ্টা করেছেন। সেকালের মোল্লার ইসলাম-ধর্ম্মের এই ছিল রূপ। একালের মোল্লার 'ইসলাম-ধর্ম্ম' মানবধর্ম্মে রূপান্তরিত হয়েছে। সমাজতন্ত্রের মাটিতে 'ধর্ম্মেরও' বিকাশ হয় 'মানবতার' মধ্যে, 'ন্যায়' ও 'সাম্যের' মধ্যে এবং ধীরে ধীরে 'ধর্ম্ম' বিশ্বমানবতার সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

মোল্লাদের 'ধর্ম্মযুদ্ধের' আহ্বানের সঙ্গে কবিদের কণ্ঠও মিলিত হয়েছে। প্রায় ১০০ বছরের অতি বৃদ্ধ কাজাক কবি জাম্বুলের কণ্ঠে নবযুগের 'শোহরত' ধ্বনিত হয়ে উঠল—

"নিঃশ্বাসে তোমার আগুন ছড়াও, দোস্ত্!
শম্‌শের হানো দিল্‌ওয়ার;
নেস্ত-নাবুদ্ করো ফ্যাশিস্ত্ যত দুনিয়ার!"

বৃদ্ধ কাজাক কবি জাম্বুলের আহ্বান ব্যর্থ হয়নি।

আজও মনে পড়ে সেই সব প্রাচীন পথের কথা, এশিয়ার সেই সব ঐতিহাসিক পথের কথা—যে-পথে সভ্যতার শৈশবে আদিমানবেরা আনাগোনা করেছে; যে-পথে বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষুরা, ইউরোপের বণিকরা, আরবরা, দুর্দ্ধর্ষ মোঙ্গোলরা, চীনারা, কতবার এল-গেল; যে-পথের উপর কত সাম্রাজ্য, কত সহর, কত বাণিজ্য-কেন্দ্র, কত বৌদ্ধবিহার, কত মসজিদ, কত ক্যারাভান্‌সরাই, কত মুসাফিরখানা ভাঙল আর গড়ল, সেই পথের কথা মনে পড়ে আজও। উজবেক কবি ভোলে নি আজও সেই সব পথের কথা, বৃদ্ধ হিমালয় আজও স্বপ্ন দেখে—

"সেই সব পুরানো পথের উপর
কত শতাব্দীর পায়ের চিহ্ন আঁকা—
চীন থেকে ইরান
ভারতবর্ষ থেকে তুর্কীস্তান।
এই সব আঁকাবাঁকা পুরানো পথে
(আজ) এই পৃথিবীর নিযুত নিঃস্বের পদধ্বনি শুনি,
ইস্পাতের ক্যারাভানের মতে
শক্ত ও সংহত।
সেইসব পথের উপর দিয়ে মুক্তির ঝড় বইবে একদিন—"
(গফুর গোলাম)

ঝড় বইছে আজ। চীন থেকে ইরান, ইরান থেকে আফগানিস্তান, 'হিন্দুস্তান' পর্য্যন্ত আজ সেই মুক্তির ঝড় বইছে, সেই নিযুত নিঃস্ব মানবের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি, ইস্পাতের ক্যারাভানের মতো শক্ত ও সংহত মুক্তিকামী জনসেনার পদধ্বনি। ভীত ও সন্ত্রস্ত 'সাম্রাজ্যবাদের' চোখে মৃত্যুর কালো ছায়া নামছে।

উজবেক কবি বৃদ্ধ গফুর গোলামের স্বপ্ন সার্থক হ'চ্ছে, সার্থক হবে—'আগামীকালের এশিয়ার' স্বপ্ন—বৃদ্ধ 'হিমালয়ের স্বপ্ন'—

সমাপ্ত

গ্রন্থসূচী

[এই গ্রন্থসূচী যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত। এ ছাড়াও 'প্রাচীন মধ্যএশিয়া' ও 'মধ্যযুগের মধ্যএশিয়া' সম্বন্ধে আরও অনেক গ্রন্থ আছে। যে গ্রন্থগুলির সাহায্য বিশেষভাবে নিয়েছি শুধু সেইগুলি এখানে উল্লেখ করা হ'ল। 'আধুনিক মধ্য এশিয়া' অর্থাৎ 'সোভিয়েট মধ্য এশিয়া' সম্বন্ধে গ্রন্থের অভাব খুব বেশী। তাহলেও যে ক'খানি গ্রন্থ ইংরেজীতে আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে এবং আমাদের দেশে পাওয়া সম্ভব, তার প্রায় সব ক'খানিই সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি। অধিকাংশ গ্রন্থেই ১৯৩৯ সাল সাল পর্য্যন্ত ইতিহাস পাওয়া যায়। বিভিন্ন পত্রিকায় (সোভিয়েট, বৃটিশ ও মার্কিন) প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে মধ্য এশিয়ার যুদ্ধকালীন (১৯৩৯-৪৬) প্রগতির ইতিহাস সঙ্কলন করা হয়েছে—লেখক]

মধ্য এশিয়া (প্রাচীন যুগ)

বিগত শতাব্দীর শেষদিকে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মধ্য এশিয়ায় প্রাচীন সভ্যতার উৎস সন্ধানে অভিযান করেন। রুশ পণ্ডিতেরাই সর্ব্বপ্রথম এই কাজে অগ্রণী হন। তারপর বৃটিশ ও ফরাসী পণ্ডিতেরাও এই কাজে অগ্রসর হন। এই উদ্দেশ্যে ১৯০০ সালে ডাঃ অরেল স্টাইন্ (Dr. Aurel Stein) ভারত সরকারের সাহায্যে কাশ্মীর থেকে মধ্য এশিয়ায় তুর্কীস্তান অভিমুখে যাত্রা করেন। ডাঃ স্টাইন্ এই সময় কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পথঘাট সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। প্রায় এক বৎসর ধ'রে তিনি খোটান ও তার নিকটবর্ত্তী

নানাস্থানে অনুসন্ধান ক'রে প্রাচীনকালের বহু নিদর্শন সংগ্রহ করেন। দু'খানি বিরাট গ্রন্থে ডাঃ স্টাইন্ তাঁর অভিযানের ফলাফল প্রকাশ করেন —(১) Ancient Khotan, vols 1 & 2 (1907) (২) The Sand-buried ruins of Khotan. ১৯০৬ সালে ডাঃ স্টাইন্ আবার মধ্য এশিয়ায় যান এবং খোটান থেকে আরম্ভ ক'রে তাক্লামাকান্ মরুর ভিতর দিয়ে চীন দেশের পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত নানাস্থানে অনুসন্ধান চালান। এই সময় ফরাসী পণ্ডিত পল পেলিও (Paul Pelliot) মস্কো থেকে তাস্কেন্দের পথে কাশগর পৌঁছলেন এই অনুসন্ধান সুরু করার জন্যে। এই সব অনুসন্ধানের ফলে মধ্য এশিয়ায় শত শত বৌদ্ধ গুহামন্দির ও হাজার হাজার প্রাচীন পুঁথিপত্র—সংস্কৃত, চীনা, তিব্বতী, তুর্কী, সুগদীয়, কুচীয় প্রভৃতি ভাষায়—পাওয়া যায়; এই সব নিদর্শন থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালার উত্তর সীমান্ত থেকে চীন দেশের পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত সেকালে এক বিরাট সভ্যতা প্রসারলাভ করেছিল। এই সভ্যতার উপাদান ছিল ভারতীয়, পারসিক, তুখারীয়, তুর্কী, চীনা। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় ও সকল সভ্যতার সঙ্গমস্থল ছিল মধ্য এশিয়া।

প্রাচীন মধ্য এশিয়া সম্বন্ধে ডাঃ স্টাইনের গ্রন্থগুলি ছাড়া রমাপ্রসাদ চন্দের "The Indo-Aryan Races" (A Study of the Origin—of Indo-Aryan People and Institutions) নামক বিখ্যাত গ্রন্থেরও সাহায্য নিয়েছি। পূর্ব্বোক্ত দু'খানি গ্রন্থ ছাড়াও ডাঃ স্টাইনের এই রচনাগুলি পঠিতব্য :

A Third Journey of Exploration in Central Asia (1913-16)

Innermost Asia—its Geography as a factor in History

মধ্য এশিয়া
(মধ্যযুগ ও প্রাক্-বৈপ্লবিক যুগ—১৯১৬-১৭)

J. Hutton : Central Asia—From the Aryan to the Cossack

Capt. Valikhanof : The Russians in Central Asia

Capt. H. Stumm : The Russians in Central Asia

D. C. Boulger : Central Asian Portraits

G. Le Strange : The Lands of the Eastern Caliphate

A. Vambery : Sketches of Central Asia

W. Barthold : Turkestan down to the Mongol Invasion

উপর্যুক্ত গ্রন্থগুলির প্রায় প্রত্যেকটি প্রত্যক্ষদর্শীর ও পর্যটকের বিবরণ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে মধ্য এশিয়ার সামাজিক অবস্থার চমৎকার পরিচয় এই সব কাহিনী থেকে পাওয়া যায়। ভালিখানফ্ ও ষ্ট্রেঞ্জের গ্রন্থ দু'খানি এদিক দিয়ে বিশেষ মূল্যবান। হাটন্, বুলজর ও ষ্টাম্ মধ্য এশিয়ার আমীর, খাঁ ও বিভিন্ন আদিম জাতির বিখ্যাত দলপতিদের সম্বন্ধে অনেক চিত্তাকর্ষক কাহিনী বর্ণনা করেছেন। ভ্যাম্বেরীর গ্রন্থে মধ্য এশিয়ার আদিম জাতিদের সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। মিঃ বার্থোল্ডের গ্রন্থ প্রাচীন মধ্য এশিয়ার একখানি প্রামাণিক ইতিহাস।

A. Besant : England, India and Afganisthan

F. H. Fisher : Afganisthan & the Central Asian Question

Iqbal Ali Shah : Modern Afganisthan

Iqbal Ali Shah : The Tragedy of Amanullah

The Cambridge Shorter History of India

মধ্য এশিয়া ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও প্রাক্তন রুশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে কূটনৈতিক সঙ্ঘর্ষ, আফ্‌গানিস্তানের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের উত্থান-পতনের ইতিহাস মোটামুটি এই গ্রন্থগুলি অবলম্বনে রচিত।

Ralph Fox : Genghis Khan

র‍্যাল্‌ফ ফক্সের 'চেংগিস্ খাঁ' বিখ্যাত গ্রন্থ। মঙ্গোলিয়া, মোঙ্গল জাতি ও মধ্যযুগের মধ্য এশিয়ার অর্থনৈতিক সামাজিক ইতিহাস এই গ্রন্থের মধ্যে বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। শুধু চেংগিসের জীবনী ব'লে নয়, ইতিহাস হিসেবেও গ্রন্থখানি উল্লেখযোগ্য।

এই সব গ্রন্থ ছাড়াও মধ্যযুগের মধ্য এশিয়া সম্বন্ধে আরও অনেক গ্রন্থ আছে যা এখানে উল্লেখ করা হ'ল না। কারণ, প্রাক্-বৈপ্লবিক যুগ পর্য্যন্ত মধ্য এশিয়ার ইতিহাস, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তথ্যাদি প্রধানতঃ এই গ্রন্থগুলি থেকে সংগৃহীত।

মধ্যএশিয়া (সোভিয়েট যুগ)

R. A. Davies and A. J. Skeiger : Soviet Asia (1943)

মধ্য এশিয়া সম্বন্ধে একটিমাত্র অধ্যায় (ষষ্ঠ) এই গ্রন্থে আছে। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হ'লেও ভাল লেখা। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজকল্যাণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নেই।

E. S. Bates : Soviet Asia (1942)

মোটামুটি ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার শিল্প-বাণিজ্য

ও কৃষির উন্নতির কথা বলা হয়েছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজকল্যাণ সম্বন্ধে তথ্যের অভাব।

Joshua Kunitz : Dawn Over Samarkand (1936)

বিখ্যাত গ্রন্থ। বিপ্লবকালীন গৃহযুদ্ধ ও পুনর্গঠনের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মনে হয় যেন ইতিহাস নয়, উপন্যাস পড়ছি। অনেক আগে লেখা ব'লে সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির ইতিহাস বিশেষ কিছু নেই এই গ্রন্থে।

Egon Erwin Kisch : Changing Asia (1935)

কুনিৎসের 'ডন্ ওভার সমরকন্দের' ভঙ্গীতে লেখা। বিপ্লব ও পুনর্গঠনের প্রাথমিক যুগের চমৎকার ইতিহাস।

James S. Gregory : Land of the Soviets (1946)

সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার ভৌগোলিক রূপ এই গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নূতন নূতন নগর, কলকারখানা, জলসেচন ও যানবাহন-ব্যবস্থার ফলে এই ভৌগোলিক রূপের পরিবর্তন হ'চ্ছে কিভাবে তাও বলা হয়েছে। অন্যান্য তথ্যের অভাব।

J. F. Horrabin & J. S. Gregory : An Atlas of the U.S.S.R.

মিঃ গ্রেগরীর 'Land of the Soviets' গ্রন্থের সঙ্গে এই মানচিত্র মিলিয়ে পড়া উচিত।

Fannina Halle : Women in the Soviet East

মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন জাতির নানারকম সংস্কার, রীতিনীতি, সমাজে

নারীর স্থান, বিবাহ-প্রথা, পণ-প্রথা ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য এই গ্রন্থে লেখিকা সঙ্কলন করেছেন। সোভিয়েট সমাজে নারীর অধিকার ও মর্য্যাদা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার ইতিহাসও লেখিকা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

N. Mikhaylov : Soviet Geography (1937)

সোভিয়েট ইউনিয়নের ভৌগোলিক পরিচয়, প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদের কথা এই গ্রন্থে আছে। মধ্য এশিয়ারও উল্লেখ করা হয়েছে।

U.S.S.P.. Speaks for itself (1941)

চারখণ্ডে সমাপ্ত—(১) Industry, (২) Agriculture & Transport, (৩) Democracy in Practice, (৪) Culture & Leisure. সাধারণভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্বন্ধে লেখা, মধ্যে মধ্যে দু'একটি প্রবন্ধে মধ্য এশিয়ার কথা আছে। ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত তথ্য সম্বলিত।

Short History of the Communist Party of the Soviet Union (Bolsheviks) : Moscow 1943

শিল্প-বাণিজ্য, কৃষি, সমাজ-সংস্কৃতি, জাতিসাম্য প্রভৃতি সম্বন্ধে কমিউনিস্টদের নীতি কি, কিভাবে গৃহযুদ্ধ ও বিপ্লবোত্তরকালের সামাজিক অবস্থার বিভিন্ন পর্য্যায়ে সেই নীতির ক্রমবিকাশ হয়েছে, তার ধারাবাহিক ইতিহাস জানতে হ'লে এই গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য।

Joseph Stalin : Leninism

পুস্তিকা ও পত্রিকা

Ilya Tsaregradsky : Cultural Activities of Soviet Trade Unions (Moscow, 1945)

The 16 Soviet Republics : Published by 'Soviet News' (1945)

M. I. Bogolepov : The Soviet Financial System (1945)

M. I. Bogolepov : How the Soviet Citizen Pays his Taxes (1945)

Z. Mokhov : Social Insurance in the U.S.S.R. (1945)

N. Alexandrov : Labour Protection & Accident Prevention in the U.S.S.R. (1945)

V. A. Kaprinski : What are Collective Farms ? (1944)

N. N. Mikhailov : Soviet Land & People (1945)

G. M. Sverdlov : Legal rights of the Soviet family (1945)

Education in the U. S. S. R. (1945)

Alex Page : The A to Z of the Soviet Union (1945)

Law on the Five-year Plan for the Rehabilitation and Development of the National Economy of the U.S.S.R. (Adopted at the First Session of the Supreme Soviet of the U.S.S.R. on March 18, 1946)

D. G. Wolton : Asia Reborn (The Story of Soviet Uzbekistan) 1945

"মস্কো নিউজ" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও সংবাদ

২৭শে জুন, ১৯৪৫ :

"National Economy Takes Step Forward in Soviet Tadjikistan" (সঃ)

৪ঠা জুলাই, ১৯৪৫ :

Government Decorates Kirghiz Bard (সঃ)
Anniversary Exhibition in Uzbekistan (সঃ)

১৮ই জুলাই, ১৯৪৫ :

"Turkmenia launches big land reclamation project" (সঃ)

২৫শে জুলাই, ১৯৪৫ :

Irrigation Plan to Transform Hungry Steppe (প্রঃ) by Galina Vyzgo

২৮শে জুলাই, ১৯৪৫ :

Uzbek Library marks 75th Anniversary (সঃ)

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ :

"Big Sulphur Fertiliser Plant launched in Central Asia" by M. Kartsev (প্রঃ)

"Turkmenia develops its National Literatu by Berdy Kerbabayev (প্রঃ)

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ :

Irrigation extended in Uzbekistan (সঃ)

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ :

"Factory in the Desert" by M. Makarov (প্রঃ)

১১ই আগষ্ট, ১৯৪৫ :

Turkmenia Expands Textile Manu cture (সঃ)

১লা আগষ্ট, ১৯৪৫ :

Harness Solar Energy at Tashkent plant (সঃ)

"ইণ্টারন্যাশনাল লিটারেচার" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী :

১৯৪৩ (৩নং) :

B. Lavrenyov : Uzbekistan in War-time
Leo Varshavsky : The Defence Poster in Uzbekistan

১৯৪৩ (৮নং) :

Lydia Batova : "Something about the Writers of Uzbekistan"

১৯৪৫ (৬নং) :

Eugene Steinberg : "Literature in the Soviet Republics of Central Asia"—a Review

The Anglo-Soviet Journal vol. VI, No. 2 (Summer 1945)

"Three Science Centres of Soviet Central Asia" by Prof. E. Steinberg

Voks Bulletin, Nos. 4-5 (1944)—"The Economic Basis of Friendship among Nations"—by Mikhail Kudriavtsev

বিবিধ

(ক)

P. A. Wadia & K. T. Merchant : Our Economic Problem (Second Edition 1945)

ভারতীয় অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনা। তথ্য-সন্নিবেশ ও তথ্য-সঙ্কলন এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। দুঃখের বিষয়, এই গ্রন্থে শ্রমশিল্প-সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা (Industrial Research) ও যানবাহন-ব্যবস্থা (Transport) সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা হয়নি।

India (A Bird's Eye View): Published by the Royal Inst. of International Affairs (Sept, 1944)

ইতিহাস হিসেবে অপাঠ্য। গ্রন্থশেষের সংখ্যাসূচী (Statistical Tables) মূল্যবান।

Leonard M. Schiff : The Present Condition of India (1939)

D. N. Buchanan : The Development of Capitalist Enterprise in India

V. Anstey : The Economic Development of India

R. Palme Dutta : India today

K. S. Shelvankar : The Problem of India (1940)

P. S. Lokanathan : Industrial Organisation in India (1935)

P. S. Lokanathan : Industrialisation (Oxford Pamphlet on Indian Affairs 1943)

Radhakamal Mukherjee : Food Planning for Four Hundred Millions (1938)

Radhakamal Mukherjee : The Food Supply (Oxford Pamphlet—2nd Edition 1944)

W. Burns : Technological Possibilities of Agricultural Development in India (1944)

ভারতীয় কৃষি-ব্যবস্থার বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা। সংখ্যাসূচীগুলি অত্যন্ত মূল্যবান।

Kate Mitchell : Industrialisation of the Western Pacific

ভারতবর্ষ, বর্ম্মা, ইন্দোচীন, মালয়, ইন্দোনেসিয়া, ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দেশে শ্রমশিল্পের প্রসার সম্বন্ধে তথ্যবহুল ইতিহাস। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল সাম্রাজ্যবাদের শোষণনীতি ও সর্ব্বাঙ্গীন শিল্পায়ন পরস্পর-বিরোধী। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার কোন দেশেই তাই বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্পায়ন সম্ভব হয়নি। দৃষ্টিভঙ্গী ও তথ্য-সঙ্কলনের দিক দিয়ে গ্রন্থখানি অত্যন্ত মূল্যবান।

H. G. Callis : Foreign Capital in S. E. Asia

সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-নীতির প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে হ'লে এই গ্রন্থ অপরিহার্য্য ও অবশ্যপাঠ্য।

Jurgen Kuczynski : A Short History of the Labour Conditions in the British Empire—1800 to the Present day, (Second Enlarged Edition 1945)

তথ্য-সঙ্কলনে অদ্বিতীয় গ্রন্থ। বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের জনস্বাস্থ্য ও খাদ্যাভাব সম্পর্কে সরকারী রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার এই গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

Report of the Health Survey and Development Committee : Chairman, Sir Joseph Bhore (1945)

আমার এই গ্রন্থের মধ্যে 'ভোর্ কমিটির রিপোর্ট' ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতের জনস্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণকর ব্যবস্থার বর্ত্তমান অবস্থা বুঝতে হ'লে এই রিপোর্টই যথেষ্ট। এ-ছাড়া আরও দু'একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করা যেতে পারে:

N. Gangulee : Health and Nutrition in India (1939)

W. R. Aykroyd : Nutrition (Oxford Pamphlet —1944)

John B. Grant : The Health of India (Oxford Pamphlet—1943)

Lakshmi N. Menon : The Position of Women (Oxford Pamphlet—1944) .,

A. M. Lorenzo : Atlas of India (Oxford Pamphlet —1943)

ভারতের আদিম জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে নৃবিজ্ঞানীদের অনেক মূল্যবান গ্রন্থ আছে। এখানে যে ক'খানি গ্রন্থের সাহায্য আমি বিশেষভাবে নিয়েছি শুধু তাদেরই নাম উল্লেখ করলাম :

Verrier Elwin : The Aboriginals (Oxford Pamphlet—1943)

" " : The Baiga

" " : The Agaria

(খ)

Sir P. C. Ray : A History of Hindu Chemistry (vols I & II)

প্রাচীন ভারতে রসায়নবিদ্যার উন্নতি ও চর্চার ইতিহাস। আমার গ্রন্থে প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান সাধনা সম্বন্ধে আলোচনা এই গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। আচার্য্য রায়ের 'হিন্দু রসায়ন-বিদ্যার ইতিহাসের' দ্বিতীয় খণ্ডে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের প্রবন্ধ "Mechanical, Physical and Chemical theories of the Ancient Hindus", "Appendix" ও "Addenda" থেকে অনেক তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি।

Lewis Mumford : The Culture of Cities

নগর-সভ্যতা ও নগর পরিকল্পনার ইতিহাস এই গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। সোভিয়েট স্থাপত্য ও নগর-পরিকল্পনা সম্বন্ধে "Art in the U. S. S. R" (Edited by C. G. Holme) গ্রন্থের 'Architecture' by Prof. D. Arkin এবং "Soviet Communism" (Webbs) গ্রন্থের দশম অধ্যায়ের চতুর্থ বিভাগের আলোচনা পঠিতব্য।

J. G. Crowther : The Social Relations of Science

G. Sarton : Introduction to the History of Science vol I (1927)

বিজ্ঞানে ইসলামের অবদান সম্বন্ধে তথ্যাদি এই গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। পরিপূরক হিসাবে আচার্য্য রায়ের পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ এই সঙ্গে পঠিতব্য।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় : হিন্দু রসায়নী বিদ্যা (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়)

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় : নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ)

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় : মধ্যযুগে বাঙ্গলা (আশ্বিন ১৩৩০)

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় : বাঙ্গলার ইতিহাস—নবাবী আমল (১৩১৫)

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস (১৩৫২)

শ্রীঅসিতকুমার হালদার : ভারতের কারুশিল্প (১৯৩৯)

ভবানী সেন : ভাঙ্গনের মুখে বাংলা (১৯৪৫)

ভবানী সেন : মুক্তির পথে বাংলা (১৯৪৫)

(গ)

Lord Hailey : African Survey

Dr. Rita Hinden : Plan for Africa (1941)

বৃটিশ আফ্রিকা সম্বন্ধে লর্ড হেলীর বিবরণ অত্যন্ত মূল্যবান। ডাঃ রিতা হিণ্ডেনের গ্রন্থে সংক্ষেপে আফ্রিকায় বৃটিশ ঔপনিবেশিক নীতির ফলাফল বর্ণনা করা হয়েছে।

Leonard Barnes : Soviet Light on the Colonies (1944)

মিঃ বার্নস্ বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থের লেখক। বৃটিশ আফ্রিকা সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে যথেষ্ট। ১৯৩৮ সালে তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নে যান। উল্লিখিত গ্রন্থে লেখক সোভিয়েট মধ্য এশিয়া ও বৃটিশ আফ্রিকা সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা অত্যন্ত মূল্যবান, বোধ হয় আর কোন দ্বিতীয় গ্রন্থ নেই এ সম্বন্ধে।

Fabian Colonial Essays : Edited by Rita Hinden (1945)

এই গ্রন্থের মধ্যে হোরাবিনের "Geography and the British Empire," রিতা হিণ্ডেনের "The Challenge of African poverty", মার্গারেট রং-এর "Is literacy necessary in Afric " এবং গ্রীনিজের "Land Hunger in the Colonies" মূল্যবান তথ্যবহুল প্রবন্ধ।

দ্রষ্টব্য ঃ

গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে ('রূপান্তর') যে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর নাম টি, এক্স, লিউইস্ (T. X. Lewis)। অমৃতবাজার পত্রিকায় (৫ই মে, ১৯৪৬) প্রকাশিত "Lessons of Soviet Russia" প্রবন্ধে তিনি তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা

করেছেন। 'ভোভা ও জোন্স-এর' কথোপকথন মিঃ লিওনার্ড বার্নস্-এর পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

সংখ্যাসূচী (Statistics) : ভারতবর্ষ, বর্ম্মা ও বৃটিশ আফ্রিকা সম্বন্ধে নানা বিষয়ের সংখ্যাসূচী প্রধানতঃ নিম্নোদ্ধৃত রিপোর্ট ও গ্রন্থগুলি থেকে সংগৃহীত :

Report of the Health Survey & Development Committee (1946)

Census Report, 1941

Technological Possibilities of Agricultural development in India by W. Burns (1944)

Industrialisation of the Western Pacific by Kate Mitchell

Our Economic Problem by Wadia & Merchant (2nd Edition)

Fabian Colonial Essays, Edited by Rita Hinden (1945)

Soviet Light on the Colonies by Leonard Barnes

A Short History of Labour Conditions in the British Empire, 1800 to the Present Day : by Jurgen Kuczynski (2nd Edition, 1945)

Lord Hailey : African Survey
